

লেভ তলস্তয়

বড়ো ও ছোট গল্প

লেভ তলস্তয় • বড়ো ও ছোট গল্প

লেভ তলস্তয়

বড়ো ও ছোট গল্প

তলস্তয় ও দস্তয়েভ্স্কি — মহান প্রতিভাবান পুরুষ দুজন। নিজেদের শক্তিতে তাঁরা সমস্ত পৃথিবীকে অবাক করে দেন।

মাক্সিম গোর্কি

লেভ তলস্তয়ের (১৮২৮-১৯১০) বড়ো ও ছোট গল্পের এ সংকলন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে লেখকের সৃজনী প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে। প্রথমে আছে আগেকার দিকে লেখা "দুই হুজার" (১৮৫৬) ও "সুখের সংসার" (১৮৫৯), তারপর সুপ্রসিদ্ধ "পক্ষিরাজ" (১৮৮৫) এবং সর্বশেষে সুবিদিত "বল-নাচের পর"। শেষেরটি তাঁর শেষ গল্প, মৃত্যুর পর শুধু প্রকাশিত হয়।

কাহিনীগুলিতে বিশদভাবে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতি ও মানব চরিত্র অংকনে তলস্তয়ের মহতী ক্ষমতা, তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা এবং জীবনের অর্থ অন্বেষণ। "সুখের সংসার" ও "বল-নাচের পর" অনেকটা আত্মজীবনীমূলক, তলস্তয়ের জীবনের নতুন কয়েকটা দিক এ দুটিতে উন্মুক্ত হয়েছে।


চিরায়ত
রুশ
সাহিত্য

ЛЕВ ТОЛСТОЙ



ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Москва

লেভ তলস্তয়

বড়ো ও ছোট গল্প



বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: সমর সেন

চিত্রাঙ্কন: ভেনিয়ামিন বাসভ

সূচীপত্র



দুই হুজার

কাউণ্টেস ম. ন. তলস্তয়ের করকমলে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক তখন, যে সময়ে বালাই ছিল না রেল পথের বা রাজপথের, গ্যাসের বা চর্বির বাতির, ছিল না স্প্রিং-এর নিচু সোফা বা লাক্ষায় বার্নিশ-না-করা আসবাব; ছিল না মনোকল-পরা মোহমুক্ত যুবকবৃন্দ বা মতামতে উদারপন্থী মহিলা-দার্শনিক, ছিল না আমাদের সময়কার মতো অগুনতি dames aux camélias; যে সরল দিনে মস্কো থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যেতে হলে লোকে শকট বা গাড়ি বোঝাই করত রাঁধা খাবারে। ভাজা কাটলেট, গরম গরম বুবলিকি ও

ভালদাই-এর গাড়ির ঘণ্টার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে নরম ধুলো বা কাদা-ভরা রাস্তা দিয়ে চলত পুরো আটটা দিন আর রাত্রি; যে সময়ে হেমন্তের দীর্ঘ সন্ধ্যায় ধূমস্ত মোমবাতির আলো পড়ত বিশ থেকে তিরিশ জনের পরিবারবর্গের ওপর, বল-ঘরের ঝাড়ে বসানো হত মোম ও স্পার্মাসেটির বাতি, সার বেঁধে মুখোমুখি রাখা হত আসবাবপত্র, আমাদের বাপ ঠাকুর্দার যৌবন বোঝা যেত শুধু মুখে কাল রেখা আর মাথায় পাকা চুলের অভাব থেকে নয়, বোঝা যেত মেয়েদের নিয়ে তাঁদের ডুয়েলের হিড়িক থেকে, আর যে রকম তড়াক করে ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে গিয়ে আচমকা বা অন্যভাবে পড়ে যাওয়া মেয়েলী রুমাল তুলে নিতেন তা থেকে; যে কালে আমাদের মায়েরা পরতেন প্রকাণ্ড আস্তিনওয়ালা কোমর খাটো গাউন আর বাড়ির সব সমস্যার সমাধান করতেন লটারির মতো করে; যে সব দিনে দিনের আলো সইতে পারতেন না সুন্দরী dames aux camélias, ম্যাসনিক লজ, মার্তিনপন্থী ও তুগেনবান্দের* সেই সব সরল দিনে, মিলরাদভিচ,** দাভিদভ*** ও পুশ্‌কিনের সেই কালে একদা গুবের্নিয়ার কেন্দ্র ক... সহরে অধিবেশন বসেছিল ধনী জমিদারদের। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন সবে মাত্র সাঙ্গ হয়েছে।

---

* ম্যাসনিক লজ — গুহ্যতাত্ত্বিক ধর্ম সম্প্রদায়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে উদ্ভূত হয়ে এ চর্চা দ্রুত রাশিয়ায় পেঁছয়। ১৮২২ সালে রাশিয়ায় সরকারীভাবে একে নিষিদ্ধ করা হয়।

মার্তিনপন্থী — ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত রুশ ম্যাসনদের সম্প্রদায়। ফরাসী থিওজফিস্ট সঁ-মার্তিনের নামে এর নামকরণ।

তুগেনবান্দ — 'ধার্মিক সংঘ' — উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের জার্মান রাজনৈতিক সম্প্রদায়।

** মিলরাদভিচ — বিখ্যাত রুশ জেনারেল, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৮১২ সালের স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধে নেমেছিলেন।

*** দাভিদভ, দেনিস — রুশ কবি, ১৮১২ সালের যুদ্ধের বীর, পার্টিজান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। দাভিদভের স্বাধীনতামুখর কবিতাকে উচ্চ মূল্য দিতেন পুশকিন ও সমকালের অন্যান্য লোকেরা।

১

'যাক গে, দরকার হলে বৈঠকখানায় আস্তানা গাড়ব,' শ্লে থেকে সবে মাত্র নেমে ক... সহরের সেরা হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে বললেন একটি নবীন অফিসার, পরনে ওভারকোট, মাথায় অশ্বারোহী সৈনিকের টুপি।

'বেজায় ভিড়, হুজুর, অগুনতি লোক,' বলল ছোকরা চাকরটি; অফিসারের ভৃত্যের কাছে সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে ভদ্রলোকটি হলেন কাউণ্ট তুরবিন, তাই 'হুজুর' বলে খাতির করছে তাকে। 'আফ্রেমভস্কায়া জমিদারির কর্ত্রী ঠাকরুন কথা দিয়েছেন সন্ধ্যেবেলায় মেয়েদের নিয়ে চলে যাবেন, আপনি যদি চান তাহলে খালি হলে এগারো নম্বর ঘরে তুলতে পারি,' সে বলল। করিডরে লঘু পায়ে কাউণ্টের সামনে যেতে যেতে বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল সে।

বৈঠকখানায় জার আলেক্সান্দারের একটি কালের ছাপে মলিন পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি; তার নীচে ছোট টেবিলে বসে কয়েকজন শ্যাম্পেন টানছিল, তারা স্থানীয় বাবু সম্প্রদায়ের, সন্দেহ নেই; তাদের কিছু দূরে বসে ঘোর নীল ক্লোক-পরা কয়েকটি বহিরাগত সওদাগর।

ঘরে ঢুকে প্রকাণ্ড ছাই রঙা কুকুরটাকে ডেকে — ব্লুচার তার নাম — অফিসারটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কলারে তখনো বরফের কুচি লাগা কোটটা, ভোদকা আনতে বলে সাটিনের নীল সার্ট গায়ে টেবিলে বসে পড়ে আলাপ শুরু করে দিলেন ভদ্রলোকদের সঙ্গে; তাঁর সুন্দর চেহারায় আর মুখের দরাজভাবে আকৃষ্ট হয়ে তারা এক গেলাস শ্যাম্পেন খেতে বলল তাঁকে। কাউণ্ট এক গেলাস ভোদকা প্রথমে এক চুমুকে শেষ করলেন, তারপর নতুন আলাপীদের আপ্যায়ন করার জন্য হুকুম দিলেন আর একটা বোতলের। ঠিক সে সময়ে শ্লে-চালক ঘরে এল ভোদকার পয়সা চাইতে।

'সাশা!' চেঁচিয়ে ডাকলেন কাউণ্ট। 'দে তো ওকে টাকাটা!' শ্লে-চালক বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল অল্পক্ষণের মধ্যেই, তার খোলা হাতে খুচরো পয়সা।

'দেখুন দিকি হুজুর, আপনার জন্যে কত ধকল সইলাম আর আপনি বললেন আধ-রুবল দেবেন, আর ও আমাকে দিচ্ছে কিনা একটা সিকি!'

'সাশা! এক রুবল দিয়ে দে ওকে!'

বেজার মুখে স্লে-চালকের বুটের দিকে তাকিয়ে রইল সাশা।

'ওর ও-ই যথেষ্ট,' সে বলল ভারি মোটা গলায়। 'তাছাড়া, আমার কাছে আর টাকাপয়সা নেই।'

ব্যাগ থেকে শেষ সম্বল পাঁচ রুবলের দুটো নোট বের করে কাউণ্ট একটা দিলেন স্লে-চালককে; সে তাঁর হাতে চুমো খেয়ে বেরিয়ে গেল।

'কী দশায় পড়েছি!' বললেন কাউণ্ট। 'শেষ পাঁচটা রুবল!'

'এই তো হল খাঁটি হুজার!' মৃদু হেসে বললেন একটি ভদ্রলোক। তাঁর গোঁফ, গলা আর পা জোড়ার একটা অস্থির আলগা ভাব থেকে মনে হয় তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার।

'এখানে আপনার কি বেশ কিছু দিন কাটানোর অভিলাষ কাউণ্ট?'

'কিছু টাকার জোগাড় না করলে নয়, নইলে থাকবো না। হতচ্ছাড়া হোটেলটায় ঘরও পাওয়া যাবে না, ধুত্তোর ছাই!'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি বললেন:

'তাহলে দয়া করে আমার সঙ্গে থাকবেন কি, কাউণ্ট? সাত নম্বর ঘরে আমি আছি। আমার সঙ্গে থাকতে আপত্তি না থাকলে রাত কাটিয়ে যান। দিন তিনেক আমাদের সঙ্গে থেকে যান। আজ রাত্তিরে মার্শাল-এর ওখানে একটা বল-নাচ। আপনাকে দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন।'

'ঠিক ঠিক, কাউণ্ট, থেকে যান,' দলের একজন সুদর্শন যুবক বলে উঠল। 'আপনার তাড়া কিসের? সত্যি তো, নির্বাচনের ব্যাপারটা তিন বছরে মাত্র একবার হয়। আমাদের নবীনাদের অন্তত একবার দেখে নেওয়া উচিত, কাউণ্ট!'

'সাশা! জামাকাপড় বের করো, আমি যাচ্ছি গোসলখানায়,' উঠতে উঠতে বললেন কাউণ্ট। 'তারপর দেখা যাবে — হয়ত একবার সত্যি ঢুঁ মারবো মার্শালের ওখানে।'

একটি ওয়েটারকে ডেকে কী একটা বলাতে সে মৃদু হেসে 'সবই সম্ভব, হুজুর,' বলে বেরিয়ে গেল।

দরজার বাইরে থেকে ডেকে কাউণ্ট বললেন, 'তাহলে ওদের বলি আপনার ঘরে স্যুটকেসটা রাখতে।'

'অত্যন্ত বাধিত বোধ করবো,' দোরগোড়ায় ছুটে গিয়ে বললেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি। 'আপনার অসীম দয়া। সাত নম্বর ঘর, ভুলবেন না যেন!'

কাউণ্টের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ামাত্র অশ্বারোহী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার নিজের জায়গায় ফিরে এসে কেরানীর আরো কাছে চেয়ারটা টেনে এনে সোজা তার চোখে চেয়ে হেসে বললেন:

'ইনিই হলেন তিনি!'

'কে?'

'সত্যিই তাই, বলছি শোনো — ডুয়েল লড়তে ওস্তাদ, নামকরা হুজার। নাম তুরবিন, সবাই চেনে। বাজি রেখে বলতে পারি আমাকে চিনেছে — নির্ঘাৎ চিনেছে। লেবেদিয়ানে নতুন ঘোড়া জোগাড় করতে একবার আমাকে পাঠায় — সে সময়ে তিন হপ্তা ধরে একটানা হুল্লোড় চালাই দুজনে। ছোট্ট একটা কাণ্ড ঘটে, দায়ী ছিল ও আর এই শর্মা: সেজন্য আমাকে না চেনার ভান করল। খাসা লোক, তাই না?'

'খাসা লোক। আর আদবকায়দা কী সুন্দর! ও যে এরকমের চীজ কেউ টেরটি পাবে না,' বলল সুদর্শন যুবকটি। 'আর কী তাড়াতাড়ি আলাপ জমে গেল; বয়স পঁচিশ, তার বেশী নয় নিশ্চয়?'

'এ-রকম দেখতে শুধু, কিন্তু পঁচিশের বেশী। ভালো করে চেনা দরকার কিন্তু। মাদাম মিগুনভার সঙ্গে সটকে পড়েছিল কে? ইনিই। সাবলিনকে খতম করে দিয়েছিল কে? ইনিই। আর কে মাতনেভের পা পাকড়ে ফেলে দিয়েছিল জানলা থেকে? ডিউক নেস্তেরভের কাছে তিন লক্ষ রুবল জিতেছিল কে? ও এত বেপরোয়া যে আপনার ধারণার বাইরে! জুয়াড়ি, ডুয়েল লড়িয়ে, রমণীমোহন লোক। কিন্তু মনটা ওর হুজারের, খাঁটি হুজারের। লোকে আমাদের নিন্দে করে বটে, কিন্তু সাচ্চা হুজার যে কী চীজ বোঝে না। হ্যাঁ, ছিল বটে সে সব দিন!'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি বিশদভাবে বলতে শুরু করে দিলেন লেবেদিয়ানে কাউণ্টের সঙ্গে তাঁর বেলেল্লাপনার কাহিনী, যে ব্যাপারটি শুধু যে ঘটেনি তা নয়, ঘটতে পারে না কখনো। ঘটতে পারে না, কারণ প্রথমত, তিনি এর আগে কাউণ্টকে চোখে দেখেননি কখনো, কাউণ্ট অশ্বারোহী বাহিনীতে ঢোকার দু বছর আগে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন; আর দ্বিতীয়ত, অশ্বারোহী বাহিনীর এই অফিসারপ্রবর কখনো অশ্বারোহী বাহিনীতে কাজ করেননি; বেলেভস্কি রেজিমেণ্টে সামান্যতম ক্যাডেট হিসেবে চার বছর কাটিয়ে অফিসারের পদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু দশ বছর আগে পৈতৃক সম্পত্তি হাতে আসার পর সত্যি তিনি একবার যান লেবেদিয়ানে, সেখানে নতুন ঘোড়া-জোগাড়ে অফিসারদের সঙ্গে সাতশ রুবল ফুঁকে দিয়ে নিজের জন্য অর্ডার দেন নারাঙ্গি কফ দেওয়া উলানী পোষাক, মতলব ছিল লান্সার বাহিনীতে যোগ দেবেন। এ বাসনা তাঁর এত উগ্র ছিল যে লেবেদিয়ানে নতুন ঘোড়া-জোগাড়ে অফিসারদের সঙ্গে কাটানো সেই তিনটি সপ্তাহ তাঁর জীবনে রয়ে গেল সবচেয়ে আনন্দোজ্জ্বল; মনে মনে নিজের স্বপ্নকে প্রথমে বাস্তবে, তারপর স্মৃতিতে রূপান্তরিত করে অশ্বারোহী বাহিনীতে নিজে কাজ করেছিলেন ক্রমশ এ বিশ্বাস দৃঢ় হল; এতে অবশ্য সততা ও অমায়িকতার দিক দিয়ে সত্যিকার ভদ্রলোক হতে কোনো বাধা হয়নি তাঁর।

'সত্যি, অশ্বারোহী বাহিনীতে যারা কাজ করেনি তারা বুঝবেই না আমাদের মত লোকের কদর।' চেয়ারে উঁচু হয়ে বসে থুতনি এগিয়ে দিয়ে মোটা ভারি গলায় বলে চললেন, 'এক কালে দলের আগে আগে যেতাম ঘোড়ায় চেপে, দুটো পায়ের মাঝখানে যেটা থাকত সেটা ঘোড়া তো নয়, খাঁটি শয়তান; নিজেও কম শয়তান নই, বসে থাকতাম ঘোড়ার ওপর গ্যাঁট হয়ে, দলের কমাণ্ডার আসতেন দেখতে। বলতেন, "ওহে অফিসার, তোমাকে ছাড়া তো কাজ চলবে না। দয়া করে দলটাকে প্যারেড করাও দেখি।" আমি বলতাম "যে আজ্ঞে", আর মুখের কথাটি খসতে না খসতে খেল শুরু। বনবন করে ঘুরপাক দিয়ে মোচওয়ালা বাহাদুরদের হেঁকে হুকুম দিতাম, আর সাঁ করে সবাই বেরিয়ে যেতাম। হ্যাঁ, ছিল বটে সে সব দিন!'

লালচে মুখে ভিজে চুলে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে কাউণ্ট সটান গেলেন সাত নম্বর ঘরে; সেখানে পাইপ মুখে ড্রেসিং-গাউন পরে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বসে বসে তখন একটু সন্ত্রস্ত আনন্দে নিজের অসীম সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলেন — বিখ্যাত তুরবিনের সঙ্গে এক ঘরে থাকা — ভাবছিলেন, "যদি ঝোঁকের মাথায় উনি আমার কাপড়চোপড় খুলে সহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে বরফে বসিয়ে দেন, কিম্বা সারা গায়ে মাখিয়ে দেন আলকাতরা, কিম্বা শুধু ... না না, দোস্তের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার উনি করবেন না।" এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন নিজেকে।

'সাশা! ব্লুচারকে খেতে দে!' হেঁকে বললেন কাউণ্ট।

সাশা এসে হাজির, হোটেলে পেঁছিয়েই এক গেলাস ভোদকা চাপাতে বেশ রং ধরেছে।

'তর সইল না আর! এরি মধ্যে নেশা ধরেছে দেখছি, বদমাস কোথাকার!.. ব্লুচারকে খেতে দে!'

'না খেলে ও পটল তুলবে না; দেখুন না গাটা কেমন চকচকে,' ব্লুচারের গা চাপড়াতে চাপড়াতে বলল সাশা।

'বকবক রাখ্! খেতে দে ওকে!'

'আপনি কেবল কুকুর নিয়ে ভাবেন; আর চাকর এক পাত্তর ভোদকা খেলে ধমকান।'

'তবে রে, এক ঘা কষাবো নাকি!' কাউণ্ট যে ভাবে হাঁক দিলেন তাতে জানলার কাঁচগুলো ঝন ঝন করে উঠল, আর অল্প ঘাবড়ে গেলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার।

'সাশার পেটে আজ কিছু পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তো পারেন। মানুষের চেয়ে কুকুর যদি আপনার বেশী পেয়ারের হয়, বেশ, মারুন আমাকে,' সাশা বলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নাকে এমন একটা ঘুঁষি খেল যে পড়ে গেল মেঝেতে, পার্টিশনে ঠুকে গেল মাথা: পরমুহূর্তে হাতে নাক চেপে তড়াক করে উঠে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল করিডরে একটা তোরঙ্গের ওপর।

'দাঁতের দফারফা করে দিয়েছেন,' বিড় বিড় করে বলল একহাতে রক্তাক্ত নাক মুছে, অন্য হাতে ব্লুচারের পিঠ চুলকে দিতে দিতে; কুকুরটা

নিজের গা চাটছিল। 'দেখছিস ব্লুচার, দাঁত ভেঙে দিয়েছেন একেবারে, কিন্তু তবু তো উনি আমার কাউণ্ট আর ওঁর জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। হ্যাঁ হক কথা কেননা, জানিস তো ব্লুচার, উনি হলেন গিয়ে আমার কাউণ্ট। তোর ক্ষিধে পেয়েছে?'

কিছুক্ষণ সেখানে শুয়ে থেকে উঠে পড়ল সে, খাওয়াল কুকুরটাকে; তার নেশা প্রায় টুটে গেছে, গেল কাউণ্টকে চা দিতে।

পার্টিশনে পা তুলে অফিসারের বিছানায় শুয়ে আছেন কাউণ্ট, সামনে দাঁড়িয়ে নম্রভাবে তাঁকে বলছেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, 'আমি তাহলে অপমানিত বোধ করবো। আমিও তো ঘাগী সৈনিক, বলতে গেলে দোস্ত। অন্য কারো কাছ থেকে টাকা নিতে দেবার আগে বরং আমি আপনাকে সানন্দে দুশ রুবল দেবো। আপাতত আমার কাছে অতটা নেই— মাত্র একশ আছে কিন্তু বাকিটা আজকেই জোগাড় করবো। আমি কিন্তু সত্যি অপমানিত বোধ করবো, কাউণ্ট!'

'ধন্যবাদ দোস্ত,' তার পিঠ চাপড়ে বললেন কাউণ্ট; দুজনের মধ্যে কী সম্পর্কটা দাঁড়াবে সেটা তৎক্ষণাৎ আঁচ করে নিলেন তিনি। 'ধন্যবাদ। ব্যাপারটা যদি এ-ই, তাহলে বল-নাচে যাবো আমরা। কিন্তু আপাতত কী করা যায়? সহরে কী কী হচ্ছে বলুন তো! দেখতে ভালো ছুঁড়ী টুঁড়ি আছে নাকি? ফুর্তি লুঠছে কারা? তাসুড়ে আছে?'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বললেন, অঢেল সুন্দরী মেয়ে দেখা যাবে বল-নাচে, সহরে সবচেয়ে মজা লুঠছে নব নির্বাচিত পুলিস ক্যাপ্টেন কলকভ; হুজারদের মতো বেপরোয়া মেজাজ তার নেই অবশ্য, তবে লোকটা ভালো; ইলিউশ্‌কার জিপসী কোরাস নির্বাচনের শুরু থেকে এখানে গাইছে, স্তেশকা সে দলে একক গায়, আর আজ বল-নাচের পর সবাই যাবে জিপসীদের কাছে।

'আর তাস খুব চলে এখানে,' তিনি বলে চললেন। 'লুখনভ বলে পয়সাকড়িওয়ালা একটা লোক সারা দিন তাস খেলে আর আট নম্বর ঘরের ইলিন হেরে ভূত হচ্ছে, ও হল উলান রেজিমেণ্টের কর্ণেট। ওর ওখানে এরিমধ্যে খেলা শুরু হয়েছে। রোজ সন্ধ্যেয় খেলে, আর ইলিন লোকটা

এত চমৎকার, বললে বিশ্বেস করবেন না, কাউণ্ট; লোকটা একেবারে কঞ্জুস নয় — পরনের সার্টটা খুলে দিয়ে দিতে পারে।'

'তাহলে যাওয়া যাক ওর কাছে। দেখি এখানে কে কে আছে,' বললেন কাউণ্ট।

'চলুন, চলুন। আপনাকে দেখে ওরা বেজায় খুশি হবে।'

২

উলান রেজিমেণ্টের কর্ণেট ইলিনের সবে ঘুম ভেঙেছে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় তাসের টেবিলে আটটায় বসে পরের দিন বেলা এগারোটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে হেরেছে পোনেরো ঘণ্টা। হেরেছে বিস্তর, কিন্তু নিজেই বলতে পারবে না কতটা; তার নিজের ছিল তিন হাজার রুবল, আর রেজিমেণ্টের পোনেরো হাজার: সে টাকাটা নিজের টাকার সঙ্গে মিশে গেছে বেশ কিছু দিন, গুণতে তার ভয়, পাছে তার আশঙ্কা সত্যি হয় যে লোকসানের অঙ্ক ইতিমধ্যে চড়াও করেছে রেজিমেণ্টের টাকায়। প্রায় বারোটার সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে, সেই গভীর স্বপ্নহীন ঘুম যা একমাত্র ছেলে ছোকরাদের পক্ষে সম্ভব, আর তাও সম্ভব শুধু তাসে হেরে ভূত হবার পর। সন্ধ্যে ছটায় ঘুম ভাঙল, হোটেলে ঠিক কাউণ্টের আগমনের সময়টায়; মেঝেতে ছড়ানো তাস আর খড়ি, ঘরের মাঝখানে দাগ লাগা কয়েকটা টেবিল, দেখে বিভীষিকায় মনে পড়ে গেল গত রাত্রের খেলার কথা, বিশেষ করে শেষ তাসটার কথা, গোলামের তাস, যাতে তার গচ্চা যায় পাঁচশ রুবল; কিন্তু নিজের যথার্থ অবস্থাটা মেনে নিতে মন চাইল না, বালিশের তলা থেকে টাকা বের করে শুরু করলে গুণতে। 'কর্ণার' আর 'ট্রান্সপোর্টে' হাতে হাতে ঘোরা কয়েকটা চেনা নোট দেখাতে নিজের খেলার সমস্ত ধারাটা এল মনে। নিজের তিন হাজার তো উবে গেছেই, আরো গেছে রেজিমেণ্টের প্রায় আড়াই হাজার।

পরপর চার রাত্রি ধরে খেলছে উলান।

এসেছে মস্কো থেকে, সেখানে তার হাতে দেওয়া হয়েছিল রেজিমেণ্টের টাকা। ঘোড়া বদলানো যাবে না ছুতো করে যাত্রীবাহী ডাকগাড়ি স্টেশনের ম্যানেজার ক… সহরে আটকে রেখেছে তাকে; আসলে হোটেলের মালিকের

সঙ্গে তার গোপন সড় ছিল সব যাত্রীকে এক দিনের মতো আটকে রাখার। কমবয়সী ফুর্তিবাজ ছোকরা উলান, রেজিমেন্টে যোগ দেবার উপলক্ষে বাপমা তার হাতে দিয়েছে তিন হাজার রুবল এই সেদিন, নির্বাচনের সময়ে ক... সহরে কটা দিন কাটাতে পেরে বেজায় খুশি, আশা ছিল প্রাণ ভরে মজা লুঠে নেবে। একটি গেরস্থ গোছের জমিদারের সঙ্গে চেনা ছিল তার। গাড়ি চড়ে তার বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের একটু খাতির করে আসার জন্য তৈরী হচ্ছে, এমন সময়ে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার এসে আলাপ করলেন তার সঙ্গে। আর সে দিনই সন্ধ্যায়, কুমতলবে তা নয়, বৈঠকখানায় তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন বন্ধু লুখনভ ও অন্যান্য কয়েকজন তাসুড়েকে। তখন থেকে তাসের টেবিলে জমে গিয়েছে উলান। পরিচিত জমিদারটির কাছে যে যায়নি শুধু তা নয় ঘোড়া ডাকার কথা তোলেনি আর। পরপর চার দিন ঘর ছেড়ে বেরোয়নি।

জামাকাপড় পরে চা খেয়ে ধীরেসুস্থে জানলায় গেল উলান। ভাবল একটু হেঁটে বেড়িয়ে এলে তাসের নাছোড়বান্দা চিন্তা মুছে যাবে মন থেকে। আর্মিকোট পরে বাইরে গেল। লাল-ছাদ শাদা বাড়িগুলোর পেছনে তখন সূর্য ঢলে পড়েছে, গোধূলি নেমেছে। দিনটা গরম। নোংরা পথেঘাটে তুলোর মতো নরম বরফ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এই শেষ হয়ে আসা দিনটা, ভেবে গভীর বিষণ্ণতায় মন ভরে গেল কর্ণেটের।

"এ হারানো দিন আর কখনো ফিরে আসবে না," সে ভাবল।

"যৌবনটা ফুঁকে দিয়েছি," বলল নিজেকে, ফুঁকে দিয়েছে সত্যি ভেবে যে বলল তা নয়, বাস্তবিক পক্ষে এ বিষয়ে ভাবেনি মোটে, বলল বলবার মত কথাটা হঠাৎ মনে আসাতে।

ভাবতে লাগল, "কী করি এখন? কারো কাছে টাকা ধার করে চলে যাই?" ফুটপাথে তাকে পেরিয়ে গেল একটি কমবয়সী মেয়ে। "কী বোকা-বোকা চেহারা মেয়েটার।" কেন জানি ভাবল। "ধার করার মত তো কেউ নেই। ফুঁকে দিয়েছি যৌবন।" গেল দোকানের একটা সারিতে। একটার দরজায় দাঁড়িয়ে একটি দোকানদার, গায়ে শেয়ালের লোম-দেওয়া কোট, খরিদ্দার ডাকাডাকি করছে। "সেই আটাটা হাতছাড়া না করলে লোকসানটা পুরিয়ে নিতে পারতাম।" পিছু পিছু একটি বুড়ী ভিখারিনী কাঁদুনি

গাইতে গাইতে চলেছে। "ধার করার মতো তো কেউ নেই।" ভালুক লোমের কোট-পরা একটি ভদ্রলোক চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে। পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। "এদের মধ্যে হুলস্থুল লাগিয়ে দেবার মতো কী করা যায়? গুলি চালাই এদের? বড়ো একঘেয়ে হবে ব্যাপারটা। যৌবন ফুঁকে দিয়েছি। চমৎকার যোয়াল আর লাগাম ঝুলছে! ওঃ, তিন ঘোড়ার গাড়িতে চাপলে কেমন হত! হায়রে! ফেরা যাক হোটেলে। লুখনভের আসতে দেরী নেই, তাস চালাই গে আবার।"

ফিরে গিয়ে টাকাটা গুণে দেখল আবার। না, প্রথম বারে কোনো ভুল হয়নি: রেজিমেণ্টের টাকায় আড়াই হাজার রুবল ঘাটতি পড়েছে। "প্রথম তাসে ধরব পঁচিশ, পরেরটায় 'কর্ণার'... তারপর বাজির সাতগুণ, তারপর পোনেরো, তিরিশ, ষাট গুণ, তিন হাজার রুবল পর্যন্ত। তারপর যোয়ালগুলো কিনে বিদায় নেব। কিন্তু বেটা বদমাস জিততে দেবে না আমাকে! যৌবনটা ফুঁকে দিয়েছি।"

লুখনভ যখন ঘরে ঢুকল তখন এ সব কথা ভাবছিল উলান।

'অনেকক্ষণ উঠেছেন নাকি, মিখাইলো ভাসিলিচ?' হেড়ো নাক থেকে আস্তে আস্তে সোনার চশমা খুলে লাল সিল্কের রুমালে ধীরেসুস্থে মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল লুখনভ।

'না, সবে মাত্র। খাসা ঘুমিয়েছি।'

'এইমাত্র কে একজন হুজার এসেছে। আছে জাভালশেভস্কির সঙ্গে... শুনেছেন নাকি?'

'না। আর সবাই আসেনি এখনো, কী ব্যাপার?'

'মনে হচ্ছে ওরা গেছে প্রিয়াখিনের কাছে। এখখুনি ফিরে আসবে।'

আর সত্যি, অনতিবিলম্বে এসে জুটল অন্যেরা: লুখনভের সদা সহচর, স্থানীয় সেনাদলের অফিসার একজন; গ্রীক সওদাগর একটি, প্রকাণ্ড তামাটে রঙের বাঁকা নাক, কোটরগত কালো চোখ; মেদবহুল থলথলে একটি জমিদার, মদের ভাঁটির মালিক, সারা রাত খেলে, হামেশা আধ রুবল বাজি রাখে পয়েণ্ট পিছু।

সবাই খেলা শুরু করতে উদগ্রীব, কিন্তু সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করছে না

খেলুড়েদের পাণ্ডারা, বিশেষ করে লুখনভ: সে অত্যন্ত ধীরেসুস্থে মস্কোতে মগের মুলুকের কথা বলছে।

'ভেবে দেখুন একবার! সেরা সহর মস্কো, আমাদের রাজধানী, আর সেখানে কিনা রাত্তিরে আকড়া হাতে গুণ্ডারা ভূতের মতন সাজে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, নির্বোধ লোকগুলোকে ভয় পাইয়ে দেয়, পথিকদের লুঠে নেয়, ব্যস! পুলিস কী করে বলুন তো! সেটা বোঝা ভার।'

মগের মুলুকের বিবরণ মন দিয়ে শুনল উলান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ে শান্ত গলায় তাস আনতে বলল। প্রথমে মোটা জমিদারটি মনের কথা মুখে প্রকাশ করল:

'তাহলে মশাইরা, মূল্যবান সময় মিছিমিছি নষ্ট করে কী ফয়দা? কাজের কাজ শুরু করা যাক!'

'কেন চাইছেন জানা আছে, আধ রুবল বাজি ধরে ধরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘরে তুলেছেন কাল রাত্রে,' বলল গ্রীক।

'কিন্তু সত্যি, এবার শুরু করলে হয়,' বলল স্থানীয় সেনাদলের অফিসার।

লুখনভের দিকে চাইল ইলিন। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে লুখনভ ভূতের পোষাক-পরা লম্বা আঁকড়াওয়ালা গুণ্ডাদের কাহিনী বলে চলল ধীরেসুস্থে।

'তাস বিলি করব নাকি?' জিজ্ঞেস করল উলান।

'বড্ডো তাড়াতাড়ি হচ্ছে না?'

'বেলভ!' কেন জানি লাল হয়ে উঠে হাঁক দিল উলান। 'মুখে দেবার মত কিছু নিয়ে এসো ... আজ কুটোটি খাইনি, জানেন। নিয়ে এসো শ্যাম্পেন, আর তাস দাও।'

ঠিক সে সময়ে ঘরে ঢুকলেন কাউণ্ট আর জাভাল্‌শেভস্কি। দেখা গেল তুরবিন ও ইলিন একই ডিভিশনের লোক। সঙ্গে সঙ্গে ভাব জমে গেল তাদের, গেলাস ঠুকে শ্যাম্পেন খাওয়া হল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুজনে দুজনকে 'তুমি' বলতে শুরু করল। দেখা গেল ইলিনকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে কাউণ্টের, তিনি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে এত কম বয়স বলে পিছনে লাগলেন।

'একেই বলে উলান!' তিনি বললেন। 'মোচের কী বাহার! কী দারুণ মোচ!'

ইলিনের ঠোঁটের ওপরের রোঁয়া একেবারে শাদা।

'আপনারা তাসে বসার উপক্রম করছেন বুঝি?' বললেন কাউণ্ট। 'বেশ, আশা করি তুমি জিতবে, ইলিন। তুমি তো তুখোড় খেলুড়ে, তাই না?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

তাসের প্যাকেট খুলতে খুলতে লুখনভ বলল, 'এই শুরু করছি আর কি। আপনি খেলবেন না, কাউণ্ট?'

'না, আজকে নয়। খেললে আপনাদের যথাসর্বস্ব খোয়াতে হবে। আমি খেলতে বসলে ব্যাঙ্ক ফেল মারে। কিন্তু না খেলার কারণ তা নয়। ভলচকের কাছে যাত্রীবাহী ডাকগাড়ির স্টেশনে সব খুইয়েছি। আঙুলে এক সারি আংটি এক বেটা পদাতিক বাহিনীর লোক একেবারে বসিয়ে দিয়েছে। লোকটা জোচ্চোর নিশ্চয়।'

'তোমাকে বুঝি যাত্রীবাহী ডাকগাড়ির স্টেশনে অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছিল?' ইলিন জিজ্ঞেস করল।

'পুরো বাইশ ঘণ্টা। কখখনো ভুলবো না হতচ্ছাড়া জায়গাটার কথা, আর ওখানকার ডাক-স্টেশন মাস্টারও ভুলবে না আমায় কখনো।'

'তার মানে?'

'গাড়ি হাঁকিয়ে পেঁাছেছি, চোর জোচ্চোরের মতো দেখতে ডাক-স্টেশন মাস্টার এক ঝটকায় এসে বলল, "ঘোড়াটোড়া নেই।" আমি নিজের জন্যে একটা নিয়ম খাড়া করেছি, সেটা বলা দরকার: যখনি বলে ঘোড়া নেই, তখনি আমি কোট না খুলেই সটান যাই ম্যানেজারের কামরায় — বৈঠকখানার কথা বলছি না, একেবারে তার খাস কামরায়, আর হুকুম দিই সমস্ত দরজা জানলা খুলে দিতে, যেন ধোঁয়ায় জায়গাটা ভর্তি হয়ে গেছে। এবারেও ঠিক তাই করলাম। কী ঠাণ্ডা! গেল মাসে কী দারুণ শীত পড়েছিল মনে আছে? শূন্যের নীচে চার। ডাক-স্টেশন মাস্টার আমার সঙ্গে তর্ক করতে এল, কিন্তু নাকে কষিয়ে দিলাম এক ঘা। একটা বুড়ী, কয়েকটা ছুঁড়ী আর কয়েকটা মাগী চেঁচামেচি করে নিজেদের ঘটিবাটি তুলে নিয়ে গাঁয়ে কেটে পড়ার জোগাড় করল। পথ জুড়ে চেঁচিয়ে বললাম,

"আমাকে ঘোড়া দাও তো দাও, তাহলে চলে যাবো; না দিলে ঠাণ্ডায় জমে মরো গে, কাউকে বেরোতে দেবো না এখান থেকে!"'

'যেমন কুকুর তেমন মুগুর!' খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল থলথলে জমিদার। 'ঠাণ্ডায় তেলেপোকাদের ভূত ভাগানের মতো।'

'কিন্তু ওদের নজরে রাখিনি — কোথায় যেন গিয়েছিলাম — ডাক-স্টেশন মাস্টার আর মেয়েগুলো সরে পড়ল। আমার জামিনে রয়ে গেল শুধু স্টোভের ওপর শোয়া বুড়ীটা, খালি হাঁচছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। তারপর শুরু হল আপোষের কথাবার্তা: ডাক-স্টেশন মাস্টার ফিরে দূর থেকে বলল বুড়ীটাকে ছেড়ে দিতে, কিন্তু আমি লেলিয়ে দিলাম ব্লুচারকে, ডাক-স্টেশন মাস্টার দেখলেই চটে যায় ও। কিন্তু শয়তানটা পরের দিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়া দিল না। পদাতিক বাহিনীর সেই হতচ্ছাড়া অফিসারটা হাজির। পাশের ঘরে গিয়ে খেলতে শুরু করলাম তার সঙ্গে। ব্লুচারকে দেখেছেন?.. ব্লুচার! এদিকে আয়!'

ব্লুচার এল। জুয়াড়িরা আগ্রহের ভাব দেখিয়ে তাকে দেখল, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল অন্য কিছুর জন্য তারা উদগ্রীব।

'কিন্তু আপনারা খেলছেন না কেন? আমার জন্যে খেলা ছেড়ে থাকবেন না যেন। আমি বুঝলেন কিনা, একটু বকুনতুড়ে লোক,' বললেন তুরবিন। 'লভ মি, লভ মি নট — বেড়ে খেলা।'

৩

দুটো মোমবাতি সামনে টেনে লুখনভ টাকাভর্তি বেশ বড়ো একটা তামাটে ব্যাগ বের করল অতি আস্তে, মন্ত্রসাধকের মত; একশ রুবলের দুটো নোট নিয়ে রাখল তাসের নীচে।

'দুশ রুবলের ব্যাংক, ঠিক কালকের মত,' বলল চশমাটা নাকে ঠিক মত বসিয়ে নতুন তাসের প্যাকেট খুলতে খুলতে।

'বহুৎ আচ্ছা,' তার দিকে না তাকিয়ে, তুরবিনের সঙ্গে আলাপ না থামিয়ে বলল ইলিন।

খেলা শুরু হল। যন্ত্রের মত নির্ভুল খেলা লুখনভের, মাঝে মাঝে থেমে একটা পয়েণ্ট ধীরেসুস্থে টুকে রাখছে সে বা চশমার ওপর দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে 'নিয়ে নিন' বলছে। সবচেয়ে বেশী শব্দ করছে মোটা জমিদারটি, হিসেব মুখে মুখে চলছে তার, তাসের কোণ ধরে মোটা আঙুলে থুথু লাগাচ্ছে তাসে; স্থানীয় সেনাদলের অফিসার চুপচাপ পরিষ্কার হাতে নিজের পয়েণ্টগুলো টুকে রাখছে, তাসের কোণ সামান্য নীচু করে রাখছে টেবিলে; ব্যাংকারের পাশে বসে কোটরগত কালো চোখে গ্রীকটি খেলা দেখছে মনোযোগ সহকারে, যেন একটা কিছু ঘটার প্রতীক্ষায় আছে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জাভাল্শেভস্কি হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়লেন: পকেট থেকে লাল বা নীল ব্যাংকনোট বের করে তার ওপরে একটা তাস চাপিয়ে সজোরে সেটা চাপড়ে কপাল খোলার জন্য চেঁচালেন, 'চলে এসো হে, সাতা!' গোঁফ কামড়ে, এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে লাল হয়ে উঠলেন, ভীষণ উত্তেজনা, তাস না এসে যাওয়া পর্যন্ত সে উত্তেজনা থামল না। ঘোড়ার লোমের সোফার পাশে রাখা একটা রেকাবী থেকে বাছুরের মাংস আর শশা খাচ্ছে ইলিন, ব্যস্তসমস্ত হয়ে জ্যাকেটে আঙুল মুছে নিয়ে একটার পর একটা তাস ফেলছে। শুরু থেকে সোফায় বসেছিলেন তুরবিন, ব্যাপারটা কী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ল তাঁর কাছে। উলানের দিকে একেবারে তাকাচ্ছে না লুখনভ, কোনো কথা বলছে না তাকে; মাঝে মাঝে শুধু চশমার ফাঁক দিয়ে দেখে নিচ্ছে তার দানগুলো। উলানের বেশীর ভাগ তাস হারের।

'ও তাসটা পেলে হত,' মোটা জমিদারের তাসের উল্লেখ করে বলল লুখনভ, জমিদারটি আধ রুবল বাজি ধরে খেলছিল।

'ইলিনেরটা মারুন না — আমার তাস নিয়ে কী লাভ?' জমিদার বলল।

আর সত্যি, অন্যদের তুলনায় ইলিনের তাস বার বার মার খাচ্ছে। প্রতিবার হারার পর অস্থিরভাবে লক্ষ্মীছাড়া তাসটায় টান দিয়ে কম্পিত হাতে আর একটা বেছে নিচ্ছে সে। সোফা থেকে উঠে তুরবিন গ্রীককে বললেন ব্যাংকারের পাশে তাঁকে বসতে দিতে। জায়গা বদলাল গ্রীক, আর কাউণ্ট তার চেয়ারে বসে লুখনভের হাতে নজর রাখলেন এক দৃষ্টিতে।

'ইলিন!' হঠাৎ ডেকে উঠলেন তিনি, গলার স্বরটি স্বাভাবিক হলেও তাতে আপনা থেকে চাপা পড়ল অন্য সব আওয়াজ। 'কেন ও তাসটা ধরে রেখেছ? খেলতে জান না দেখছি।'

'যাই খেলি না কেন, সব সমান।'

'ওরকম করলে হারবে নির্ঘাৎ। দাও, তোমার হয়ে খেলি।'

'না, ক্ষমা করো! আমার হাত কাউকে দিই না। খেলতে চাইলে নিজে খেলো।'

'বলেছি তো তোমাকে, নিজে খেলতে চাই না: শুধু তোমার হয়ে খেলতে চাই। তোমাকে এমন হারতে দেখে খারাপ লাগছে।'

'পোড়া কপাল!'

আর কিছু বললেন না কাউণ্ট; শুধু টেবিলে কনুই রেখে আবার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লুখনভের হাতদুটোর দিকে।

'অত্যন্ত খারাপ,' হঠাৎ টেনে টেনে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি।

তার দিকে ফিরে তাকাল লুখনভ।

'অতি, অতি খারাপ,' আরো জোরে বললেন তিনি, লুখনভের চোখে সটান চেয়ে।

ওরা খেলে চলল।

'ভা-লো নয়,' ইলিনের আর একটা বড়ো তাস লুখনভ নেওয়াতে তুরবিন বললেন।

'কিসে আপনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কাউণ্ট?' গায়ে-না-মাখা গোছের ভদ্র স্বরে জিজ্ঞেস করল লুখনভ।

'যেভাবে ইলিনের তাসগুলো মারছেন, তাতে। সেটাই খারাপ।'

একটু নড়ে উঠল লুখনভের কাঁধ আর ভুরু, যেন তার বক্তব্য এই যে, নিজের অদৃষ্ট মেনে না নিলে নয়; খেলে চলল সে।

'ব্লুচার! আয় এদিকে!' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হাঁকলেন কাউণ্ট। 'এই যে, একে!' বললেন তাড়াতাড়ি।

সোফার নীচ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে প্রভুর দিকে ছুটে এল ব্লুচার, তার ধাক্কায় আর একটু হলে পড়ে যেত স্থানীয় সেনাদলের অফিসারটি:

প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াতে নাড়াতে গড়গড় করে দলের দিকে এমন ভাবে তাকাতে লাগল কুকুরটা যেন জিজ্ঞেস করছে, "কই, কার দোষ?"

তাস নামিয়ে রেখে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল লুখনভ। বলল:

'এ অবস্থায় খেলা অসম্ভব। কুকুর আমি একেবারে সইতে পারি না। ঘর জোড়া কুকুর নিয়ে খেলা যায় কী করে?'

'বিশেষ করে এ ধরনের কুকুর — এদের ছিনেজোঁক বলে মনে হয়,' সুর মেলাল স্থানীয় সেনাদলের অফিসার।

'কী বলেন, খেলা চলবে না চলবে না, মিখাইলো ভার্সিলিচ?' জিজ্ঞেস করল লুখনভ।

'দয়া করে বাধা দিও না, কাউণ্ট,' ইলিন অনুরোধ জানাল তুরবিনকে।

'একবারটি এসো তো,' ইলিনের হাত ধরে পার্টিশনের ওদিকে নিয়ে যেতে যেতে তুরবিন বললেন।

সেখান থেকে কাউণ্টের প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শোনা গেল। গলা না নামিয়ে তাঁর কথা বলার অভ্যাস। আর তাঁর গলাটি এমন যে তিন কামরা ছাড়িয়ে শোনা যায়।

'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? দেখছ না, চশমা-পরা ভদ্রলোকটি ঘোড়েল জোচ্চোর?'

'আরে থামো! কী বলছ তুমি?'

'না, থামবো না। ছেড়ে দাও, আমি বলছি। আমার কী এসে যায়? অন্য যে কোনো সময়ে তোমার টাকা হাতিয়ে নিতাম কিন্তু কেন জানি না তোমাকে ঠকতে দেখে খারাপ লাগছে। রেজিমেণ্টের টাকা সঙ্গে আছে নাকি?'

'না! কী ভাবছ তুমি?'

'একই পথের পথিক আমি, দোস্ত, তাই জোচ্চোরদের সব কসরৎ আমার জানা; তোমাকে বলছি, চশমা-পরা লোকটা জোচ্চোর। খেলা ছেড়ে দাও, সত্যি বলছি; বন্ধুর মত বলছি কথাটা।'

'আমি শুধু আর একটা হাত খেলবো, ব্যস।'

'আর একটার মানে আমার জানা। বেশ, দেখা যাক।'

ঘরে ফিরে গেল দুজনে। একটা দানে ইলিন এত বেশী বাজী রাখল আর তাসগুলো এত বেশী মার খেল যে অনেক টাকা গচ্চা গেল।

টেবিলের মাঝখানে হাত রাখল তুরবিন:

‘ঢের হয়েছে! চলো যাই।’

‘এখন যেতে পারি না; আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও তো,’ বিরক্ত হয়ে বলল ইলিন, তুরবিনের দিকে না তাকিয়ে অমসৃণ তাস ভাঁজতে ভাঁজতে।

‘তাহলে গোল্লায় যাও! হারতে যদি এত মজা লাগে তো হারো, আমি বললাম। জাভাল্‌শেভস্কি! চলুন আমার সঙ্গে মার্শালের ওখানে।’

দুজনে বেরিয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না, ওদের পায়ের শব্দ আর ব্লুচারের নখের আওয়াজ করিডরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাস বিলি করল না লুখনভ।

‘কী লোক রে বাবা!’ হাসতে হাসতে বলল জমিদার।

‘যাক গে, এখন আর বাধা দিতে পারবে না,’ তাড়াতাড়ি আর ফিসফিসিয়ে বলে উঠল স্থানীয় সেনাদলের অফিসার।

খেলা চলতে লাগল।

৪

সেদিনকার উপলক্ষে সাফ-করা ভাঁড়ার ঘরটায় দাঁড়িয়ে বাজনদার, মার্শালের* চাকরবাকর কোটের কফ ইতিমধ্যে তুলে দিয়ে নির্দিষ্ট একটা সংকেতে বাজাতে শুরু করেছে সাবেকী কায়দার ‘আলেক্সান্দ্র, এলিজাভেতা’ পলোনেজটি, আর মোমবাতির নরম উজ্জ্বল আলোয় জোড়ায় জোড়ায় লোকে বড়ো হলের পার্কেট-বসানো মেঝেতে আসতে আরম্ভ করেছে হালকা পা ফেলে: মার্শালের ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীর হাত ধরে প্রথমে গভর্ণর-জেনারেল, বুকে ক্যাথারিনের দরবারের তারকা চিহ্ন; তারপর গভর্ণরের স্ত্রীর হাত ধরে মার্শাল; তারপর আর সকলে, নানা দল আর উপদলে গুবের্নিয়ার শাসক শ্রেণীর পরিবারের লোকেরা; ঠিক সে সময়ে কাঁধে পাফ-বসানো

---

* প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় প্রদেশ বা জেলার অভিজাত সম্প্রদায়ের নির্বাচিত নেতা।

প্রকাণ্ড কলারওয়ালা একটা নীল ফ্রককোট গায়ে, লম্বা মোজা আর নাচের জুতো পায়ে, গোঁফে কোটের বুকের ভাঁজে আর রুমালে প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত যুইফুলের সেণ্ট ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন জাভাল্‌শেভস্কি; সঙ্গে একটি সুদর্শন হুজার, পরনে আঁটোসাটো নীল ব্রীচেস আর ভ্লাদিমির ক্রুশ ও ১৮১২ সালের পদকে অলঙ্কৃত সোনালি কাজ করা লাল টিউনিক। কাউণ্ট খুব লম্বা নন বটে, কিন্তু দেহের গঠন অত্যন্ত ভালো। স্বচ্ছ নীল অতি উজ্জ্বল চোখ আর গাঢ় কটা চুলের কুঞ্চিত ঘন গুচ্ছ তাঁর সুন্দর চেহারায় একটা বৈশিষ্ট্য এনেছে। বল-ঘরে তাঁর আগমন অপ্রত্যাশিত নয়: হোটেলে তাঁকে দেখে সেই সুদর্শন যুবকটি মার্শালকে তাঁর কথা জানিয়ে দিয়েছিল। খবরটা নানা লোকে নানা ভাবে নেয়, মোটের ওপর প্রতিক্রিয়াটা খুব বেশী ভালো হয়নি। "আমাদের দিয়ে হয়ত হাসাহাসি করবে ছোঁড়াটা," মাঝবয়সী পুরুষ ও বয়স্কা মহিলারা ভাবলেন। "যদি আমাকে নিয়ে পালান?" যুবতী ও কিশোরীদের কম বেশী মনে হল কথাটা।

পলোনেজ শেষ হবার পর নাচের জুড়িরা পরস্পরকে অভিবাদন করে আলাদা হয়েছে, মেয়েদের কাছে মেয়েরা গিয়েছে, ছেলেদের কাছে ছেলেরা, তখন গর্বিত ও খুশি ভাবে জাভাল্‌শেভস্কি কাউণ্টকে নিয়ে গেলেন গৃহকর্ত্রীর কাছে। মার্শালগিন্নীর মনে মনে ভয় পাছে কাউণ্ট সবায়ের সামনে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেন, মুখ ফিরিয়ে গর্ব মেশানো অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'খুব খুশি হলাম। আশা করি নাচবেন।' কথাটা বলার পর তাকালেন সন্দিগ্ধভাবে, যেন বলতে চান, "এর পরে কোনো মহিলাকে অপমান করাটা সত্যি ইতরজনোচিত ব্যবহার হবে!" কিন্তু কাউণ্ট নিজের সদয়তায়, মনোযোগীভাবে, হাসিখুশিতে ও সুষ্টু চেহারায় সকল সন্দেহের অবসান ঘটালেন অচিরে, আর তাঁকে নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গৃহকর্ত্রীর মুখের ভাব আশেপাশের সকলকে জানিয়ে দিল, "এ ধরনের ভদ্রলোকদের কী করে বাগ মানাতে হয় আমার জানা; কার সঙ্গে কথা বলছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছে। দেখবেন, সারা সন্ধ্যে আমার খাতির করবে।" কিন্তু ঠিক সে সময়ে গভর্ণর, যিনি এক কালে কাউণ্টের বাবাকে চিনতেন, তাঁর কাছে এসে সাদরে একপাশে নিয়ে গেলেন আলাপের জন্য; এতে স্থানীয় ভদ্রলোকদের উদ্বেগ আরো কমে গেল, কাউণ্টের কদর বেড়ে

গেল তাদের কাছে। একটু পরে জাভাল্‌শেভস্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বোনের, ঘরে কাউণ্ট ঢোকার সময় থেকে নিমেষের তরে তাঁর থেকে ডাগর কালো চোখ ফেরায়নি গোলগাল নবীনা বিধবাটি। অর্কেস্ট্রা তখন বাজাচ্ছে ওয়াল্‌জ্‌, তাকে নাচতে অনুরোধ করলেন কাউণ্ট, আর তাঁকে নিয়ে যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটা একেবারে উবে গেল তাঁর নাচের গুণে।

'সত্যি ওস্তাদ নাচিয়ে!' নীল ব্রিচেসে আচ্ছাদিত ঘরে ঘুরপাক-খাওয়া পাদুটো দেখতে দেখতে বলল একটি স্থূলকায়া জমিদার গৃহিণী আর নিজের মনে গুণতে লাগল, 'এক, দুই, তিন; এক, দুই, তিন... ওস্তাদ বটে!'

'কী দারুণ নাচিয়ে! কী দারুণ নাচিয়ে!' বলল আর একটি স্ত্রীলোক, সহরে আগতা এই মহিলাটিকে ওখানকার সমাজ ঠিক ভব্য বিবেচনা করে না। 'জুতোর কাঁটার ছোঁয়াটি পর্যন্ত কারো লাগছে না, আশ্চর্য! চমৎকার, কী হালকা পা!'

নাচের কৌশলে কাউণ্ট মুখচুন করে দিলেন গুবের্নিয়ার সেরা তিনটি নাচিয়ের: একজন হলেন গভর্ণরের শণচুলো লম্বা অ্যাডজুটাণ্ট, নাচের ক্ষিপ্রতা ও সঙ্গিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে ধরার জন্য খ্যাতি ছিল তাঁর; দ্বিতীয়টি হল অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, ওয়াল্‌জ্‌ নাচার সময়ে বিশেষ একটা পেলবভাবে দেহ দোলাতেন তিনি আর খুব হালকাভাবে তাড়াতাড়ি পা ঠুকতেন মেঝেতে; আর তৃতীয়টি একটি বেসামরিক ভদ্রজন, সবাই বলত অদ্ভুত নাচিয়ে তিনি, যে কোনো বল-নাচের প্রাণ বিশেষ, বুদ্ধিটা তাঁর খুব প্রখর না হয় নাই হল। আর সত্যি ভদ্রলোকটি বল-নাচের একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিরাম নেচে যেতেন, পালা করে নাচে ডাকতেন প্রত্যেকটি মহিলাকে, ক্বচিৎ কখনো শুধু একবারটি দাঁড়িয়ে নিয়ে ভিজে সপসপে রুমালে মুছে নিতেন শ্রান্ত অথচ খুশিতে জ্বলজ্বলে মুখ। এঁদের তিনজনকেই কাবু করে দিয়ে সেদিনকার বলে উপস্থিত সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী তিনটি মহিলার সঙ্গে কাউণ্ট নাচলেন: তাদের একজন বৃহদাকার — ধনী, সুন্দরী ও নির্বোধ; আর একজন মাঝারি সাইজের — রোগা, দেখতে খুব ভালো নয়, পরিপাটি পোষাক-পরা, আর তৃতীয়টি ছোটখাটো — চেহারা অত্যন্ত সাদাসিধে কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। অন্য

মেয়েদের সঙ্গেও নাচলেন কাউণ্ট, মানে যাদের চেহারা ভালো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে, আর সেদিন বল-নাচে সুন্দরীর অভাব ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে তাঁর ভালো লাগল জাভাল্‌শেভস্কির বিধবা বোনটিকে। তার সঙ্গে নাচলেন কোয়াড্রিল, একসেস, আর মাজুর্‌কা। শুরুতেই কোয়াড্রিলের সময়ে তার রূপের প্রশংসা করলেন, তুলনা করলেন ভেনাস, ডায়না, গোলাপ এবং অন্য কী একটা ফুলের সঙ্গে। বিধবাটি এসব সৌজন্যের সাড়াতে নিজের সুন্দর শুভ্র গ্রীবা বেঁকাল, চোখ নামিয়ে নিজের শাদা মসলিনের ফ্রকের দিকে চাইল বা হাতপাখাটা এক হাত থেকে অন্য হাতে চালান করল। 'যান, আপনি ইয়ার্কি করছেন, কাউণ্ট,' এই এবং এধরনের দুএকটা কথা বলার সময়ে তার ঈষৎ ভাঙা গলায় এমন একটা সরল অকপট ও মজার সহজ ভাব প্রকাশ পেল যে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাউণ্ট না ভেবে পারলেন না, সত্যি এ তো মেয়ে নয়, যেন ফুল; আর গোলাপ নয়, যেন সুদূরের কোন দেশে বরফের আদিম স্তূপে নিঃসঙ্গ বিকশিত আলোহিত-শুভ্র বুনো ফুল কোনো, যার গন্ধ নেই।

এই মেয়েটির অকৃত্রিম ভাব ও সরলতা তার সতেজ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে কাউণ্টের মনে এমন অদ্ভুত একটা ছাপ ফেলল যে কথাবার্তার ফাঁকে তার চোখে বা হাত আর গলার কমনীয় রেখার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করার অতি প্রবল বাসনা কয়েকবার অনেক কষ্টে দমন করলেন তিনি। কাউণ্টের মনে দাগ কাটতে পেরেছে দেখে বিধবাটি খুশি, কিন্তু কাউণ্টের হাবেভাবে এমন একটা কিছু ছিল যাতে সে বিচলিত ও ভীত বোধ করতে লাগল, যদিও কাউণ্ট যে শুধু তাকে প্রায় খোশামোদ করার মতো মনোযোগ দিচ্ছিলেন তা নয়, প্রচলিত আদবকায়দার মাপকাঠিতে অতি ভক্তি দেখাচ্ছিলেন। ছুটোছুটি করে তার জন্য নিয়ে এলেন ফলের রস, কুড়িয়ে দিলেন রুমাল, বিধবার সেবায় ইচ্ছুক গলগণ্ড-মার্কা একটি ছোকরা জমিদারের হাত থেকে বিধবাটির চেয়ার তাড়াহুড়ো করে নিলেন, টুকিটাকি আরো অনেক কাজ করে দিলেন।

মনমোহন হবার সবকিছু চেষ্টা মেয়েটির মনে বিশেষ দাগ কাটছে না দেখে তিনি মজার গল্পে তার মনোহরণের চেষ্টা করলেন, আশ্বাস দিলেন তার আদেশে তিনি শীর্ষাসন করতে তৈয়ার, মোরগের মতো ডাকতে রাজী,

জানলা দিয়ে লাফাতে বা নদীর বরফের ফাটলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হল। ছোটখাটো বিধবাটি ফূর্তির উচ্ছ্বাসে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল, দেখা গেল তার সুন্দর ঝকঝকে দাঁত। রসিক নাগরটিকে ভারি পছন্দ হল মেয়েটির। আর প্রতি মিনিটে এত বেশী মোহমুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলেন কাউণ্ট যে, কোয়াড্রিলের শেষ যখন হল তখন তিনি রীতিমত প্রেমে পড়ে গিয়েছেন।

কোয়াড্রিলের শেষে যখন সে অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী জমিদারের আঠারো বছর বয়স্ক তার বহুদিনকার ভক্ত নিষ্কর্মা ছেলেটি, গলগণ্ড-মার্কা যে ছোকরাটির হাত থেকে চেয়ার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কাউণ্ট, বিধবাটির কাছে এল তখন অতি নিস্পৃহ ভাব দেখাল সে, কাউণ্টের সঙ্গে তার উচ্ছল ভাবের শতাংশের একাংশ দেখা গেল না তার মধ্যে।

'বেড়ে লোক আপনি!' তাকে বলল বিধবা, চোখ জোড়া কিন্তু পড়ে আছে কাউণ্টের পিঠে, কিছু না ভেবে মনে মনে হিসেব করছে তাঁর কোটটা বানাতে ক'গজ সোনালি জরি লেগেছে। 'বেড়ে লোক আপনি! কথা দিয়েছিলেন আমাকে শ্লে-তে চাপিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, আর কিছু চকোলেট আনবেন।'

'কিন্তু আমি তো এসেছিলাম, আন্না ফিওদরভনা। আপনি বাড়ি ছিলেন না। বাজারের সেরা এক বাক্স চকোলেট রেখে গিয়েছিলাম,' বলল ছোকরাটি, লম্বা হলেও তার গলাটি মেয়েলি, তীক্ষ্ন।

'আপনি সব সময়ে ছুতো খুঁজে বের করেন। চাই না আপনার চকোলেট। দেখুন, এটা মনে করবেন না যে ...'

'দেখছি আমার প্রতি আপনার সুর বদলেছে, আন্না ফিওদরভনা, আর কেন তাও জানি। এটা কিন্তু আপনার খুব অন্যায়,' ছোকরাটি বলল। মনে হল আরো কিছু বলার আছে, কিন্তু উত্তেজনায় ঠোঁট এত কাঁপতে লাগল যে মুখে কথা জোগাল না।

তার কথায় কান না দিয়ে তুরবিনকে একমনে দেখতে লাগল আন্না ফিওদরভনা।

গৃহকর্তা মার্শালের চেহারাটি সম্ভ্রান্ত; দন্তহীন মোটাসোটা বৃদ্ধ

ভদ্রলোকটি কাউণ্টের কাছে গিয়ে হাত ধরে বললেন ইচ্ছে করলে তিনি পড়ার ঘরে গিয়ে ধূম ও মদ্য পান করতে পারেন।

তুরবিন বেরিয়ে যেতেই আন্না ফিওদরভনার মনে হল বল-ঘরটায় আর কিছু করার নেই; একটি রোগাসোগা আইবুড়ী বান্ধবীর হাত ধরে সে গেল সাজ-ঘরে।

'কী, ওকে মনে ধরেছে?' জিজ্ঞেস করল আইবুড়ীটি।

'মাগো, কী ভাবে যে পেছনে লেগে আছে!' আয়নার কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল আন্না ফিওদরভনা।

তার মুখ জ্বলজ্বলে, চোখে হাসি, এমন কি আরক্ত হয়ে উঠল সে, হঠাৎ নির্বাচনের সময়ে দেখা ব্যালে-নাচিয়েদের নকল করে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরপাক খেল একটা, তারপর ভরাট গলায় মিষ্টি হেসে গোড়ালি তুলে লাফ দিল একটা।

'আর জান? আমার কাছে একটা স্মৃতিচিহ্ন চেয়েছে,' বলল বান্ধবীকে। 'কিন্তু ও পাবে না এ-ক-টি জিনিসও!' কনুই পর্যন্ত লম্বা নরম চামড়ার দস্তানায় ঢাকা একটা আঙুল তুলে শেষের দুটো কথা বলল সুর করে।

যে পড়ার ঘরে তুরবিনকে নিয়ে গেলেন মার্শাল সেখানে নানা রকমের ভোদকা, লিকিওর, শ্যাম্পেন ও রেকাবী ভর্তি আনুষঙ্গিক খাবার। তামাকের ধোঁয়ায় ঝাপসা ঘর, স্থানীয় বাবু সম্প্রদায়ের লোকেরা বসে বা এদিক ওদিক পায়চারি করে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা চালিয়েছে।

'আমাদের উয়েজদের অভিজাতবর্গ ওকে নির্বাচিত করে সম্মান দেখিয়েছে বলে,' ইতিমধ্যে সুরাপানে বেশ বিচলিত, নব নির্বাচিত পুলিস ক্যাপ্টেন বলছিল, 'সবায়ের সামনে কাজে ফাঁকি দেবার কোনো অধিকার ছিল না ওর, কখনো ছিল না ...'

কাউণ্টের আবির্ভাবে আলোচনায় বাধা পড়ল। আলাপ করার জন্য সবাই দাঁড়াল; পুলিস ক্যাপ্টেনটি সবিশেষ হৃদ্যতায় তাঁর করমর্দন করে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগল যেন তিনি বল-নাচের পর নতুন হোটেলে তার দেওয়া সাপার পার্টিতে যোগ দেন, সেখানে গাইবে জিপসী কোরাস। নিশ্চয় যাবেন বলে কাউণ্ট কয়েক গেলাস শ্যাম্পেন পান করলেন তার সঙ্গে।

'কিন্তু আপনারা নাচছেন না কেন?' ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা নাচিয়ে নই,' হেসে বলল পুলিস ক্যাপ্টেন। 'বোতলের কদর আমাদের কাছে বেশী, কাউণ্ট ... ভালো কথা, ওরা সবাই, ছুঁড়ীরা সবাই আমার চোখের সামনে বড়ো হয়েছে, কাউণ্ট। আর কখনো সখনো আমি একসেস নাচতে পা বাড়াই, কাউণ্ট ... এখনো তার ক্ষমতা ধরি, কাউণ্ট।'

'তাহলে চলুন, এখনি পা বাড়ানো যাক,' বললেন তুরবিন। 'জিপসীদের কাছে যাবার আগে এখানে বেশ জমিয়ে নেওয়া যাক।'

'চলুন, মশাইরা! গৃহকর্তাকে খুশি করা যাক।'

খাস কামরায় বসে বল-নাচের শুরু থেকে মদ্যপান চলেছিল লাল মুখো কয়েকটি জমিদারের। নরম কালো চামড়ার বা সিল্কে বোনা যার যার দস্তানা এ'টে নিয়ে কাউণ্টের সঙ্গে বল-ঘরে যাবার উপক্রম সবে তারা করেছে, এমন সময়ে বাধা দিল গলগণ্ড-মার্কা ছোকরাটি; পাণ্ডুর ঠোঁটে, কোনোক্রমে অশ্রু চেপে সে এগিয়ে এল তুরবিনের কাছে।

'ভেবেছেন কাউণ্ট বলে লোকজনকে যত্রতত্র ঠেলা মেরে যাবেন, যেন বাজার এটা,' অতি কষ্টে নিশ্বাস টেনে সে বলল। 'অভদ্র ব্যবহার আর... আর ...'

আবার ঠোঁট কে'পে ওঠাতে আপনা থেকে কথার স্রোতে বাধা পড়ল।

'কী!' হঠাৎ ভ্রূকুটি করে চে'চিয়ে উঠলেন কাউণ্ট। 'কী বলছ ছোঁড়া!' ছোকরার দুটো হাত চেপে চে'চিয়ে বললেন তিনি, এত জোর মোচড় দিলেন যে অপমানে যতটা নয় ভয়ে টকটকে লাল হয়ে উঠল তার মুখ। 'আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়ার মতলব নাকি? তাই যদি হয়, আমি তৈয়ার!'

সজোরে চেপে ধরা ওর হাত তুরবিন ছেড়ে দিতেই দুটি ভদ্রলোক ছোকরার হাত ধরে নিয়ে গেল পিছনের দরজায়।

'আপনার মাথা বিগড়ে গেছে নাকি? বেজায় টেনেছেন নিশ্চয়। বলে দেবো আপনার বাবাকে। কী হয়েছে আপনার?' তারা জিজ্ঞেস করল।

'নেশা হয়নি, কিন্তু ও লোককে খালি ঠেলে সরিয়ে দেয়, মাফ পর্যন্ত চায় না। লোকটা শুয়োর, একেবারে শুয়োর!' প্রকাশ্যে কেঁদে ফেলে বলল ছোকরাটি।

কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে বাড়ি নিয়ে গেল ওকে।

'যাক গে, কাউণ্ট,' তুরবিনকে বুঝিয়ে বলল পুলিস ক্যাপ্টেন ও জাভাল্‌শেভস্কি। 'ও তো পুঁচকে ছোঁড়া, এখনো উত্তমমধ্যম খায়। বয়স মাত্র ষোলো। কী জানি কী ঢুকেছে ওর মাথায়। খেপা কুকুরে কামড়েছে নিশ্চয়। ওর বাবা অত্যন্ত মানী লোক — আমাদের ক্যাণ্ডিডেট।'

'অপমানের প্রতিশোধ না চায়, বেশ, গোল্লায় যাক।'

আর বল-ঘরে গিয়ে ঠিক আগেকার মত ফুর্তিতে কাউণ্ট সুন্দরী ছোটখাটো বিধবাটির সঙ্গে নাচলেন একসেস, পড়ার ঘর থেকে তাঁর সঙ্গে আসা ভদ্রলোকদের নাচ দেখে হাসলেন প্রাণ খুলে, আর নাচের জুড়িদের ভিড়ে পা হড়কে পুলিস ক্যাপ্টেন সটান পড়ে যাওয়াতে এমন একটা হুঙ্কার দিলেন যে সারা বল-ঘরটা গমগম করে উঠল।

৫

কাউণ্ট পড়ার ঘরে গেলেন যখন তখন তাঁর প্রতি উদাসীন হবার ভান করা উচিত এই ভেবে আন্না ফিওদরভনা ভাই-এর কাছে গিয়ে নিস্পৃহ সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা দাদা, আমার সঙ্গে যে হুজারটি নাচল, কে সে?' অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার যথাসাধ্য তাকে বোঝালেন কত মহান লোক হল এই হুজার, এও জানালেন যে, শুধু পথে টাকা চুরি গেছে বলে সহরে থেকে গিয়ে ও এসেছে বল-নাচে; তিনি নিজে একশ রুবল ধার দিয়েছেন বটে কাউণ্টকে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত সামান্য, বোন কি আরো দুশ রুবল ধার দিতে পারে! সঙ্গে সঙ্গে বললেন যেন কথাটা কাউকে না বলে, বিশেষ করে কাউণ্টকে। সে দিনই টাকাটা ভাইকে পাঠিয়ে দেবার আর বিষয়টা গোপন রাখার কথা দিল আন্না ফিওদরভনা, কিন্তু একসেসটা নাচের সময় যত দরকার তত টাকা দেবার কথাটা কাউণ্টকে নিজে বলার

অদম্য ইচ্ছে হল তার। কিছু সময় গেল বলার সাহসটা আনায়, লাল হয়ে উঠে ইতস্তত করে অবশেষে বহু কষ্টে কথাটি তুলল।

'দাদা বলল পথে আপনার বিপদ ঘটেছিল, কাউণ্ট; আর এখন আপনার হাতে টাকা নেই। দরকার হলে আমার কাছ থেকে নেবেন কি? নিলে অত্যন্ত সুখী হবো।'

কথাগুলো বলেই কেন জানি ঘাবড়িয়ে লাল হয়ে উঠল আন্না ফিওদরভনা। কাউণ্টের মুখ থেকে আনন্দের দীপ্তি দপ করে নিভে গেল।

'আপনার দাদাটি নীরেট মূর্খ!' রূঢ়ভাবে তিনি বললেন। 'জানেন তো, পুরুষ পুরুষকে অপমান করলে ডুয়েল লড়া হয়। কিন্তু কোনো মেয়ে পুরুষকে অপমান করলে কী হয় জানেন?'

বেচারী আন্না ফিওদরভনা অনুভব করল লজ্জায় তার গলা আর কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে একটিও কথা বলল না সে।

'মেয়েটিকে চুমু খাওয়া হয় প্রকাশ্যে,' কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন কাউণ্ট। 'দিন আপনার হাতে চুমু খাই,' বেশ কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন নরম গলায়, মহিলাটির বিড়ম্বনায় করুণা হল তাঁর।

'ও, কিন্তু এখন নয়,' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আন্না ফিওদরভনা।

'কখন? কাল তো সকাল সকাল চলে যাবো... তাছাড়া, ওটা তো আপনার কাছে পাওনা।'

'কিন্তু এই অবস্থায় পারা যায় না,' মৃদু হেসে আন্না ফিওদরভনা বলল।

'তাহলে আজকেই আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিন, আপনার হাতে চুমু খাবো। সুযোগটা নিজে করে নেবো।'

'কী করে?'

'সেটা আপনার ব্যাপার নয়। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সবকিছু করতে পারি। কী বলুন? বেশ?'

'বেশ।'

শেষ হল একসেস। আর একটি মাজুর্কা নাচা হল আর রুমাল লুফে ধরে, এক হাঁটুতে বসে ওয়ারশ-র সেই বিশেষ কায়দায় দুই পায়ের

জ্যুতোর কাঁটা ঠুকে কাউণ্ট এমন অদ্ভুত সব কসরৎ দেখালেন যে তাসের টেবিল ছেড়ে ব্যুড়োরা এল নাচ দেখতে, হার স্বীকার করলেন সেরা নাচিয়ে সেই অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি। সাপার খাওয়া হল। নাচা হল 'ঠাকুর্দা' নাচ, বিদায় নিতে শ্যুর্ করল অতিথিরা। সারা সময়টা ছোটখাটো বিধবাটির ম্যুখ থেকে একবারও চোখ সরাননি কাউণ্ট। তিনি যে বলেছিলেন বরফের ফাটলে তার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈয়ার কথাটি মিছে নয়। খেয়াল হোক, প্রেম হোক, একগ্যঁয়েমী হোক তাঁর মনপ্রাণ সে সন্ধ্যায় একটিমাত্র বাসনায় সংহত — মেয়েটির সঙ্গে দেখা করা, তাকে ভালোবাসা। আন্না ফিওদরভনা গ্যহকর্ত্রীর কাছে বিদায় নিচ্ছে দেখে তিনি চাকরের ঘরে এক ছ্যুটে গেলেন, ওভারকোট না পরে সেখান থেকে দৌড়লেন উঠনে যেখানে গাড়িগ্যুলো দাঁড়িয়ে।

'আন্না ফিওদরভনা জাইৎসেভার গাড়ি আনো!' হাঁকলেন তিনি। অলিন্দের দিকে এগোল লণ্ঠন দেওয়া চার সীটের একটা উঁচু গাড়ি।

'থামো!' হাঁটু পর্যন্ত বরফ, গাড়ির দিকে দৌড়ে যেতে যেতে বললেন কোচম্যানকে।

'কী চাই?' ফিরে জিজ্ঞেস করল সে।

'ভেতরে ঢুকবো,' চলতি গাড়ির দরজা খ্যুলে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে জবাব দিলেন কাউণ্ট। 'থামা বলছি, গর্দভ কোথাকার!'

সামনের ঘোড়াজোড়ার চালককে হেঁকে কোচম্যান বলল, 'থাম্, ভাস্কা!' ঘোড়াগ্যুলোর লাগাম টেনে ধরল। 'অন্য লোকের গাড়িতে ঢুকতে যাবেন কেন? এ গাড়িটা শ্রীমতী আন্না ফিওদরভনার, আপনার তো নয়, হ্যুজ্যুর।'

'চুপ, আহাম্মক কোথাকার! এই নে একটা র্যুবল, নেমে দরজাটা বন্ধ করে দে তো দেখি,' বললেন কাউণ্ট। কিন্তু কোচম্যান নড়ল না দেখে তিনি নিজেই পাদানিটা তুলে নিয়ে জানলা খ্যুলে কোনক্রমে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন। ভিতরে ছাতা-পড়া একটা গন্ধ, আর গন্ধ পোড়া লোমের কুচির, অন্য সব প্যুরনো গাড়িতে যেমন, বিশেষ করে যাদের গদি ইত্যাদিতে সোনালি জরির কাজ করা। পাতলা ব্যুট আর ব্রিচেসে ঢাকা কাউণ্টের পাদ্যুটো হাঁটু পর্যন্ত ভিজে বরফে

সিক্ত হয়ে যাওয়াতে ঠাণ্ডায় কনকন করছে, বাস্তবিক সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। ওপরে নিজের সীটে বসে কোচম্যানের গজগজানি, মনে হল নামার উপক্রম করছে। কিন্তু কাউণ্ট যেন বধির, কোনো অনুভূতি নেই। মুখটা জ্বলছে, হাতুড়ির মত পিটছে বুক। হলদে চামড়ার পেটিটা আঁকড়ে ধরে পাশের জানলা দিয়ে মাথা বের করে দিলেন, একটি প্রত্যাশায় সমস্ত জীবন তাঁর সংহত। বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না। বারান্দায় কে যেন হাঁকল, 'শ্রীমতী জাইৎসেভার গাড়ি নিয়ে এসো!' আস্তে লাগাম আছড়াল কোচম্যান, উঁচু স্প্রিং-এ দুলে উঠল গাড়িটা, আর বাড়ির আলো-ভরা জানলাগুলো একটার পর একটা পেরিয়ে গেল গাড়ির জানলা।

'দেখ বাবা, আর্দালিকে বলিস না যেন আমি এখানে, বেটা বদমাস,' কোচম্যানের দিকের জানলা দিয়ে মাথা বের করে বললেন কাউণ্ট। 'বললে চাবকাবো, না বললে আরো দশ রুবল।'

জানলাটা দড়াম করে বন্ধ করতে না করতে গাড়িটা একবার টাল খেয়ে থেমে গেল। গাড়ির কোণে গুটিশুটি হয়ে বসে, নিঃশ্বাস চেপে এমন কি চোখ বুজে ফেললেন কাউণ্ট, তাঁর তীব্র প্রত্যাশা যদি ব্যাহত হয় কোনো কারণে সে ভয়টা এত প্রবল। দরজাটা খুলে গেল, পাদানির ধাপ বসানোর শব্দ একের পর এক, মেয়েলি গাউনের খসখস, ছাতার গন্ধওয়ালা গাড়িটাতে ভেসে এল যুইফুলের গন্ধ, সিঁড়ির ধাপে ছোট ছোট পায়ের হালকা আওয়াজ, আর আন্না ফিওদরভনা নিজের কোটের প্রান্তে কাউণ্টের পা ঘষটে রুদ্ধশ্বাসে নিঃশব্দে বসে পড়ল তাঁর পাশের সীটটায়।

কাউণ্টকে সে দেখেছিল কিনা কেউ হলপ করে বলতে পারে না, এমন কি সে নিজেও না। কিন্তু যখন তিনি তার হাত ধরে বললেন, 'এবার তাহলে আপনার করকমলে চুমো খাই,' তখন তার ভীতি বিশেষ দেখা গেল না, কোনো কথা বলল না সে, আর তক্ষুনি দস্তানার বেশ ওপরে তার বাহু চুমোয় চুমোয় ভরে গেল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

'কিছু একটা বলুন। চটেননি তো?' কাউণ্ট জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে সে কেবল বসল আরো কোণ ঘেঁষে কিন্তু হঠাৎ, কেন জানি কেঁদে উঠে মাথা গুঁজল কাউণ্টের বুকে।

৬

নব নির্বাচিত পুলিস ক্যাপ্টেন ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ, অশ্বারোহী বাহিনীর সেই অফিসার ও অন্যান্য বাবুরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে নতুন হোটেলে বসে জিপসীদের গান শুনেছে ও মদ্যপান করেছে, এমন সময়ে কাউণ্ট এসে যোগ দিলেন। তাঁর গায়ে ভালুক লোমের আস্তরণ দেওয়া নীল রঙের একটি বনাতের ক্লোক; আন্না ফিওদরভনার বিগত স্বামীর সম্পত্তি ছিল জিনিসটা।

'এই যে হুজুর, আপনার আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম বলতে গেলে!' কাউণ্টের কোট খোলার জন্য প্রবেশপথের দরজায় দৌড়ে যেতে যেতে, শাদা দাঁতের ঝলকে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলল একটি কালো চুল টেরা চোখ জিপসী। 'লেবেদিয়ানের পর থেকে আপনার সঙ্গে আর মুলাকাৎ হয়নি... স্তেশা তো আপনার জন্যে হেদিয়ে মরছে...'

ছুটতে ছুটতে স্তেশাও এল দেখা করার জন্য। সুঠাম কমবয়সী জিপসী মেয়েটির বাদামি গালে উষ্ণ রক্তাভা, গভীর কালো চোখের জ্বালাময়ী দীপ্তি দীর্ঘ আঁখি পল্লবের ছায়ায় স্নিগ্ধ।

'এই যে, আমাদের কাউণ্টবাহাদুর এসেছেন! পেয়ারের কাউণ্ট আমাদের! কী মজা!' খুশিতে হেসে চাপা গলায় বলল সে।

তাঁকে দেখে খুশির ভান করে এমন কি ইলিউশ্‌কা ছুটে এল দেখা করার জন্য। যত বুড়ী আর মাঝবয়সী মেয়ে আর ছুঁড়ীরা লাফিয়ে উঠে ছেঁকে ধরল তাঁকে। কারো কারো ধারণা যে তারা তাঁর বিশেষ পেয়ারের লোক, আবার কেউ কেউ ভাবে যে ক্রুশ বিনিময় করেছেন বলে তিনি তাদের দোস্ত।

সোমত্ত জিপসী মেয়েদের প্রত্যেকের ঠোঁটে চুমু খেলেন তুরবিন; জিপসী বুড়ী আর পুরুষেরা চুমু খেল তাঁর কাঁধে আর হাতে। তিনি আসাতে জমিদারবাবুরাও অতিশয় খুশি, আরো বেশি করে খুশি এই জন্য যে চরমে পৌঁছিয়ে এখন ভাটার দিকে চলেছে হৈহুল্লোড়। অতি মাত্রায় পানভোজনের পরের অরুচি বোধ করতে শুরু করেছে সবাই।

স্নায়ুর উত্তেজনা ঘটাবার শক্তি আর নেই মদের, পাকস্থলীর বিড়ম্বনা ঘটাচ্ছে শুধু। ক্ষমতায় যতখানি কুলোয় ততখানি ফূর্তি করে নিয়ে অতিথিরা এখন এ-ওর কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে। সবকটা গান গাওয়া সারা, মাথায় তালগোল পাকিয়ে সেগুলো আনছে শুধু বিশৃংখলা আর অপচয়ের একটা ছাপ। কসরৎ যত অভিনব বা দুঃসাহসী হোক, সবাই টের পেয়েছে যে এতে আর মজা পাওয়া ভার। একটা বুড়ীর পদতলে মেঝেতে বেঢপভাবে শুয়ে আছে পুলিস অফিসারটি।

'শ্যাম্পেন!..' পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কাউণ্ট এসেছেন!.. শ্যাম্পেন!.. উনি এসেছেন!.. লেয়াও শ্যাম্পেন!.. চৌবাচ্চা শ্যাম্পেনে ভরে নাইবো আমি ... অভিজাত মহোদয়গণ! আপনাদের মতো মহোদয়দের সঙ্গ আমার কী ভালো না লাগে!.. স্তেশা! ধরো তো "পায়ে চলা পথ" গানটা!'

তারি মতো নেশা ধরেছে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের, কিন্তু তাঁর চেহারাটা অন্য রকম। সোফার একপাশে, লিউভাশা নামের একটি দীর্ঘাঙ্গী রূপসী জিপসী মেয়ের খুব কাছ ঘেঁষে বসে তিনি চোখ পিটপিট করে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন ঘোরটা কাটানোর জন্য, আর ঘ্যানর ঘ্যানর করে বারবার তাকে ফিসফিসিয়ে সাধছেন তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যেতে। মৃদু হেসে লিউভাশা শুনছে তাঁর কথা, যেন তিনি যা বলছেন সেটা একাধারে অত্যন্ত মজার আর একটু করুণ, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সামনের চেয়ারের পেছনে দাঁড়ানো তার স্বামী টেরা চোখ সাশকার দিকে। অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের প্রেম নিবেদনের উত্তরে ঝুঁকে লিউভাশা তাঁর কানে কানে অনুরোধ জানাল যেন তিনি কিছু ফিতে আর সেণ্ট কিনে দেন, কিন্তু কেউ টের না পায় যেন।

'হুররে!' কাউণ্ট ঘরে আসাতে চেঁচিয়ে উঠলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার।

সেই সুদর্শন যুবাটি তখন মুখে উৎকণ্ঠার ভাব এনে অস্বাভাবিক দৃঢ় পায়ে পায়চারি করতে করতে গুনগুন করে গাইছে 'হারেমে বিদ্রোহের' একটি সুর।

বাড়ির কর্তাব্যক্তি একটি বৃদ্ধ বাবুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে লোভে পড়ে এসেছিলেন জিপসীদের এখানে, তাঁকে ওরা বলে যে তিনি না এলে জমবে না মোটে, তাহলে ওদের বরং থেকে যাওয়া ভালো। পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত পা ছড়িয়ে সোফায় শুয়ে আছেন, আর কেউ তাঁকে নজর দিচ্ছে না একেবারে। একটি রাজকর্মচারী ফ্রক-কোট খুলে পা টেবিলে রেখে বসে আছে, নিজে কী রকম হুল্লোড়ে সেটা দেখাবার জন্য মাথার চুল বিস্রস্ত করে দিয়েছে। কাউণ্ট ঘরে ঢুকতেই সে সার্টের কলার খুলে টেবিলে আরো একটু উঁচু হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল। কাউণ্ট আসার পর মোটের ওপর দলটা আগেকার চেয়ে সজীব হয়ে উঠল।

এতক্ষণ অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল জিপসীরা, তারা এখন আবার গোল হয়ে বসল। একলা-গাইয়ে স্তেশাকে কোলে বসিয়ে কাউণ্ট হুকুম দিলেন আরো শ্যাম্পেনের।

ইলিউশ্‌কা গিটার হাতে স্তেশার সামনে দাঁড়িয়ে 'প্লিয়াসকা' শুরু করল, তার অর্থ হল একটা নির্দিষ্ট পালায় 'রাস্তা দিয়ে যখনি চলে', 'ওহে হুজার বাহাদুর ...' আর 'কানে শোনো, মনে বোঝো ...' গোছের সব জিপসী গান। চমৎকার গাইল স্তেশা। ওর গমকে আসা ভরাট মিহি নমনীয় গলা, মন ভোলানো হাসি, বাসনাতীব্র হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি, গানের তালে আপনা থেকে তাল ঠোকা ছোট পা, কোরাসের শুরুতে বন্য স্বল্প চীৎকার — সবকিছু মিলিয়ে নাড়া দিল মনের একটি তারে যেটি জমাট কিন্তু যেটি বাজে ক্বচিৎ কখনো। বোঝা যায় যে যা কিছু ও গায় প্রাণ ঢেলে গায়। গিটারে সঙ্গত দিতে দিতে ইলিউশ্‌কা গানের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, সেটা ধরা পড়ছে পিঠ আর পায়ের ছোট ছোট নড়াচড়ায়, মৃদু হাসিতে, তার সমস্ত সত্তায়; গানের তালে তালে মাথা নাড়তে নাড়তে স্তেশার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনছে এত মনোযোগে আর এত উৎকণ্ঠায় যেন এর আগে কখনো শোনেনি গানটা। প্রতিবার গানের শেষ সুর মিলিয়ে যেতে খাড়া হয়ে বসে, যেন দুনিয়ার সবকিছুর ঊর্ধ্বে মনে হচ্ছে নিজেকে এমনভাবে সগর্বে ও সজোরে হাঁটু দিয়ে ধাক্কায় গিটারটা তুলে চট করে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল সে আর নিজে

মাটিতে পা ঠুকে, চুল পেছনে ঝাঁকিয়ে ভ্রূকুটি করে তাকাচ্ছিল কোরাসের দিকে। তারপর শরীরের সমস্ত পেশীর বিস্তারে আবার নাচের শুরু... আর বেজে ওঠে বিশটি জোরালো বলিষ্ঠ গলা, প্রত্যেকের চেষ্টা সবচেয়ে অভিনব ও স্বকীয়ভাবে সুর মিলিয়ে যাবার। বুড়ীরা চেয়ারে বসে লাফাচ্ছে, রুমাল নাড়াচ্ছে, গানের তালে তালে দাঁত বের করে চেঁচিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে একে অন্যের কণ্ঠস্বর। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে, মাথা হেলিয়ে গলার শির ফুলিয়ে ভারি গলা ছেড়ে গাইছে পুরুষেরা।

কোনো সুর উঁচুর দিকে স্তেশা ধরলেই যেন তাকে সাহায্য করার জন্য ইলিউশ্‌কা গিটারটা কাছে ধরছে তার, আর স্তেশার নিচু পর্দার গমক শোনা যাচ্ছে বলে সুদর্শন যুবাটি উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠছে।

নাচের সুর গাইতে দুনিয়াশা এগিয়ে এল, কাঁধ আর বুক তার কাঁপছে, কাউণ্টের সামনে ঘুরপাক দিয়ে ভেসে চলে গেল ঘরের মধ্যিখানে; তখন তুরবিন লাফিয়ে উঠে জ্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোগ দিলেন তার সঙ্গে, পায়ের এত কসরৎ দেখালেন যে জিপসীরা এ ওর দিকে তাকিয়ে তারিফ করে হাসতে লাগল।

তুর্কীর মতন পায়ের ওপর পা চাপিয়ে বসে পুলিস ক্যাপ্টেন বুক ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেয়াবাৎ!' তারপর কাউণ্টের পা চেপে ধরে গোপনে জানিয়ে দিল সে এখানে দু হাজার রুবল নিয়ে এসেছিল, এখন পড়ে আছে মাত্র পাঁচশ, আর কাউণ্ট অনুমতি দিলে তিনি যা চাইবেন তাই করবে। বাড়ির কর্তাব্যক্তিটি জেগে উঠে বললেন বাড়ি যাবেন, কিন্তু যেতে দেওয়া হল না তাঁকে। সুদর্শন যুবাটি একটি জিপসী মেয়েকে অনুনয় বিনয় করল তার সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচতে। কাউণ্টের সঙ্গে দোস্তি জাহির করার জন্য উদগ্রীব অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে।

বললেন, 'প্রাণের দোস্ত, আমাদের ছেড়ে কেন চলে গিয়েছিলে, অ্যাঁ?' উত্তর দিলেন না কাউণ্ট, বোঝা গেল তাঁর মন অন্য কিছুতে পড়ে আছে। 'কোথায় গিয়েছিলে? তুমি বাবা ঘুঘু লোক! কোথায় যাওয়া হয়েছিল জানি।'

কী কারণে যেন এই গায়ে-পড়া ভাব ভালো লাগল না কাউণ্টের। না হেসে, কিছু না বলে তিনি কটমট করে তাকিয়ে রইলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটির মুখে, তারপর হঠাৎ এমন অভদ্র আর অপমানকর খিস্তি শুরু করে দিলেন যে অফিসারটি থতমত খেয়ে ঠিক করতে পারলেন না ব্যাপারটা ইয়ার্কি হিসেবে নেবেন কিনা। শেষ পর্যন্ত হেসে তিনি তাঁর জিপসী মেয়েটির কাছে ফিরে আশ্বাস দিতে লাগলেন যে ইস্টারের পর তাকে নির্ঘাৎ সাদি করবেন।

গাওয়া হল আর একটি গান, আরো একটি, আরো নাচ চলল, এ-ওর খাতিরে গাইল আবার, সবাই ভাবল সময় কাটছে চমৎকার। শ্যাম্পেনের স্রোত বইল। অনেক খেলেন কাউণ্ট। চোখ ঝাপসা হয়ে এল বটে, কিন্তু পা টলমল করল না; আগের চেয়ে ভালো নাচলেন তিনি, পরিষ্কার গলায় কথা বললেন, যোগ দিলেন জিপসী কোরাসে, আর স্তেশা যখন গাইল 'প্রেমের পাখায় কাঁপন লেগেছে', তখন তানলয় যোগালেন। গানের মাঝখানে হোটেলের মালিক এসে অতিথিদের বলল বিদায় নিতে হবে এবার, কেননা প্রায় ভোর তিনটে হয়ে গেছে।

তার গর্দান ধরে কাউণ্ট হুকুম দিলেন উবু হয়ে বসে আর উঠে একটা নাচ নাচতে। রাজী হল না সে। চট করে একটা শ্যাম্পেনের বোতল তুলে নিয়ে কাউণ্ট মালিককে ডিগবাজি খাইয়ে অন্যদের তাকে সে অবস্থায় ধরে রাখতে বলে সমস্ত বোতলটা ঢেলে দিলেন তার ওপর; চারিদিকে হাসির হর্‌রা উঠল।

ফরসা হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। কাউণ্ট ছাড়া আর সবাই ফ্যাকাশে আর শ্রান্ত।

'এবার কিন্তু আমার মস্কো যাত্রার সময়,' উঠে পড়ে হঠাৎ তিনি বললেন। 'চলুন মশাইরা, হোটেলে গিয়ে আমাকে এগিয়ে দিন। চা খাওয়া যাবে কিছু।'

বাড়ির কর্তাব্যক্তি সেই ঘুমন্ত বৃদ্ধটি ছাড়া আর সবাই সায় দিল। তাঁকে রেখে যাওয়া হল সেখানে। দরজায় দাঁড়ানো তিনটি শ্লেজে সবাই কোনোক্রমে জায়গা করে নিয়ে চলল হোটেলে।

৭

'ঘোড়া জোতো,' অতিথি ও জিপসীদের সঙ্গে সদলবলে হোটেলের বৈঠকখানায় ঢুকে চেঁচিয়ে বললেন কাউণ্ট। 'সাশা! জিপসী সাশা নয়, ওহে আমাদের সাশা, ডাক-স্টেশন মাস্টারকে বল যে বাজে ঘোড়া দিলে শরীরে আর ছাল চামড়া আস্ত থাকবে না। আর লেয়াও চা! জাভাল্‌শেভস্কি, চায়ের ব্যবস্থা করো, ইতিমধ্যে ইলিনের ঘরে গিয়ে দেখে আসি ওর হালৎ কেমন,' বলে করিডরে বেরিয়ে গিয়ে উলানের ঘরের দিকে চললেন তুরবিন।

সবে খেলা শেষ করেছে ইলিন। শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত হেরে ঘোড়ার লোমের ছেঁড়া সোফাটাতে উবুড় হয়ে শুয়ে একটা একটা করে লোমের কুচি টেনে বের করে মুখে দিয়ে কামড়ে থুতু করে ফেলে দিচ্ছে। তাস ছড়ানো একটা টেবিলে দুটো মোমবাতি, একটা একেবারে জ্বলে গিয়ে পেঁাছেছে কাগজ পর্যন্ত; বাতিগুলোর শিখা অসহায়ভাবে পাল্লা দিচ্ছে জানলা থেকে আসা ভোরের আলোর সঙ্গে। উলানের মন থেকে সব চিন্তা উধাও; জুয়ার ঘোরের ঘন কুয়াশায় চাপা পড়েছে সমস্ত মানসিক বৃত্তি; এমন কি অনুশোচনার বোধ পর্যন্ত তার নেই। একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করল অতঃকিম, কপর্দকহীন অবস্থায় কী করে জায়গাটা ছেড়ে যাবে। রেজিমেণ্টের পোনেরো হাজার রুবল ফেরৎ দেবে কেমন করে, রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার কী বলবেন, কী বলবেন মা, বন্ধুবান্ধবেরাই বা কী বলবে — আর সঙ্গে সঙ্গে এত ভয় পেল, এত বিতৃষ্ণা হল নিজের প্রতি যে, সবকিছু মন থেকে মুছে ফেলার জন্য তড়াক করে উঠে পায়চারি শুরু করল, মেঝের তক্তার ফাটলগুলোর ওপর যাতে পা পড়ে সযত্নে সে দিকে নজর রেখে। আর একবার চুলচেরাভাবে ভেবে দেখল খেলার সমস্ত খুঁটিনাটি। স্পষ্ট মনে পড়ল একবার প্রায় জিতেছিল আর একটু হলে — হাতে এসেছিল একটা নলা আর গোলাম, বাজি রেখেছিল দু হাজার রুবল: ডাইনে — রাণী, বাঁয়ে — টেক্কা; ডাইনে রুইতনের রাজা, আর সব খতম। ছক্কাটা ডাইনে আর রুইতনের রাজাটা বাঁয়ে থাকলে হারের টাকা সব উশুল হত, আর সবকিছু বাজি ধরে জিতে নিত আরো পোনেরো হাজার রুবল। তাহলে রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারের কাছ থেকে

কেনা যেত একটা পোষাকী ঘোড়া, তাছাড়া আরো দুটো ঘোড়া, আর একটা ফিটন! তারপর কী? সত্যি সত্যি বেড়ে হত তাহলে!

আবার সোফায় শুয়ে পড়ে লোমের কুচি চিবোতে লাগল সে।

"সাত নম্বর ঘরে ওরা গাইছে কেন?" ভাবল। "তুরবিনের ঘরে ফুর্তি চলেছে নিশ্চয়ই। ওখানে গিয়ে দলে ভিড়ে মাতাল হয়ে গেলে হয়।"

ঠিক সে সময়ে ঘরে ঢুকলেন কাউণ্ট।

'কী, সবকিছু সাফ করে নিয়েছে তো?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"মটকা মেরে থাকবো," ইলিন ভাবল। "নইলে কথা বলতে হবে, অথচ ঘুম পাচ্ছে।"

কিন্তু তুরবিন কাছে এসে মাথায় হাত বোলালেন।

'তাহলে, দোস্ত, সবকিছু সাফ করে নিয়েছে তো? সব গেছে? কথা বলো!' জবাব দিল না ইলিন।

হাত ধরে টানলেন কাউণ্ট।

'হ্যাঁ, হেরেছি। তাতে তোমার কী!' ঘুম-জড়ানো স্বরে বিরক্তি আর উদাসীনতা প্রকাশ করে বিড়বিড় করে বলল ইলিন, পাশ ফিরল না পর্যন্ত।

'সব গেছে?'

'হ্যাঁ। তাতে হয়েছে কী? সবকিছু। তাতে তোমার কী?'

'শোনো, বন্ধুর মতো সত্যি কথাটা বলো তো আমাকে,' বললেন কাউণ্ট। মদে তাঁর মনে জেগেছে কোমল সব ভাব, ইলিনের মাথায় তিনি হাত বোলাতে লাগলেন। 'সত্যি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। খুলে ঠিক বলো তো: রেজিমেণ্টের টাকা খুইয়ে থাকলে তোমাকে বাঁচাবো; সময় থাকতে বলো রেজিমেণ্টের টাকা ছিল?'

সোফা থেকে তড়াক করে নেমে পড়ল ইলিন।

'সত্যি কথা যদি শুনতে চাও তাহলে এমনভাবে কথা বলো না, যেন আমি ... যেন আমি ... তাহলে দয়া করে কোনো কথাই বলো না। আমার একমাত্র পথ হল গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া!' হাতে মাথা গুঁজে কেঁদে ফেলে গভীর হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল সে, যদিও মুহূর্ত খানেক আগে স্বপ্ন দেখছিল পোষাকী ঘোড়ার।

'উঃ, একেবারে খুকির মতো! এরকম হালৎ কার না হয়েছে! কিসসু না; সবকিছু ঠিক করে দেওয়া যাবে। আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করো।'

বেরিয়ে গেলেন কাউণ্ট।

'কোন ঘরে জমিদার লুখনভ থাকেন?' জিজ্ঞেস করলেন ছোকরা চাকরকে।

ছোকরা বলল দেখিয়ে দেবে ঘরটা। লুখনভের খাস চাকর আপত্তি জানিয়ে বলল কর্তা সবে ঘরে ঢুকে কাপড়চোপড় ছাড়ছেন, কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে কাউণ্ট ভেতরে গেলেন। ড্রেসিং-গাউন পরে টেবিলের ধারে বসে লুখনভ সামনে গাদা-করা ব্যাঙ্ক-নোট গুণছিল। টেবিলে তার অত্যন্ত প্রিয় রাইনের মদ এক বোতল। তাসে জেতার ফলে নিজেকে তোয়াজ করার অনুমতি দিয়েছে সে। চশমার ফাঁক দিয়ে কঠিন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে কাউণ্টের দিকে তাকাল লুখনভ, যেন চেনে না তাঁকে।

দৃঢ় পদক্ষেপে টেবিলের কাছে গিয়ে কাউণ্ট বললেন, 'মনে হচ্ছে আমায় চিনতে পারছেন না।'

'আপনার কী সেবায় লাগতে পারি?' চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করল লুখনভ।

'আপনার সঙ্গে তাস খেলতে চাই,' সোফায় বসে বললেন তুরবিন।

'এখনি?'

'হ্যাঁ।'

'অন্য কোনো সময়ে অত্যন্ত খুশি হবো, কাউণ্ট, কিন্তু এখন আমি ক্লান্ত, শুতে যাচ্ছিলাম। একটু মদ খাবেন? চমৎকার মদ।'

'আমি এখনি একটু খেলতে চাই।'

'আজ আর খেলার কোনো ইচ্ছে নেই। অন্য ভদ্রলোকদের কেউ কেউ হয়ত আপনার সঙ্গে খেলবেন; আমি খেলবো না, কাউণ্ট। আশা করি মাফ করবেন।'

'তাহলে আপনি খেলবেন না?'

কাউণ্টের ইচ্ছেমত খেলতে পারছে না বলে দুঃখিত, সেটা বোঝাবার জন্য কাঁধ অল্প ঝাঁকাল লুখনভ।

'কোনোমতেই খেলবেন না?'

আবার কাঁধের অল্প ঝাঁকুনি।

'আপনাকে অত্যন্ত অনুরোধ করছি... খেলবেন, না খেলবেন না?'

কোনো সাড়া নেই।

'খেলবেন?' আবার বললেন কাউণ্ট। 'দেখুন!'

তবু চুপ করে রইল লুখনভ; চট করে চশমার ওপর দিয়ে তাকাল কাউণ্টের কালো হয়ে আসা মুখে।

'খেলবেন?' চেঁচিয়ে উঠে কাউণ্ট টেবিলে এত জোরে একটা ঘুঁষি লাগালেন যে রাইন মদের বোতলটা পড়ে গেল, উপছে বেরিয়ে এল মদ। 'আপনি তো ঠকিয়ে জিতেছেন। খেলবেন? বারবার তিন বারের মতো জিজ্ঞেস করছি।'

'বলেছি তো খেলবো না। আপনার ব্যবহারটা অদ্ভুত, কাউণ্ট! বাড়ি চড়াও হয়ে গলা কাটার ভয় দেখানো ভদ্রতা নয়।' চোখ না তুলে মন্তব্য করল লুখনভ।

অল্প কিছুক্ষণ চুপচাপ। ক্রমশ শাদা হয়ে যেতে লাগল কাউণ্টের মুখ। হঠাৎ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাতে হতভম্ব হয়ে গেল লুখনভ। টাকাগুলো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে সোফায় পড়ে গিয়ে এমন বুনো ও তীক্ষ্ম সুরে চেঁচিয়ে উঠল যেটা তার মতো সদা ধীরস্থির ও ভব্য মানুষের কাছ থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিত। টেবিলের বাকি টাকাগুলো তুলে নিলেন তুরবিন, প্রভুর চীৎকার শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছিল খাস চাকরটা, তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'যদি অপমানের প্রতিশোধ চান, তাহলে আমি তৈয়ার, আরো আধ ঘণ্টা ঘরে থাকবো,' দরজায় ফিরে এসে বললেন কাউণ্ট।

'চোর! বদমাস!' ঘরের ভেতর থেকে কথাগুলো এল। 'আদালতে মোকাবিলা হবে এর!'

সব ঠিক করে দেবেন বলে কাউণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাতে বিশ্বাস হয়নি ইলিনের, তখনো সোফায় শুয়ে আছে সে, হতাশার কান্নায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে ভিড় করে আসা নানা ধরনের অদ্ভুত ভাবকে ভেদ করে কাউণ্টের স্নিগ্ধ দরদ তার মনে জাগিয়েছিল নিজের

দুরবস্থার উপলব্ধি, আর সে ভাবটা তখনো কেটে যায়নি। আশায় ভরপুর যৌবন, আত্মসম্মান, বন্ধুবান্ধবদের খাতির, প্রেম ও বন্ধুত্বের স্বপ্ন — চিরতরে বিদায় নিয়েছে সব। অশ্রুর উৎস শুকিয়ে আসছে ক্রমশ, অত্যন্ত ধীর একটা হতাশার বোধ ক্রমশ দৃঢ়ভাবে তাকে আচ্ছন্ন করছে, ক্রমশ নাছোড়বান্দাভাবে মনে আসছে আত্মহত্যার চিন্তা, সে চিন্তায় বিভীষিকা ও বিতৃষ্ণার বোধ আর নেই। এ সময়ে কানে এল কাউণ্টের পায়ের বলিষ্ঠ শব্দ।

তুরবিনের মুখে তখনো ক্রোধের রেশ লেগে আছে, অল্প কাঁপছে হাত, কিন্তু চোখে সদয় মেজাজের, আত্মসন্তোষের একটা দীপ্তি।

'এই যে, জিতে আদায় করে নিয়েছি,' একতাড়া নোট টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন। 'গুনে দেখো সব আছে কিনা। আর তাড়াতাড়ি এসো বৈঠকখানায়, আমি শীগগিরই চলে যাচ্ছি,' আরো বললেন তিনি, উলানের মুখে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস না দেখার ভান করে। একটা জিপসী সুর শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

৮

কোমরবন্ধটা শক্ত করে এঁটে সাশা জানিয়ে দিল ঘোড়া তৈয়ার, কিন্তু জোর করে বলল যে প্রথমে গিয়ে কাউণ্টের ওভারকোটটা নিতে হবেই, ফারের কলার দেওয়া যে কোটটার মূল্য হবে প্রায় তিনশ রুবল, আর মার্শালের ওখানে যে নচ্ছারটা তার বদলে বিশ্রী নীল ক্লোকটা দিয়েছে সেটা ফিরিয়ে না দিলে চলবে না। তুরবিন কিন্তু বললেন ওভারকোট সন্ধানের কোনো দরকার নেই; সাজ পোষাক করতে নিজের ঘরে গেলেন।

জিপসী মেয়েটির পাশে চুপচাপ বসে ক্রমাগত হিক্কা তুলছেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি। ভোদকা আনতে বলে পুলিস ক্যাপ্টেন সমবেত সবাইকে আমন্ত্রণ করল তাঁর বাড়িতে গিয়ে ছোট্ট হাজরি খেতে, কথা দিল তাঁর স্ত্রী নেমে এসে জিপসীদের সঙ্গে নাচবে ঠিক। সুদর্শন যুবাটি সাগ্রহে ইলিউশ্‌কাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে পিয়ানোফোর্ট

জিনিসটা অনেক বেশী প্রাণবন্ত, গিটারে 'এ ফ্ল্যাট' তোলা যায় না। রাজকর্মচারীটি এক কোণে বসে চা খাচ্ছে, মনে হল ভোরের আলো হওয়াতে নিজের বেলেল্লাপনায় সে লজ্জিত। নিজেদের ভাষায় জিপসীদের মধ্যে তর্ক চলেছে, তারা জেদ ধরেছে ভদ্রলোকদের খাতির করার জন্য আর একটা গান গাইতেই হবে, কিন্তু স্তেশা আপত্তি জানিয়ে বলল যে তাহলে 'বারোরাই' (কথাটির অর্থ কাউণ্ট বা রাজকুমার, আরো সঠিক করে বলতে গেলে, বড় বাবু) চলে যাবেন। এক কথায় আমোদ আহ্লাদের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে।

সফরের পোষাক চাপিয়ে ঘরে এসে কাউণ্ট বললেন, 'বেশ, যাবার আগে আর একটা গান হোক, তারপর যে যার বাড়ি।' তাঁকে আরো ফিটফাট, আরো সুন্দর, আরো ফূর্তিবাজ মনে হচ্ছে।

জিপসীরা সবে গুছিয়ে গোল হয়ে বসে গান ধরার উপক্রম করেছে, ইলিন একতাড়া নোট হাতে এসে কাউণ্টকে ডেকে এক পাশে নিয়ে গেল।

'আমার কাছে রেজিমেণ্টের পোনেরো হাজার রুবল ছিল শুধু, অথচ তুমি দিয়েছ ষোলো হাজার তিনশ,' সে বলল। 'ওটা তোমার।'

'চমৎকার! দাও দিকি!'

টাকা দিতে দিতে একটু সলজ্জভাবে কাউণ্টের দিকে তাকাল ইলিন, কী একটা বলার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু কিছু না বলে টকটকে লাল হয়ে উঠল সে, চোখে জল এসে গেল, তারপর কাউণ্টের হাত ধরে সজোরে চাপ দিল।

'কেটে পড়ো! ইলিউশ্‌কা!.. শোনো — এই নাও টাকা; সহরের ফটক পর্যন্ত গাইতে গাইতে বিদায় দিতে হবে কিন্তু,' বলে ইলিনের দেওয়া এক হাজার তিনশ রুবল তিনি ছুঁড়ে দিলেন জিপসীর গিটারের ওপর। কিন্তু আগের রাত্রে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের কাছে ধার নেওয়া একশ রুবল ফেরত দিতে মনে রইল না।

তখন সকাল দশটা। বাড়িঘরের অনেক ওপরে সূর্য, রাস্তায় লোকের ভিড়, অনেকক্ষণ দোকানপাট খুলেছে দোকানীরা, ঘোড়ায় চেপে চলেছে বাবুরা আর সরকারী চাকুরেরা, আর্কেডে এক দোকান থেকে অন্য

দোকানে মন্থরগতিতে যাচ্ছেন মহিলারা; তখন হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে বেরিয়ে এল জিপসীদের দল, পুলিস ক্যাপ্টেন, অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, সুদর্শন যুবাটি, ইলিন আর কাউণ্ট, তাঁর গায়ে ভালুক লোমের আস্তরণ দেওয়া সেই নীল ক্লোকটা। ঝকঝকে দিন, বরফ গলছে। লেজ ছোট করে বাঁধা তিন ঘোড়ার তিনটি শ্লে হোটেলের সামনে এসে থামল, পুরো হুল্লোড়ে দলটি চাপল তাতে। প্রথম শ্লেতে কাউণ্ট, ইলিন, স্তেশা, ইলিউশ্‌কা আর কাউণ্টের চাকর সাশা। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ব্লুচার লেজ নাড়িয়ে মাঝের ঘোড়াটাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাচ্ছে। বাকি ভদ্রলোকেরা এবং জিপসীরা উঠল অন্য দুটি শ্লেতে। হোটেল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি এল শ্লেগুলো, দল বেঁধে গান শুরু হল জিপসীদের।

আর এইভাবে গান গেয়ে, ছোট ছোট ঘণ্টার আওয়াজ তুলে তারা সারা সহরটা হয়ে গেল, একেবারে ফটক পর্যন্ত, সামনে পড়া আর সমস্ত গাড়িকে উঠতে হল ফুটপাথে।

প্রকাশ্য দিবালোকে সহরের রাস্তায় গান আর জিপসী মেয়ে আর মাতাল জিপসী পুরুষের সঙ্গে মান্যগণ্য এসব ভদ্রলোকদের যেতে দেখে তাক লেগে গেল দোকানী আর পথচারীদের, বিশেষ করে তাদের যারা ভদ্রলোকদের চিনত।

সহরের ফটক ছাড়িয়ে শ্লেগুলো থামল, প্রত্যেকে বিদায় নিতে লাগল কাউণ্টের কাছে।

রওনা হবার আগে বেশ পান করেছিল ইলিন, ঘোড়া চালিয়েছে সে নিজেই, হঠাৎ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে কাউণ্টকে বার বার বলতে লাগল আর একদিন থেকে যেতে। যখন বুঝল সেটা অসম্ভব, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে জল ভরা চোখে হঠাৎ নতুন বন্ধুটিকে চুম্বন করে শপথ করল যে, রেজিমেণ্টে ফিরে গিয়েই যে হুজার রেজিমেণ্টে তুরবিন আছেন সেখানে বদলির দরখাস্ত করবে। কাউণ্টের বেজায় ফুর্তি তখন। সকালে অশ্বারোহী বাহিনীর যে অফিসার তাঁকে শেষবারের মতো তুমি বলে ডেকেছিলেন, তাঁকে ঠেলে দিলেন বরফের স্তূপে, ব্লুচারকে লেলিয়ে দিলেন পুলিস ক্যাপ্টেনের দিকে, স্তেশাকে ছিনিয়ে জড়িয়ে ধরে ভয় দেখালেন একেবারে মস্কোতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন; অবশেষে শ্লেতে লাফিয়ে উঠে

পাশে বসালেন ব্লুচারকে, যদিও মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল তার। কাউণ্টের ওভারকোটটা খুঁজে বের করে পাঠিয়ে দেবার জন্য অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারকে আর একবার তাড়া দিয়ে সাশা চালকের পাশে তড়াক করে উঠে বসল।

'চললুম তাহলে!' চেঁচিয়ে বলে কাউণ্ট টুপিটা ঝটিতি খুলে মাথার ওপর নামিয়ে শ্লে-চালকদের মতো শিস দিলেন ঘোড়াগুলোকে, আর তিনটে শ্লে চলল বিভিন্ন দিকে।

বরফে ঢাকা সমভূমির একঘেয়ে বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত, তার মধ্যে এঁকেবেঁকে চলেছে পথের নোংরা হলদে ফিতেটা। গলে-আসা বরফের শক্ত আর স্বচ্ছ আবরণে উজ্জ্বল রোদের ঝিকিমিকি খেলা এবং মুখে আর পিঠে বেশ একটা মিঠে ঝাঁঝ। ঘেমে-ওঠা ঘোড়াগুলোর গা থেকে উঠছে ভাপ। ঠুনঠুন শব্দ করে চলেছে শ্লের ঘণ্টা। বেশী বোঝাই শ্লেজের পাশে পাশে দৌড়তে দৌড়তে একটি চাষী কাউণ্টের পথ করে দিতে গিয়ে তাড়াতাড়ি লাগামের সামিল দড়িতে টান দিল, পথের ধারের বরফ-গলা কাদায় ভিজে গেল বাকলের জুতো। অন্য একটা শ্লেজে বসে লাগামের কোণ দিয়ে শাদা ছ্যাকড়া ঘোড়াটার পিঠ আছড়াচ্ছিল একটি মোটাসোটা লাল মুখো কিষাণী, তার ভেড়ার লোমের কোটে গোঁজা একটি বাচ্চা। হঠাৎ আন্না ফিওদরভনাকে মনে পড়ে গেল কাউণ্টের।

'ঘুমাও!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

বুঝতে পারল না গাড়োয়ান।

'ঘুমাও! ফির সহরে! জলদি!'

আবার ফটক হয়ে সহরে ঢুকে শ্লেটা দ্রুত গিয়ে থামল শ্রীমতী জাইৎসেভার বাড়ির কাঠের তৈরী বহির্দ্বারে। সিঁড়ি দিয়ে তড়তড় করে উঠে কাউণ্ট পা চালিয়ে সামনের হল আর ড্রয়িং-রুম পার হয়ে গেলেন। তখনো ঘুমন্ত বিধবাটিকে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তুললেন, ঘুম-জড়ানো তার চোখে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেলেন দৌড়িয়ে। ঘুমে আচ্ছন্ন আন্না ফিওদরভনা ঠোঁট চেটে শুধু জিজ্ঞেস করতে পারল, 'কী হল?'

কাউণ্ট লাফিয়ে শ্লেতে উঠে চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে চালাতে বললেন আর কালবিলম্ব না করে, লুখনভ বা ছোটখাটো বিধবা বা স্তেশার কথা একবারও না ভেবে চিরতরে ছেড়ে গেলেন ক ... সহর, তাঁর মাথায় শুধু মস্কোর চিন্তা।

৯

বিশ বছর কেটে গেছে। অনেক ঘাটের জল গড়িয়েছে, দেহ রেখেছে অনেক লোকে, জন্ম নিয়েছে আরো অনেকে, বড়ো হয়েছে বা বুড়িয়ে গেছে অপরেরা, মানুষের চেয়ে বেশী সৃষ্টি হয়েছে নতুন চিন্তাধারার, তারপর উধাও হয়ে গেছে। পুরনো কালের ভালো ও মন্দের অনেক কিছু অবলুপ্ত, নতুন অনেক ভালো জিনিস দানা বেঁধেছে, তাদের চেয়ে দলে ভারি দেখা দিয়েছে অনেক মন্দ জিনিস।

বেশ কয়েক বছর আগে বিগত হয়েছেন কাউণ্ট ফিওদর তুরবিন। রাস্তায় একটি বিদেশীকে ঘোড়ার চাবুক মারাতে তার সঙ্গে ডুয়েল লড়ে তিনি মারা যান। তাঁর ছেলে, বাপের অবিকল প্রতিমূর্তি, এখন তেইশ বছরের মিষ্টি ছোকরা, অশ্বারোহী দলের অফিসার। কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়ে নবীন কাউণ্ট তুরবিনের ছিটেফোঁটা মিল নেই বাপের সঙ্গে। আগের পুরুষের বেপরোয়া উদ্দাম, আর সোজা কথায় বলতে গেলে, বেলেল্লা হাবভাবের নামগন্ধ নেই তার মধ্যে। বুদ্ধিবৃত্তি, সুশিক্ষা ও বংশক্রমে পাওয়া গুণী স্বভাব ছাড়া তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ হল ভদ্রতা ও আরামপ্রিয়তা, লোক ও অবস্থা বিচারের একটি বাস্তব মনোভাব আর জীবনের প্রতি সতর্ক বুদ্ধিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি। সৈন্যবাহিনীর কাজে খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছে ছোকরা কাউণ্ট: তেইশ বছর বয়সেই লেফটেনাণ্ট সে ...

যুদ্ধ শুরু হওয়াতে সে ভাবল জঙ্গী কাজে থাকলে উন্নতির সম্ভাবনা বেশী, তাই বদলি হল একটি হুজার রেজিমেণ্টে, ক্যাপ্টেনের পদে, আর অল্পদিনের মধ্যেই ভার পেল একটি স্কোয়াড্রনের।

১৮৪৮ সালের মে মাসে হুজারের স ... রেজিমেণ্টটা ক ... গুবের্নিয়া হয়ে যাচ্ছিল; নবীন কাউণ্ট তুরবিনের স্কোয়াড্রনের রাত কাটাবার কথা

আন্না ফিওদরভনার মরজভকা গ্রামে। আন্না ফিওদরভনা তখনো জীবিত, কিন্তু বয়স এত হয়েছে যে নিজেকে আর নবীনা বলে মনে করেন না, স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা মনে না করাটা অসাধ্যসাধন। অত্যন্ত মুটিয়ে গেছেন তিনি, লোকে বলে তাতে নাকি স্ত্রীলোকদের বয়স কম দেখায়। কিন্তু তাঁর নরম শুভ্র মেদে হানা দিয়েছে গভীর বলিরেখা। সহরে গাড়ি চেপে আর যান না, সত্যি বলতে গাড়িতে চাপা তাঁর পক্ষে বেজায় শক্ত, কিন্তু স্বভাবটা রয়ে গেছে আগেকার মতোই ভালোমানুষী আর বোকা-বোকা গোছের, সেটা এখন স্বীকার করা চলে কেননা আমাদের অন্ধ করে দেবার মতো রূপ আর তাঁর নেই। তাঁর সঙ্গে থাকে মেয়ে, তেইশ বছরের লিজা, রুশী গ্রাম্য সুন্দরী, আর থাকেন দাদাটি, আমাদের পরিচিত সেই অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, আলসে স্বভাবের ফলে পৈতৃক সম্পত্তি সব ফুঁকে দিয়ে তিনি বৃদ্ধ বয়সে বোনের গলগ্রহ। চুল ধবধবে শাদা হয়ে গিয়েছে; ওপরের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, কিন্তু গোঁফে সযত্নে কালো কলপ লাগানো। বলিরেখায় শুধু যে গাল আর কপাল কীর্ণ তা নয়, নাক ও গলাও, কুঁজো হয়ে গেছেন তিনি, তবু তাঁর দুর্বল বেঁকা পায়ে রয়ে গেছে অশ্বারোহী বাহিনীর পুরনো অফিসারের ছিটেফোঁটা।

সে সন্ধ্যায় পরিবারবর্গ ও পোষ্য সবাইকে নিয়ে পুরনো বাড়িটার ছোট ড্রয়িং-রুমে বসেছিলেন আন্না ফিওদরভনা। বারান্দার দরজা জানলার সামনে, লাইম-গাছের ছায়ায় ঢাকা, তারার মতো আকৃতির পুরনো কেতার একটি বাগান। পক্ককেশ আন্না ফিওদরভনা তুলো-ভরা ফিকে নীল রঙের একটি জ্যাকেট পরে গোল মেহগনি টেবিলের সামনে সোফায় বসে টেবিলে তাস সাজাচ্ছেন। বুড়ো ভাই পরিষ্কার শাদা পেন্টেলুন আর নীল কোট পরে জানলার কাছে বসে শাদা তুলোর সুতোয় কাঁটা দিয়ে কী একটা বানাচ্ছেন; এটা ভাগ্নীর কাছে শেখা, কাজটায় ক্রমশ তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্মে গেছে, কেননা সত্যিকার কাজ করার ক্ষমতা তাঁর নেই, দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ যে তাঁর সেই সখ — সংবাদপত্র পাঠ — মেটানো আর চলে না। আন্না ফিওদরভনা পোষ্য হিসেবে যাকে নিয়েছিলেন, পিমচকা নামের সেই ছোট্ট মেয়েটি বুড়োর পাশে বসে লিজার তদারকে পড়া

করছে। সঙ্গে সঙ্গে লিজা মামার জন্য ছাগলের লোমের এক জোড়া মোজা বুনে চলেছে। দিনের সে সময়টায় বরাবরকার মতো আজও অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো লাইম গাছগুলোর মধ্য দিয়ে তেরছাভাবে পড়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে একেবারে ওদিকের জানলাটাকে আর পাশে দাঁড়ানো বই-এর স্ট্যান্ডকে। ঘর আর বাগান এত নিস্তব্ধ যে স্পষ্ট কানে আসে জানলার বাইরে সোয়ালোর পাখার দ্রুত ঝাপট, ঘরে আন্না ফিওদরভনার মৃদু দীর্ঘশ্বাস আর পায়ের ওপর পা রাখতে গিয়ে বৃদ্ধের ক্লান্তিসূচক শব্দ।

'এই তাসটা কোথায় বসবে? লিজা, দেখিয়ে দে তো, লক্ষ্মীটি, কিচ্ছু মনে থাকে না আজকাল,' খেলা থামিয়ে বললেন আন্না ফিওদরভনা।

বোনা বন্ধ না করে লিজা মায়ের কাছে গিয়ে তাসের দিকে তাকাল।

'হায়রে, তুমি তো সব গুলিয়ে ফেলেছ দেখছি মা মণি,' তাসগুলো ঠিক করে গুছিয়ে দিতে দিতে বলল। 'থাকা উচিত এরকম। তবু, হাতটা আসবে — আন্দাজটা ঠিকই করেছ,' মার অজান্তে একটা তাস চট করে সরিয়ে দিয়ে বলল লিজা।

'তুই তো সদাই আমাকে ধাপ্পা দিস, সদাই বলিস তাসটা আসবে।'

'আসবে সত্যি। এই তো এসেছে!'

'বেশ, বেশ, শেয়াল ঠাকরুণ। চা খাবার সময় হয়নি?'

'ওদের তো বলে দিয়েছি সামোভার গরম করতে। দেখছি গিয়ে। এখানে আনাবো?.. পিমচকা, তাড়াতাড়ি পড়া শেষ কর্, আমরা একটু বেড়িয়ে আসবো।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লিজা।

'লিজা! লিজচ্কা!' কাঁটা থেকে চোখ না সরিয়ে ডাকলেন মামা। 'আবার একটা সুতো ফেলে দিয়েছি মনে হচ্ছে। ওটা তুলে দে তো, লক্ষ্মী মেয়ে!'

'এক্ষুণি দিচ্ছি! এক্ষুণি! চিনির ডেলাটা ভাঙতে দিয়ে আসি!'

আর সত্যি, মিনিট তিনেকের মধ্যে ছুটে ফিরে এসে মামার কাছে গিয়ে সে চুল ধরল তাঁর।

'সুতো ফেলে দেবার এই হল শাস্তি,' হেসে বলল। 'আজকের পড়াটা পর্যন্ত করেননি দেখছি।'

'থাক, থাক; ঠিক করে দে এটা — কোথাও গাঁট পড়েছে মনে হচ্ছে।'

কাঁটাটা নিয়ে লিজা মাথার রুমালের আলপিন টেনে বের করে ফোঁড়টা পিন দিয়ে ধরে দু তিন বার ফাঁস দিয়ে ফেরত দিল মামাকে। আলপিন খোলাতে জানলা থেকে আসা হাওয়ায় রুমালটা খুলে গেল।

'অনেক খেটেছি, চুমু দিন একটা,' বলে মাথার রুমাল পিন দিয়ে আটকে ঠিক করে নিতে নিতে গোলাপি গাল এগিয়ে দিল। 'আজকে চায়ের সঙ্গে রাম পাবেন। জানেন তো, আজ হল শুক্রবার।'

আবার চায়ের ঘরে ফিরে গেল সে।

'দেখুন, দেখুন মামা! হুজাররা আসছে,' পরিষ্কার জোরালো গলা শোনা গেল সেখান থেকে।

হুজারদের দেখতে চা-ঘরে গেলেন আন্না ফিওদরভনা ও তাঁর ভাই। ঘরের জানলাগুলো গাঁয়ের দিকে। জানলা দিয়ে দেখা গেল খুব কম; শুধু বুঝতে পারলেন ধুলোর মেঘে চলেছে একটা দল।

'কী আফশোসের কথা, বোন,' আন্না ফিওদরভনাকে বললেন লিজার মামা, 'আমাদের বাড়িটা এত ছোট, আর পাশের নতুন অংশটা হয়নি এখনো। নইলে কয়েকজন অফিসারকে ডাকা যেত। হুজারদের অফিসাররা হামেশাই বেশ খাসা ফূর্তিবাজ ছোকরা; ওদের একবার দেখার বড়ো ইচ্ছে আমার।'

'ওদের পেলে আমিও খুব খুশি হতাম; কিন্তু জানোই তো দাদা, ওদের রাখার মতো ঠাঁই নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু আমার শোবার ঘর, লিজার ঘর, ড্রয়িং-রুম আর তোমার ঘর, ব্যস। কোথায় তুলবো ওদের? নিজেই ভেবে দেখো। মোড়লের বাড়িটা ওদের জন্যে তৈরী করে রেখেছে মিখাইলো মাতভেয়েভ। বলছে ঠিক মত ঝেড়ে সাফ করা হয়েছে।'

'ওদের মধ্য থেকে তোর জন্যে একটা বর, হুজার বাহাদুর কাউকে ঠিক করতাম, লিজচ্‌কা,' মামা বললেন।

'হুজার চাইনে আমার, আমার দরকার উলান, আপনি তো উলানদের দলে ছিলেন, তাই না মামা? .. হুজারদের জানার কোনো সখ নেই আমার। লোকে বলে ওরা অত্যন্ত বেপরোয়া লোক।'

লিজার গাল অল্প একটু রাঙা হয়ে উঠল, কিন্তু আবার তার সেই ভরাট হাসি হাসল সে।

'এই তো, উসতিউশ্‌কা হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে; কী দেখল ওকে জিজ্ঞেস করা যাক,' সে বলল।

উসতিউশ্‌কাকে ডেকে পাঠালেন আন্না ফিওদরভনা।

'হাতে তোর কোনো কাজ নেই যেন! পল্টনের লোক দেখতে ছুটে যাওয়া চাই!' বললেন আন্না ফিওদরভনা। 'আচ্ছা, অফিসারদের কোথায় রাখা হচ্ছে?'

'ইয়েরমাকিনদের বাড়িতে, মা। দুজন ওরা, আর কী ফুটফুটে চেহারা! একজন আবার নাকি কাউণ্ট, লোকে বলছে।'

'কী নাম?'

'কাজারভ না তুরবিনভ — না, ঠিক মনে পড়ছে না, মাফ করবেন।'

'তুই একটা গাধা — কিচ্ছু বলতে পারিস না। অন্তত ওর নামটা জেনে নিলে তো পারতি।'

'যদি বলেন তো দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি।'

'হ্যাঁ, ও-সবে তুই তো ওস্তাদ জানি! না, দানিলো যাক; দাদা, ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে বলো তো অফিসাররা কোনো কিছু চায় কিনা; ওদের আপ্যায়ন করা দরকার। আর দানিলো যেন বলে ওকে কর্ত্রী পাঠিয়েছেন।'

চা-ঘরে আবার বসলেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আর চিনি সরিয়ে রাখতে ঝিদের ঘরে গেল লিজা। উসতিউশ্‌কা সেখানে হুজারদের বিষয়ে গল্প চালিয়েছে।

'সত্যি দিদিমণি, কাউণ্ট কী সুন্দর দেখতে!' সে বলল। 'একেবারে স্বর্গের দেবতার মতো, ভুরু জোড়া কালো! যদি ওর মতো একটা বর হত আপনার! কী সুন্দর জোড় মিলত সত্যি!'

সায় দিয়ে মৃদু হাসি হাসল অন্য ঝিচাকরেরা। জানলার ধারে বসে মোজা রিপু করতে করতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্বাস চেপে কী একটা প্রার্থনার মন্ত্র বিড়বিড় করে আওড়াল বুড়ী আয়া।

'তাহলে হুজারদের তোর খুব মনে ধরেছে দেখছি!' বলল লিজা। 'গল্প বলতে তুই ওস্তাদ! উস্‌তিউশ্‌কা, ফলের সরবৎ নিয়ে আয় তো, টক-টক গোছের কিছু একটা, হুজারদের আপ্যায়ন করতে হবে তো।' চিনি-দানি হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল লিজা।

ভাবতে লাগল, "হুজারটিকে একবার দেখলে হত। ওর চুল সোনালি না কালো? আমাদের সঙ্গে আলাপ হলে ও খুশি না হয়ে যায় না। কিন্তু আমি এখানে বসে ওর কথা ভাবছি সেটা না জেনেই হয়ত ও চলে যাবে। ওর মতো কত না লোক সামনে দিয়ে চলে গেছে! আমাকে আর দেখে কে! শুধু মামা আর উস্‌তিউশ্‌কা। কী ভাবে চুল বাঁধি, কী জামা পরি, তাতে কী এসে যায়? তারিফ করার তো কেউ নেই," মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের নিটোল শাদা হাতের দিকে চেয়ে ভাবল। "নিশ্চয় ও বেশ লম্বা, বড়ো বড়ো চোখ, ছোট্ট কালো গোঁফ আছে। ভেবে দেখো একবার, তেইশে পা দিয়েছি অথচ কেউ আমার প্রেমে পড়ল না, বসন্তের দাগ মুখো ইভান ইপাতিচ ছাড়া। আর চার বছর আগে আমার চেহারাটা আরো সুন্দর ছিল। কুমারীর বয়স বলতে গেলে পেরিয়েছি, অথচ এ বয়সে আনন্দের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত পেল না কেউ। হায়রে আমার কপাল! গাঁয়ের অভাগিনী শুধু, আর কিছু না!"

মা চা ঢেলে দেওয়ার জন্য ডাকলেন, চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল গাঁয়ের মেয়ের। মাথা একটু ঝাঁকিয়ে গেল চা-ঘরে।

দৈবাৎ যা ঘটে তাই সবচেয়ে ভালো; খুব বেশী কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে না। গ্রামে শিক্ষাদীক্ষায় বেশী নজর দেওয়া হয় না, তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আপনা থেকে ফলটা চমৎকার হয়। লিজার বেলায় বিশেষ করে তাই ঘটে। আন্না ফিওদরভনার মনের বিস্তার ছিল না, সে জন্য আর আলসে প্রকৃতির ফলে লিজাকে কোনো শিক্ষাদীক্ষা তিনি দেননি: না শেখানো হয় গানবাজনা না অপরিহার্য ফরাসী ভাষা, শুধু দৈবক্রমে বিগত স্বামীর ঔরসে জন্ম নেওয়া একটি অতি সুন্দর ও গোলগাল শিশু-মেয়েটিকে ছেড়ে দেন স্তন্যদায়ী ধাত্রী ও আয়ার হাতে। তিনি তাকে খাওয়াতেন, সুতোর ফ্রক আর ছাগলের চামড়ার জুতো পরাতেন, খেলতে আর বেরী ও ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে বাইরে পাঠাতেন, লেখাপড়া

ও অংক শেখানোর জন্য একটি কমবয়সী ছাত্রকে রেখে দেন, আর ষোলো বছরের মধ্যে, নেহাৎ দৈবক্রমে, তিনি দেখলেন লিজা সঙ্গী হিসেবে বেশ খাসা; ছোটখাটো হাসিখুশি, দরাজ মন মেয়েটি বেশ গিন্নী গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্না ফিওদরভনার নিজের মনটা এত কোমল যে তিনি সর্বদা কোন না কোন ভূমিদাসের শিশুকে বা কুড়িয়ে-পাওয়া কাউকে পুষ্যি রাখতেন। দশ বছর বয়স থেকে মায়ের পোষ্যদের ভার নিয়েছে লিজা: লেখাপড়া শেখাত তাদের, কাপড়চোপড় পরাত, নিয়ে যেত গির্জায়, আর বেশী দুষ্টুমি করলে ধমকাত। তারপর এলেন বৃদ্ধ, ভালোমানুষ গোছের মামা, তাঁকে শিশুর মতো দেখাশোনা করতে হত। আর ছিল বাড়ির ঝিচাকর, গাঁয়ের চাষা; তাদের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার ভার নিতে হত নবীনা কর্ত্রীকে। এলডার ফুলের রস, পেপারমিণ্ট ও কর্পূরের নির্যাস দিয়ে চিকিৎসা চলত তাদের। তারপর বাড়ির দেখাশোনা করার ভার আপনা থেকেই এসে পড়ল তার ঘাড়ে। এর ওপর, অপরিতৃপ্ত ভালোবাসার ব্যাকুলতা মুক্তি পেত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগে আর ধর্মে। এ সব থেকে নেহাৎ ভাগ্যক্রমে লিজা হয়ে দাঁড়াল কর্মতৎপর, হাসিখুশি, অমায়িক, স্বাধীনচেতা, নিষ্পাপ আর অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ একটি মেয়ে। সত্যি বটে, ক... সহর থেকে আনানো ফ্যাশনদুরস্ত টুপি-পরা প্রতিবেশিনীদের গির্জায় দেখলে তার হিংসে হত অল্পসল্প; খিটখিটে মায়ের নানা খেয়ালে প্রায় কান্না পেয়ে যেত; প্রেমের স্বপ্ন নিত আজগুবি, এমন কি অত্যন্ত স্থূল রূপ — কিন্তু এ সমস্তই হটে যেত তার সত্যিকার কাজের গুণে, যে কাজ তার প্রাণ ছিল, আর তাই তেইশ বছর বয়সে, শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্যে ধনী এই বাড়ন্ত মেয়েটির স্বচ্ছ শান্ত অন্তরে দাগ বা অনুশোচনা রেখে যাবার মতো কিছুমাত্র ছিল না। লম্বায় লিজা মাঝারি, রোগার চেয়ে বরঞ্চ গোলগাল; পাটল বরণ চোখ খুব বড়ো নয়, চোখের পাতার নীচে অল্প ছায়া; দীর্ঘ সোনালি বিনুনি; হাঁটার ভঙ্গিটা উদার, একটু হেলেদুলে। মনে কোনো ভাবনা না নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ে তার মুখের ভাব সবাইকে জানিয়ে দিত যে জীবন জিনিসটা খাসা, জীবন জিনিসটা আনন্দের তাদের পক্ষে যাদের বিবেক নির্মল, ভালোবাসার জন আছে যাদের। এমন কি বিরক্তি, ক্রোধ,

উৎকণ্ঠা বা দুঃখের মুহূর্তে জলে ভরা-যাওয়া চোখে, বাঁ দিকের কুণ্ঠিত ভুরুতে, গালের টোলে, ঠোঁটের কোণে, দীপ্ত চোখে পাওয়া যেত কোমল ও অকপট হৃদয়ের উজ্জ্বল একটা আভাস, যে হৃদয় মলিন হয়নি কৃত্রিমতায়।

১০

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু তখনো বেশ গরম; স্কোয়াড্রন মরোজভ্‌কায় ঢুকল। সামনে, গাঁয়ের ধূলিধূসর রাস্তায় দল ছাড়া একটা ছিটছিট দাগের গরু দৌড়চ্ছে; ভীতভাবে পেছন দিকে বার বার তাকিয়ে থেকে থেকে থেমে পড়ে ডাকছে, পথ ছেড়ে দিলেই হয় সেটা তার মাথায় ঢোকেনি। বুড়ো চাষী, গাঁয়ের বধূ, বাচ্চাকাচ্চা আর বাড়ির সব চাকরবাকর পথের দুধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল হুজারদের, খাটো রাশ দেওয়া কালো ঘোড়ায় চেপে তারা এগিয়ে আসছে ধূলোর ঘন মেঘে। ঘোড়াগুলো নাক দিয়ে মাঝে মাঝে আওয়াজ করছে। স্কোয়াড্রনের ডান দিকে চলেছে আলগাভাবে জিনে বসে অফিসার দুটি। একজন হল দলের কমাণ্ডার, কাউণ্ট তুরবিন, আর একজন হল পলজভ, অফিসার হয়েছে এই সেদিন।

গাঁয়ের সেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল শাদা টিউনিক-পরা একটি হুজার; ফৌজী টুপি খুলে গেল অফিসারদের কাছে।

'আমাদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কাউণ্ট।

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তরে বলল কোয়ার্টারমাস্টার, 'আপনার জন্যে হুজুর? এই বাড়িটা, মোড়লের বাড়িটা সাফ করা হয়েছে। জমিদারণীর কাছারি বাড়িতে ঘর চেয়েছিলাম, কিন্তু রাজী হল না। জমিদারণী বড় রাগী।'

'বেশ,' ঘোড়া থেকে নেমে পায়ের আড় ভেঙে মোড়লের বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে কাউণ্ট বলল। 'আমার গাড়িটা এসেছে?'

'এসেছে, হুজুর,' ফটকে দাঁড়ানো গাড়ির দিকে টুপি দেখিয়ে জবাব দিল কোয়ার্টারমাস্টার, তারপর আগে আগে ছুটে গেল বাড়িটার প্রবেশ

ঘরে, যেখানে অফিসারদের দেখার জন্য জুটেছিল একটি চাষী পরিবার। সবে ধোয়া-মোছা বাড়িটার দরজা হটাং করে খুলে কাউণ্টকে ভেতরে যাবার জন্য সরে দাঁড়াতে গিয়ে আর একটু হলে একটা বুড়ীকে ফেলে দিত ধাক্কায়।

বাড়িটা যথেষ্ট বড়ো, জায়গা আছে, কিন্তু পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। বাবুদের মতো সাজ-পরা একটি জার্মান খাস-চাকর লোহার খাট পেতে স্যুটকেশ থেকে বিছানার চাদর বের করছে।

'এঃ, কী জঘন্য বাড়ি!' বিরক্ত হয়ে বলল কাউণ্ট। 'দিয়াদেঙ্কো, জমিদারণীর ওখানে কোথাও এর চেয়ে ভালো জায়গা পাওয়া গেল না?'

'হুজুর, হুকুম দিলে কাউকে ওখানে পাঠাই,' জবাবে বলল দিয়াদেঙ্কো। 'কিন্তু কাছারি বাড়িটা বিশেষ সুবিধের নয় এ বাড়িটার চেয়ে এমন কিছু ভালো মনে হচ্ছে না।'

'দরকার নেই এখন। থাক।'

কাউণ্ট শুয়ে পড়ল হাতে মাথা রেখে।

'জোহান!' হেঁকে খাস-চাকরকে বলল, 'আবার মধ্যিখানটায় একটা ঢিবি করে দিয়েছ দেখছি! ঠিক মত বিছানা পাততে পার না, ব্যাপারটা কী?'

বিছানা ঠিক করতে গেল জোহান।

'থাক, দরকার নেই। আমার ড্রেসিং-গাউনটা কোথায়?' খিটখিটিয়ে কাউণ্ট বলল।

পরবার আগে ঝুলটা পরীক্ষা করে দেখল কাউণ্ট।

'যা ভেবেছিলাম; দাগটা ওঠাওনি। তোমার চেয়ে খারাপ কাজ আর কেউ পারে বলে জানা নেই,' খাস-চাকরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ড্রেসিং-গাউন গায়ে চাপাতে চাপাতে বলে উঠল কাউণ্ট। 'এটা কি ইচ্ছে করে করা হয়েছে, না কি?.. চা তৈয়ার?..'

'সময় পাইনি,' জোহান বলল।

'গাধা!'

সে উপলক্ষে আনা একটি ফরাসী নভেল টেনে নিয়ে, কোনো কথা না বলে বেশ কিছুক্ষণ পড়ল কাউণ্ট। সদরের বারান্দায় সামোভার গরম

করতে গেল জোহান। বেশ বোঝা যাচ্ছে কাউণ্টের মেজাজটা বেগতিক — নিঃসন্দেহে তার কারণ হল ক্লান্তি, অপরিষ্কার মুখ, আঁটো পোষাক আর শূন্য পেট।

'জোহান!' আবার হাঁকল সে। 'দশটা রুবল দিয়েছিলাম, তার হিসেব দাও। সহরে কী কিনেছ?'

হিসেবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কেনা জিনিসগুলোর দাম বেশী বলে কয়েকটা অসন্তোষজনক মন্তব্য কাউণ্ট করল।

'চায়ের সঙ্গে রাম দিও।'

'রাম তো কিনিনি,' বলল জোহান।

'চমৎকার! কতবার না বলেছি সঙ্গে রাম রাখতে?'

'হাতে বেশী টাকা ছিল না।'

'পলজভ কিনল না কেন? ওর চাকরের কাছ থেকে টাকাটা নিতে তো পারতে।'

'কর্ণেট পলজভ? জানি না। উনি শুধু চা আর চিনি কিনেছেন।'

'হতচ্ছাড়া!.. নিকাল যাও হিঁয়াসে!.. তোমার মতো আর কেউ আমাকে এত জ্বালিয়ে মারে না... তোমার তো ভালো করে জানা যে বাইরে ঘোরার সময়ে আমি হামেশা চায়ের সঙ্গে রাম খাই।'

'স্টাফ হেডকোয়ার্টার থেকে আপনার দুটো চিঠি এসেছে,' খাস-চাকর বলল।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই খামদুটো ছিঁড়ে চিঠি পড়তে শুরু করল কাউণ্ট। ঠিক সে সময়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল কর্ণেট, সে এতক্ষণ স্কোয়াড্রনের লোকজনদের তাদের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।

'কী তাহলে, তুরবিন? জায়গাটা শেষ পর্যন্ত মন্দ নয় মনে হচ্ছে। কিন্তু ভয়ানক ক্লান্ত, সেটা বলতেই হবে। দিনটা গরম গেছে।'

'মন্দ নয় বটে! নোংরা দুর্গন্ধ ভরা বাড়ি, আর তোমার কৃপায় চায়ের সঙ্গে রাম জুটবে না। তোমার সেই বোকা বাঁদরটা কিনতে ভুলে গেছে, আমার চাকরটাও তাই। তুমি বললে পারতে।'

আবার চিঠি পড়া চলল। প্রথমটা শেষ করে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এ সময়ে সদরের বারান্দায় নিজের চাকরকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করছিল কর্ণেট, 'রাম কেননি কেন? টাকা তো ছিল তোমার কাছে, ছিল না?'

'কেনাকাটা সব আমরাই করবো কেন? এমনিতেই সব খরচ তো আমিই দিই; আর ওঁর জার্মানিটা পাইপ টানা ছাড়া আর কিছু করে না।'

দ্বিতীয় চিঠিটা বোঝা গেল অপ্রীতিকর নয়, কেননা পড়তে পড়তে কাউণ্টের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল।

'কে লিখেছে?' জিজ্ঞেস করল পলজভ, ইতিমধ্যে সে ঘরে ফিরে এসে চুল্লির পাশে কয়েকটা তক্তার ওপর নিজের বিছানা পাতছিল।

'মিনা,' চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে খুশিতে বলল কাউণ্ট। 'পড়বে নাকি? চমৎকার মেয়ে!.. আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক ভালো... চিঠিটাতে কী সরস বুদ্ধি আর আবেগ, পড়ে দেখো!.. একটা জিনিস শুধু খারাপ — টাকা চায়।'

'হ্যাঁ, সেটা খারাপ বটে,' বলল কর্ণেট।

'সত্যি বলতে, আমি কথা দিয়েছিলাম; কিন্তু তারপর তো আমাদের বাহিনীর যাত্রা শুরু হল, আর... আচ্ছা... স্কোয়াড্রনের ভার আমার হাতে আরো তিন মাস থাকলে টাকাটা পাঠিয়ে দেবো। দিতে আমার সত্যি কোনো আপত্তি নেই; চমৎকার মেয়ে, তাই না?' মৃদু হেসে চিঠি পড়ার সময়ে পলজভের মুখের ভাব দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল।

'বেজায় অশিক্ষিত, কিন্তু মিষ্টি, আর মনে হয় সত্যি তোমাকে ভালোবাসে,' বলল কর্ণেট।

'বাসে বই কি! প্রেমে পড়লে ওর মতো মেয়েরাই শুধু সত্যি ভালোবাসে।'

'অন্য চিঠিটা কে লিখেছে?' পড়া চিঠিটা ফেরত দিয়ে কর্ণেট জিজ্ঞেস করল।

'ওটা? ওটা লিখেছে একটা লোক, অত্যন্ত পাজী বেটা, তাসে ওর কাছে হেরে যাই; এই নিয়ে তিন বার তাগাদা দিয়েছে... এখন ওকে শোধ দিতে পারি না... বোকার মতো লিখেছে,' মনে পড়াতে স্পষ্টত বিরক্ত হয়ে কাউণ্ট বলে উঠল।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ দুজন অফিসার চুপ করে রইল। কাউণ্টের মেজাজ খারাপ বলে নিঃশব্দে চা খেল কর্ণেট, কথা বলতে তার ভয়; তুরবিনের সুন্দর মুখের দিকে সে থেকে থেকে তাকাল, তুরবিন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল এক মনে, চিন্তায় মগ্ন হয়ে।

'যাক, সবকিছু হয়ত ঠিক হয়ে যাবে,' পলজভের দিকে ফিরে ফুর্তিতে মাথা একটু ঝাঁকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল কাউণ্ট। 'এ বছরে রেজিমেণ্টে এক নাগাড়ে পদোন্নতি যদি চলতে থাকে, আর যদি আমরা খাস যুদ্ধে নামি, তাহলে রক্ষী বাহিনীতে আমার ক্যাপ্টেন বন্ধুদের হয়ত ছাড়িয়ে যাবো।'

দ্বিতীয় গেলাস চা খেতে খেতে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে এমন সময়ে আন্না ফিওদরভনার বার্তা নিয়ে এল বুড়ো দানিলো।

'আর ঠাকরুণ হুজুরকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন তিনি কাউণ্ট ফিওদর ইভানভিচ তুরবিনের সন্তান কিনা?' অফিসারটির নাম শুনে ক... সহরে বিগত কাউণ্টের আগমনের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আপনা থেকে যোগ করল দানিলো। 'আমাদের কত্রীঠাকরুণ আন্না ফিওদরভনা তাঁকে খুব ভালো করে চিনতেন।'

'হ্যাঁ, আমি তাঁরি ছেলে; তোমার কত্রীঠাকরুণকে বোলো যে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আমাদের কিছু দরকার নেই, কিন্তু পরিষ্কার একটা ঘর যদি পাই, জমিদার বাড়িতে বা অন্য কোথাও।'

'ওটা বলতে গেলে কেন?' দানিলো যাবার পর জিজ্ঞেস করল পলজভ। 'কী ফারখ হতে তাতে? মাত্র তো এক রাত এখানে কাটাবো: ওদের অসুবিধে করে কী লাভ?'

'তাই নাকি! মুরগির খোপে যথেষ্ট ঘুমোনো হয়েছে... তোমার সাংসারিক বুদ্ধি নেই বোঝা গেল। এক রাত্তির হোক, মানুষের মতো থাকার সুযোগটা ছাড়তে যাবো কেন? আর ওঁরা অত্যন্ত খুশি হবেন।

'একটা জিনিসে শুধু আমার আপত্তি। বাবাকে ভদ্রমহিলা কি হাড়ে হাড়ে চিনতেন,' ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে মৃদু হেসে বলে চলল কাউণ্ট। 'বাবার কথা মনে পড়লেই কেমন যেন হয়, হামেশা কোনো না কোনো অপযশ বা ধার। তাই তাঁর চেনা লোকেদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা অসহ্য

ঠেকে। তবে সে সময়টার ধরনই ছিল ও রকম,' গম্ভীর মুখে যোগ করল সে।

পলজভ বলল, 'তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। একবার একটি উলান ব্রিগেডের দলপতির সঙ্গে দেখা হয়। নাম তাঁর ইলিন। তোমাকে দেখার জন্যে তাঁর ভয়ানক আগ্রহ, তোমার বাবার প্রতি তাঁর প্রেমের শেষ নেই।'

'মনে হচ্ছে অত্যন্ত অপদার্থ এই ইলিন লোকটি। আর ব্যাপারটা কী জানো, বাবার সঙ্গে চেনা ছিল বলে যাঁরাই ঘনিষ্ঠতা করতে চান আমার সঙ্গে তাঁরাই বাবার বিষয়ে এমন সব গল্প বলেন যে শুনলে লজ্জা হয়, যদিও সেগুলো তাঁরা বলেন নিছক রসালো গল্প হিসেবে। অস্বীকার করতে পারি না — আমি সর্বদাই সব ব্যাপার নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে দেখার চেষ্টা করি — যে বাবা ছিলেন রগচটা প্রকৃতির আর মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করতেন যেগুলো করা উচিত হয়নি। কিন্তু সে সব ঘটে কালের গুণে। আমাদের যুগে তিনি হয়ত অত্যন্ত কৃতী লোক হতেন, কেননা সত্যি বলতে গেলে তাঁর গুণ ছিল অনেক।'

মিনিট পোনেরো পরে ফিরে এসে দানিলো জানাল যে জমিদারবাড়িতে রাত কাটানোর জন্য অফিসারদের আমন্ত্রণ করেছেন কর্ত্রীঠাকরুণ।

১১

ছোকরা হুজার অফিসারটি কাউণ্ট ফিওদর তুরবিনের ছেলে জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আন্না ফিওদরভনা।

'হা ভগবান! মঙ্গল হোক তোমার... দানিলো! তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের বলো যে কর্ত্রীঠাকরুণ এখানে আসতে বলছেন,' তড়াক করে উঠে তাড়াহুড়ো করে ঝিদের ঘরে যেতে যেতে তিনি বললেন। 'লিজচ্‌কা! উসতিউশ্‌কা! তোর ঘরটা ঠিক করে রাখতে হবে, লিজা। দাদার ঘরে তুই থাকিস, আর দাদা, তুমি... তোমাকে দাদা রাতটা কাটাতে হবে ড্রয়িং-রুমে। একটা রাত্তিরে তো কিছু এসে যাবে না।'

'সত্যি কিছু এসে যাবে না, বোন, আমি মেঝেতে শোব।'

'বাপের মতো দেখতে হলে নিশ্চয়ই সুন্দর। আহা, একবার দেখে নেবো ওকে, মানিককে... তুই শুধু সবুর কর, লিজা! ওর বাপ কী সুপুরুষ ছিল... টেবিলটা আবার কোথায় সরাচ্ছিস? থাক ওটা এখানে,' ব্যস্তসমস্ত হয়ে এদিক ওদিক যেতে যেতে চেঁচিয়ে বললেন আন্না ফিওদরভনা। 'দুটো খাট নিয়ে আয় — নায়েবের কাছ থেকে একটা — আর জন্মদিনে দাদা যে স্ফটিকের মোমদানিটা দিয়েছিল সেটা নিয়ে গিয়ে চর্বির বাতিটা বসিয়ে দে।'

অবশেষে প্রস্তুতির পালা সাঙ্গ হল। মা'র কথা না শুনে আপন পছন্দ মতো অফিসার দুজনের জন্য নিজের ঘর সাজাল লিজা। সেণ্ট-দেওয়া পরিষ্কার চাদর এনে বিছানা পাতল; বিছানার পাশের টেবিলে রাখল এক জগ জল আর মোমবাতি, সুগন্ধি কাগজ পোড়াল ঝিদের ঘরে, মামার ঘরে বিছানা করল নিজের। একটু শান্ত হয়ে আন্না ফিওদরভনা নিজের জায়গায় বসে তাস তুলে নিলেন হাতে, কিন্তু সেগুলো সাজানো হল না; মেদল কনুই টেবিলে রেখে স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলেন। "কী তাড়াতাড়ি না সময় বয়ে যায়! সত্যি কেমন তাড়াতাড়ি!" ফিসফিস করে নিজেকে বললেন। "মনে হচ্ছে এই তো কালকের ব্যাপার... এখনো ওকে দেখছি চোখের সামনে ... বাবা, কী বেপরোয়া না ছিল ও!" তাঁর চোখে জল এল। "এবার লিজচ্‌কার পালা — কিন্তু ওর বয়সে আমি যা ছিলাম তেমন নয়... খাসা মেয়ে, কিন্তু আমি যা ছিলাম সে রকম নয়..."

'লিজচ্‌কা, আজ... মসলিন্‌ ও লিনেনের পোষাকটা তোর পরা উচিত।'

'ওদের ডাকবে নাকি মা? না ডাকলেই ভালো,' অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভেবে নিজের উত্তেজনা চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল লিজা। 'সত্যি বলছি মা, ডাকার দরকার নেই।'

বাস্তবিক ওদের দেখবার ইচ্ছের চেয়ে আতঙ্ক তার বেশী; মনে হতে লাগল গোলমেলে একটা সুখের লগ্ন তার ঘনিয়ে এসেছে।

'ওরা নিজেরাই যেচে হয়ত আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে, লিজচ্‌কা,' আন্না ফিওদরভনা বললেন মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে, সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন: "ওর বয়সে আমার চুল এরকম ছিল

না ... সত্যি লিজচ্‌কা, তোকে নিয়ে আমার একটা আশ আছে ...” সত্যি ওর জন্য আশ একটা করলেন, নবীন কাউণ্টের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের আশা তিনি করতে পারছেন না, আর বিগত কাউণ্টের সঙ্গে তাঁর মতো সম্পর্ক লিজা করুক নবীন কাউণ্টের সঙ্গে সেটা তো তিনি চাইতে পারেন না। তবু মেয়ের জন্য চাইছেন একটা কিছু, চাইছেন অত্যন্ত আগ্রহে। বিগত কাউণ্টের সঙ্গে সেই যে সময় কাটিয়েছিলেন, কন্যার হৃদয়াবেগ হলে আবার একবার সে সময় ফিরে আসবে তাঁর, এই বোধহয় তাঁর বাসনা।

কাউণ্টের আগমনে অশ্বারোহী বাহিনীর বৃদ্ধ অফিসারও অল্প উত্তেজিত। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। মিনিট পোনেরো পরে বেরিয়ে এলেন ফৌজী টিউনিক ও ঘোড়ায় চড়ার নীল পেণ্টুলেন পরে। বল-নাচের গাউন পরে কুমারী মেয়ের মুখে আসে যেরকম একটি খুশি-খুশি বিব্রত ভাব, সেরকম মুখে গেলেন অতিথিদের জন্য সাজানো ঘরে।

‘আজকালকার হুজাররা কেমন চীজ দেখি, বোন। খাঁটি হুজার ছিলেন বিগত কাউণ্ট। দেখা যাক এদের, দেখা যাক!’

অফিসাররা তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গেল খিড়কি দিয়ে।

‘তোমাকে বলেছিলাম না?’ ধুলো-মাখা বুট পায়ে সদ্য পাতা বিছানায় যেমনি ছিল ঠিক তেমনভাবে শুয়ে পড়ে বলল কাউণ্ট। ‘ততলেপোকার সেই আস্তানাটার চেয়ে এ বাড়িটা ভালো নয়?’

‘তা ভালো, তবে এঁদের কাছে একটা বাধ্যবাধকতায় পড়লাম...’

‘কী আবোলতাবোল বকছ! সব ব্যাপারে প্র্যাকটিকাল হওয়া দরকার। এঁরা ভয়ানক খুশি হয়েছেন কোনো সন্দেহ নেই। বোয়!’ হাঁকল সে। ‘জানলার ওপর কিছু একটা টাঙিয়ে দিতে বলো তো হে, নইলে রাত্তিরে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকবে।’

এ সময়ে অফিসারদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে ঘরে এলেন বৃদ্ধ। এটা অবশ্য তিনি না বলে পারলেন না, যদিও বলার সময়ে একটু লাল হয়ে উঠলেন, যে বিগত কাউণ্টের বন্ধু তিনি ছিলেন, কাউণ্ট তাঁকে দেখতেন স্নেহভরে, এমন কি তাঁর কয়েকটা উপকার করে দিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর কাছে ঋণী। ‘উপকার’ বলতে তিনি কী মনে করেছিলেন,

একশ র‌ুবল ধার করে ফিরিয়ে দেননি কাউণ্ট সেটা, না বরফের গাদায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন, না খিস্তি করেছিলেন সেটা বলা কঠিন, তিনি নিজে কিছ‌ু খ‌ুলে বললেন না। অশ্বারোহী বাহিনীর ব‌ৃদ্ধ অফিসারের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করল নবীন কাউণ্ট, বাড়িতে জায়গা দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাল।

'আহামরি কিছ‌ু নেই বলে মাফ করবেন, কাউণ্ট,' (প্রায় 'হ‌ুজ‌ুর' বলে সম্বোধন করে ফেলেছিলেন আর একটু হলে, পদস্থ লোকদের সম্বোধন করার ব্যাপারে ইতিমধ্যে এত অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি), 'আমার বোনের বাড়িটা অত্যন্ত ছোট। জানলাটার ওপরে কিছ‌ু একটা টাঙিয়ে দেওয়া যাবে, তাহলে সবকিছ‌ু ঠিক হয়ে যাবে,' বলে পর্দার খোঁজে যাওয়ার ছলে পা টেনে টেনে চলে গেলেন তিনি, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল অফিসারদের বিষয়ে একটা বর্ণনা দেওয়া অবিলম্বে।

মিষ্টি চেহারার ছোটখাটো উস্তিউশা জানলার ওপর গ‌ৃহকর্ত্রীর শালটা টাঙিয়ে দিতে এল। তাছাড়া অফিসাররা চা খেতে চান কিনা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন গ‌ৃহকর্ত্রী।

পরিপাটি ঘরবাড়িতে এসে কাউণ্টের মেজাজ খোশ হয়েছে মনে হল। হেসে এত সরসভাবে ঠাট্টা ইয়ার্কি জ‌ুড়ে দিল উস্তিউশার সঙ্গে যে সে তাকে দ‌ুষ্টু বলল। কাউণ্ট জানতে চাইল তার দিদিমণিটি স‌ুন্দরী কিনা, চা খেতে চায় কিনা উস্তিউশা জিজ্ঞেস করাতে বলল, তা ঘরে নিয়ে এলেও পারে, তবে চাকর সাপার এখনো তৈরী করেনি বলে যেটা আরো দরকার সেটা হল কিছ‌ু ভোদকা, আর ম‌ুখে দেবার মতো কিছ‌ু, আর কিছ‌ুটা শেরী, অবশ্য যদি বাড়িতে থেকে থাকে।

নবীন কাউণ্টের আদবকায়দা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন লিজার মামা, আজকালকার অফিসারদের শত ম‌ুখে প্রশংসা করে বললেন তারা তাদের বাপেদের চেয়ে অনেক ভালো, কোনো তুলনা হয় না।

মানতে রাজী হলেন না আন্না ফিওদরভনা — কাউণ্ট ফিওদর ইভানভিচের চেয়ে ভালো হতে পারে না কেউ। শেষটায় এমন কি সত্যি চটে উঠে কঠিন গলায় বললেন, 'দাদা, তোমাকে শেষবার যে কেউ আদর করে সেই সেরা লোক হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য লোকে আগেকার চেয়ে

চালাকচতুর হয়েছে সবাই জানে, তবু কাউণ্ট ফিওদর ইভানভিচ এত অমায়িক ছিলেন, এত ভালো একসেস নাচতেন যে বলতে গেলে সবায়ের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি আমাকে ছাড়া আর কাউকে আমল দেননি। তাহলে দেখছ তো আগেকার দিনেও ভালো লোকের অভাব ছিল না।'

ঠিক সে সময়ে ভোদকা, খাবার ও শেরী চাইবার কথাটা কানে এল।

'দেখলে তো, দাদা! ঠিক কাজটি তুমি কখনো করো না! সাপারের কথা বলা উচিত ছিল তোমার,' বললেন আন্না ফিওদরভনা। 'লিজা! তুই ভার নে তো এ সবের, লক্ষ্মীটি!'

জারানো ব্যাঙের ছাতা আর টাটকা মাখনের জন্য ভাঁড়ারে দৌড়ল লিজা, বাবুর্চিকে বলল মাংসের টুকরো সেঁকতে।

'তোমার কাছে শেরী কিছুটা হবে, দাদা?'

'না, বোন। শেরী কখনো থাকে না আমার কাছে।'

'তা কী করে হয়? চায়ের সঙ্গে কী একটা খাও যে?'

'সেটা রাম, আন্না ফিওদরভনা।'

'তফাৎটা কী? ওদের তাই দাও না, ওই... ইয়ে... রাম। তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু দাদা, ওদের এখানে ডাকলে ভালো হয় না? কী করা উচিত তুমি তো ভালো জানো। ওরা চটবে না তো?'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বললেন তাঁর কোনো সন্দেহ নেই, কাউণ্ট এত দরাজ প্রকৃতির যে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন না, তিনি ওদের নিয়ে আসবেন নির্ঘাৎ। আন্না ফিওদরভনা গেলেন তাঁর পোষাকটা আর একটা নতুন টুপি পরে নিতে; কিন্তু লিজা এত ব্যস্ত যে পরনের চওড়া-হাত গোলাপি রঙের লিনেনের পোষাকটা বদলাবার সময় পেল না। তাছাড়া সে ভয়ানক উত্তেজিত: মনে হল বিরাট কিছু একটা ঘটতে চলেছে, মাথার উপরে কালো একটা মেঘ যেন ঘনিয়ে এসেছে। তার কাছে কাউণ্ট, সুদর্শন এই হুজারটি, অদ্ভুত একটি মানুষ, অভিনব অবোধ্য। তার হাবভাব চালচলন, কথা বলার ঢং — তার সবকিছু নিশ্চয় এমন অসাধারণ যে সে আগে কখনো দেখেনি শোনেনি। তার কথা, তার চিন্তা সব নিশ্চয় বুদ্ধিদীপ্ত আর সত্য; যা কিছু সে করে ভালো না

হয়ে যায় না; তার চেহারার খুঁটিনাটি পর্যন্ত সুন্দর হতে বাধ্য। সে বিষয়ে লিজার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুধু খাবার আর শেরী নয়, গোলাপ জলে স্নান করতে চাইলেও লিজা বিস্মিত হত না, দোষ দিত না তাকে, তার দৃঢ় বিশ্বাস হত যে সেটাই ঠিক, সঙ্গত।

আন্না ফিওদরভনার আমন্ত্রণ অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের মুখে শোনামাত্র গ্রহণ করল কাউণ্ট। চুল আঁচড়িয়ে কোট চাপিয়ে সঙ্গে নিল সিগারেট-কেস।

'চলো যাই,' বলল পলজভকে।

'যাওয়াটা উচিত হবে না মনে হচ্ছে,' জবাবে বলল কর্ণেট 'ils feront des frais pour nous recevoir.'*

'বাজে কথা! ওঁরা আনন্দিত হবেন। খোঁজ খবর নিয়েছি এরি মধ্যে — ভদ্রমহিলার একটি সুন্দরী কন্যা আছে ... চলো যাই,' ফরাসীতে বলল কাউণ্ট।

'Je vous en prie, messieurs!'** ওদের কথা ধরে ফেলেছেন, শুধু সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্য ফরাসীতে বললেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার।

১২

আরক্তিম মুখে চোখ নামিয়ে লিজা চা ঢেলে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হবার ভান দেখাল, ঘরে অফিসাররা ঢোকাতে তাদের দিকে তাকাতে সাহস হল না। আন্না ফিওদরভনা কিন্তু তড়াক করে দাঁড়িয়ে একটু নীচু হয়ে অভিবাদন জানালেন, কাউণ্টের মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে ক্রমাগত বকে চললেন, বললেন তাকে দেখতে ঠিক বাপের মতো, আলাপ করিয়ে দিলেন মেয়ের সঙ্গে, খেতে দিলেন চা, জ্যাম আর গাঁয়ে তৈরী ফলের লেই। চেহারায় কর্ণেট এত বিনীত যে তাকে কোনো নজর দিল না কেউ; তাতে সে যথার্থ কৃতজ্ঞ বোধ করল, কারণ এতে লিজার সৌন্দর্য খুঁটিয়ে দেখার — ভব্যভাবে যতখানি সম্ভব — সুযোগ পাওয়া

* আমাদের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে ওঁরা ফতুর হয়ে যাবেন। (ফরাসী ভাষায়)

** আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই, মহাশয়গণ (ফরাসী ভাষায়)

গেল। বোঝা গেল সে সৌন্দর্য তার মনে দাগ কেটেছে। কাউণ্টের সঙ্গে বোনের বাক্যালাপ কখন বন্ধ হবে তার আশায় বসে আছেন মামাবাবু। অশ্বারোহী বাহিনীতে নিজের জীবনের কথা বলার জন্য এত অস্থির তিনি যে কোনক্রমে নিজের বক্তৃতা চেপে আছেন। কাউণ্ট সিগার ধরাল একটা, কী কড়া, অতিকষ্টে কাশি চাপল লিজা। কাউণ্ট বেশ বলিয়েকইয়ে লোক ও ভদ্র, প্রথমে আন্না ফিওদরভনার বাক্যস্রোতে মাঝে মাঝে দু একটা কথা ছেড়ে তারপর একাই একশ। একটা জিনিস অদ্ভুত ঠেকল শ্রোতাদের কাছে: তার বাক্য ব্যবহার নিজের দলের লোকের মধ্যে বিসদৃশ বলে বিবেচিত না হলেও এখানে একটু বেয়াড়া। তাতে অল্প শঙ্কিত হলেন আন্না ফিওদরভনা আর লিজার কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। এটা কিন্তু চোখে পড়ল না কাউণ্টের। আগেকার মতোই সে অবিচলিত ও অমায়িক। নিঃশব্দে গেলাস ভরে লিজা সেগুলো অতিথিদের হাতে না দিয়ে তাদের নাগালের মধ্যে নামিয়ে রাখল। তখনো ধাতস্থ হয়নি সে, গভীর আগ্রহে কাউণ্টের প্রত্যেকটি কথা শুনছে। তার গল্পের তুচ্ছতায় আর থেমে-থেমে বলার দোষে নিজের স্থৈর্য কিছুটা ফিরে পেল লিজা। যে জ্ঞানীসুলভ উক্তি তার মুখে শুনবে বলে আশা করেছিল পেল না শুনতে, তার সবকিছুতে একটা মার্জিত ভাব দেখার অস্পষ্ট আশাও মিটল না। তৃতীয় গেলাস চা খাবার সময়ে সলজ্জভাবে সে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে কাউণ্ট তার দিকে চেয়ে থেকেই অবিচলিতভাবে কথা বলে চলল, চেয়ে থাকতে থাকতে মুখে এল অতিক্ষীণ হাসি; তখন তার প্রতি সামান্য একটা বিরোধিতার ভাব অনুভব করল লিজা, অল্পক্ষণের মধ্যে তার কাছে ধরা পড়ল যে তার চেনাশোনা লোকেদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই ওর, ওকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। সত্যি বটে, ওর নখগুলো লম্বা আর সযত্নে সাফ করা, তবু ওকে এমন কি বিশেষ সুন্দর পর্যন্ত বলা চলে না। আর হঠাৎ, তার সব স্বপ্ন অলীক বুঝতে পেরে শান্ত হয়ে উঠল লিজা, মনে রয়ে গেল একটু অনুশোচনা। একটি মাত্র জিনিসে শুধু সে বিচলিত, বুঝতে পারল চুপচাপ বসে কর্ণেট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। "হয়ত ও নয়, এই হল আসল লোক!" ভাবল সে।

১৩

চা পানের পর বৃদ্ধা অতিথিদের অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন নিজের জায়গায়।

'আপনি হয়ত বিশ্রাম করতে চান, কাউণ্ট?' জিজ্ঞেস করলেন। কাউণ্ট 'না' বলাতে বলে চললেন, 'আপনাদের কী করে খুশি করবো, প্রিয় অতিথিরা? আপনি তাস খেলেন, কাউণ্ট? দাদা দেখো তো এক হাত খেলার ব্যবস্থা করলে হয়।'

ভাই বললেন, 'কিন্তু তুমি তো নিজে "প্রেফারেন্স" খেল। তাহলে একসঙ্গে বসা যাক। খেলতে চান, কাউণ্ট? আর আপনি?'

অফিসাররা জানাল বাড়ির লোকের যা পছন্দ তাই করতে তারা রাজী।

লিজা নিজের ঘর থেকে নিয়ে এল পুরনো তাসের একটা প্যাকেট: এটা দিয়ে সে বের করার চেষ্টা করত আন্না ফিওদরভনার দাঁতের ব্যথা শীগগির কমবে কি না, সহর থেকে সফর সেরে কখন ফিরে আসবেন মামা, প্রতিবেশীরা আসছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। দুমাস ব্যবহার করা হয়েছে তাসগুলোকে, তবু যা দিয়ে আন্না ফিওদরভনা ভাগ্য গণনা করেন তার চেয়ে পরিষ্কার।

'কিন্তু হয়ত অল্প বাজী রেখে খেলা আপনাদের পছন্দ নয়?' জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু। 'আন্না ফিওদরভনা আর আমি পয়েণ্ট পিছু আধ-কোপেক খেলি ... তাহলে কী হয়, ও আমাদের পথে বসায়।'

'আজ্ঞে যা আপনাদের মর্জি তাতেই অত্যন্ত খুশি হবো,' কাউণ্ট উত্তর দিল।

'তাহলে এক কোপেক করে হোক — কাগজী টাকা। প্রিয় অতিথিদের খাতিরে তা চলে, আমার মতো বুড়ী বেচারীকে দিন হারিয়ে,' চেয়ারে আরাম করে বসে লেসের শাল ঠিক করে নিয়ে বললেন আন্না ফিওদরভনা।

মনে মনে বললেন, "ওদের কাছ থেকে হয়ত একটা রুবল জিতবো।" বৃদ্ধ বয়সে জুয়ার নেশা একটু ধরেছে তাঁকে।

'যদি চান তাহলে "অনার্স" নিয়ে খেলাটা আপনাকে শিখিয়ে দিই,' কাউণ্ট বলল। 'আর "মিজারি" খেলাটা! বেশ মজার খেলা।'

খেলার নতুন সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পদ্ধতিতে সবাই অত্যন্ত খুশি। মামাবাবু জানিয়ে দিলেন পদ্ধতিটা তিনি জানতেন এককালে, অনেকটা 'বস্টন' খেলার মতো আর কি, কিন্তু এখন সবটা মনে নেই। কিছুই মাথায় ঢুকল না আন্না ফিওদরভনার, অনেক সময় ঢুকল না বলে তিনি বরাবর মৃদু হেসে, মাথা নেড়ে 'বুঝেছি, এখন সব বুঝেছি' বলাটা সমীচীন মনে করছিলেন। খেলার মাঝখানে আন্না ফিওদরভনা টেক্কা ও রাজা হাতে থাকা সত্ত্বেও 'মিজারি' ডেকে ছ দান পেয়ে গেলেন, তখন এল এক ছোট্ট হাসির পালা। অত্যন্ত বিব্রত হয়ে, ক্ষীণ হাসি হেসে তাড়াতাড়ি তিনি জোর দিয়ে বললেন খেলার নতুন পদ্ধতিটা এখনো ঠিক তাঁর সড়গড় হয়নি। তবু হারের অংকটা বসানো হল তাঁর নামে, আর অংকটা হল বেশ, বিশেষ করে এই জন্য যে বড়ো বাজী রেখে খেলায় অভ্যস্ত কাউণ্ট খেলছিল সাবধানে, হিসেব রাখছিল সঠিক; টেবিলের নীচে কর্ণেটের পায়ের খোঁচা আর খেলায় তার তাজ্জব ভুলের অর্থটা ধরা পড়ল না তার কাছে।

লিজা নিয়ে এল আরো ফলের লেই, তিন রকমের জ্যাম আর বিশেষ ধরনে তৈরী আপেল। মায়ের চেয়ারের পেছন থেকে খেলা দেখতে লাগল সে: মাঝে মাঝে দেখছে অফিসারদের, বিশেষ করে তাস ফেলে দিয়ে জিতের তাস সুদক্ষ সুষ্ঠুভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে নেওয়ার সময় কাউণ্টের সূক্ষ্ম শাদা লালচে নখ।

আন্না ফিওদরভনা আবার অত্যন্ত অস্থির হয়ে, অন্যদের টেক্কা দেবার বেপরোয়া চেষ্টায় বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে হারিয়ে সাত পর্যন্ত ডেকে নিলেন মাত্র চার, আর ভাই-এর অনুরোধে হিসেবের পাতায় হিজিবিজি করে কয়েকটা সংখ্যা বসিয়ে দিলেন।

'দমে যেও না, মা, সব আবার জিতে নেবে,' হাস্যকর অবস্থা থেকে মাকে উদ্ধারের চেষ্টায় মৃদু হেসে লিজা বলল। 'মামার তাসগুলো নিয়ে নাও, তাহলে উনি গভীর জলে পড়বেন।'

'তুই আমাকে সাহায্য করলে পারিস, লিজচ্‌কা,' ভীত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন আন্না ফিওদরভনা। 'জানি না কী করে ...'

'নতুন নিয়মে খেলতে আমিও জানি না,' মায়ের হারের হিসেব মনে মনে করতে করতে লিজ়া বলল। 'কিন্তু এভাবে খেললে ফতুর হয়ে যাবে মা। পিমচকাকে একটা ফ্রক কিনে দেবার পয়সা পর্যন্ত থাকবে না,' বলল ঠাট্টা করে।

'সত্যি বলেছেন, এভাবে খেললে অন্তত দশটা রূপোর রুবল অনায়াসে খোয়ানো যায়,' লিজার দিকে তাকিয়ে কর্ণেট বলল, তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার বাসনা তার।

'কিন্তু আমরা তো কাগজী টাকা নিয়ে খেলছি, তাই না?' খেলুড়েদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আন্না ফিওদরভনা।

'জানি না কী করে,' বলল কাউণ্ট, 'কিন্তু কাগজী টাকা কী করে হিসেব করতে হয় আমার জানা নেই। সেটা আপনি কী করে ... মানে, কাগজী টাকাটা কী ব্যাপার?'

'আজকাল কাগজী টাকা দিয়ে কেউ খেলে না,' বলে উঠলেন মামাবাবু, তিনি জিতছিলেন।

বৃদ্ধা কিছু ফলের রস আনিয়ে নিজেই খেলেন দু গেলাস, মুখটা লাল হয়ে উঠল আর মনে হল হতাশায় যাকে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এমন কি টুপির নীচে থেকে বেরিয়ে আসা এক গোছা পাকা চুল আবার গুঁজে দেবার খেয়াল পর্যন্ত হল না তাঁর। লক্ষ লক্ষ টাকা হারিয়ে ফতুর হয়ে গেছেন, ভাবছিলেন নিঃসন্দেহে। বারে বারে কর্ণেট টেবিলের তলা থেকে পা দিয়ে খোঁচা মারছে কাউণ্টকে, কাউণ্ট কিন্তু বৃদ্ধার হার নিয়মিতভাবে লিখে চলল। শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ হল। বিবেকের বালাই না রেখে নিজের ভাগে কিছু যোগ করার এবং হিসেবে ভুল করেছেন আর সাধারণত হিসেব করতে তিনি পারেন না ভান করার বিপুল চেষ্টা, আর নিজের ভয়ঙ্কর লোকসানে বিভীষিকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হিসেব করে দেখা গেল যে তিনি ন'শ বিশ পয়েণ্ট হেরেছেন। "তার মানে কাগজী টাকায় ন রুবল, তাই না?" বার কয়েক তিনি

জিজ্ঞেস করলেন, নিজের হারের সম্পূর্ণ অঙ্কটা মাথায় ঢুকল না তাঁর যতক্ষণ না ভাই তাঁকে আতঙ্কগ্রস্ত করে দিয়ে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি কাগজী টাকায় সাড়ে বত্রিশ রুবল হেরেছেন, আর টাকাটা দিতেই হবে।

খেলা শেষ হতে নিজের লাভ হিসেবের পরোয়া না করে কাউন্ট উঠে পড়ে গেল জানলার কাছে, সেখানে সাপারের খাবার সাজাচ্ছিল লিজা, রেকাবীতে রাখছিল ব্যাঙের ছাতা। সারা সন্ধ্যে কর্ণেট যেটা চেষ্টা করে পারেনি, সেটা কাউন্ট করল সোজাসুজি, অত্যন্ত অনায়াসে: আবহাওয়া নিয়ে লিজার সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিল।

সে সময়ে কর্ণেটের অবস্থাটা অত্যন্ত করুণ। কাউন্ট, আর বিশেষ করে লিজা চলে যেতে বৃদ্ধা আর নিজের মনোভাব চাপতে পারলেন না। মনকে প্রবোধ দেবার জন্য লিজা নেই।

'আপনার টাকা জিতে নেওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' কিছু একটা বলার খাতিরে বলল কর্ণেট। 'ব্যাপারটা আমাদের তরফ থেকে খুব ভদ্র হয়নি।'

'আপনাদের এই সব "অনার্স" আর "মিজারির" ফিকির! ওভাবে খেলতে আমি জানি না। কাগজী টাকায় কত যেন বললেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'বত্রিশ রুবল, সাড়ে বত্রিশ,' পুনরাবৃত্তি করলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, জিতেছেন বলে তিনি বেশ খোশমেজাজে। 'টাকাটা দাও তো বোন, সত্যি, আমাকে দিয়ে দাও তো।'

'সব দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে আর কখনো খেলছি না, এত হার জীবনে কখনো উশুল করতে পারব না।'

আন্না ফিওদরভনা দুলতে দুলতে তাড়াতাড়ি গিয়ে ন রুবলের কাগজী টাকা নিয়ে এলেন। বৃদ্ধের নির্বন্ধে শুধু পুরো টাকাটা দিলেন।

আবার কথা বললে আন্না ফিওদরভনা নিন্দে করে বক্তৃতা জুড়ে দেবেন বলে ক্ষীণ একটা আশঙ্কা কর্ণেটের। তাই চুপচাপ কেটে পড়ে সে গেল কাউন্ট আর লিজার ওখানে, খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন কথা বলছিল।

সাপারের জন্য পাতা টেবিলে দুটো মোমবাতি। মে রাত্রির ফুরফুরে উষ্ণ হাওয়ায় থেকে থেকে কেঁপে উঠছে আলোর শিখা। বাগানের দিকে খোলা জানলাটায় আলো, কিন্তু ঘরের আলোর মতো নয় একেবারে। সোনালী আভা ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলছে পূর্ণিমার চাঁদ, লাইম গাছের উঁচু চূড়োর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে, বয়ে-যাওয়া স্বচ্ছ শাদা রোঁয়া-রোঁয়া মেঘগুলোকে ভাসিয়ে দিচ্ছে ক্রমশ জোরালো জ্যোৎস্নায়। ওদিকের পুকুরে দল বেঁধে ব্যাঙ ডাকছে, গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে জ্যোৎস্নায় রূপালী ঝকঝকে জলের টুকরো। জানলার নিচে হাওয়ায় দোলন্ত ভিজে ফুলের গোছা নিয়ে দাঁড়ানো সুগন্ধি লাইলাক ঝোপের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কয়েকটা পাখির দাপাদাপি আর পাখার ঝাপট।

'কী অদ্ভুত রাত্রি!' বলে কাউণ্ট লিজার কাছে গিয়ে জানলার নীচু ধারিতে বসল। 'আপনি প্রায়ই বেড়াতে যান নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ,' বলল লিজা। কী কারণে যেন কাউণ্টের সঙ্গে কথা বলতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি লাগল না তার। 'সকাল সাতটায় বাড়ির কাজকর্ম করতে বেরোই। তাছাড়া হেঁটে আসি পিমচকার সঙ্গে, ওই যে ছোট্ট মেয়েটাকে মা পুষ্যি নিয়েছেন, তার সঙ্গে।'

'সত্যি গাঁয়ে থাকতে এত ভালো লাগে,' মনোকলটা চোখে বসিয়ে একবার বাগানের দিকে, একবার লিজার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল কাউণ্ট। 'চাঁদের আলোয় কখনো কি বেড়াতে বেরোন?'

'এখন নয়। বছর তিনেক আগে মামা আর আমি চাঁদিনী রাতে নিয়ম করে বেরোতাম, তখন ওঁর একটা অদ্ভুত অসুখ হল — ঘুমোতে পারেন না। পূর্ণিমার চাঁদ হলে কিছুতে ঘুম আসে না। ওঁর ঘরটা — ওদিকের ঘরটা — একেবারে বাগানের ওপর আর জানলাটা নীচু; তাই চাঁদের আলো সোজা ওঁর ওপর পড়ে।'

'অদ্ভুত,' বলল কাউণ্ট। 'ওটা আপনার ঘর ভেবেছিলাম।'

'আজ রাত্তিরটা শুধু ওখানে থাকবো। আমার ঘরে আপনারা ঘুমবেন।'

'তাই নাকি?.. সত্যি, আপনার অসুবিধে ঘটাচ্ছি বলে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না।' নিজের আন্তরিকতা দেখাবার জন্য

মনোকলটা চোখ থেকে খুলে ফেলল কাউণ্ট। 'আমরা আসাতে আপনাদের এত অসুবিধে হবে জানলে ...'

'অসুবিধে আবার কী! বরং আমি খুব খুশি হয়েছি: মামার ঘরটা বেশ — আলো-ভরা আর ঝকঝকে, জানলাটা নীচু, ঘুম না আসা পর্যন্ত বসে থাকবো জানলায়, কিম্বা হয়ত শোবার আগে জানলা বেয়ে বাগানে নেমে ঘুরে আসবো।'

"কী মধুর মেয়েটি!" ভালো করে তাকে দেখার জন্য মনোকলটা আবার এঁটে নিয়ে, জানলার ধারিতে বসার ছলে পা দিয়ে তার পা ছোঁবার চেষ্টা করতে করতে ভাবল কাউণ্ট। "আর কী সেয়ানাভাবে আমাকে জানিয়ে দিল যে ইচ্ছে হলে জানলায় এসে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।" বাস্তবিক মেয়েটিকে এত সহজে জয় করে ফেলেছে মনে হওয়াতে তার প্রতি আগেকার আকর্ষণ অনেকটা কমে গেল।

অন্ধকার বীথিকার দিকে ভাবুকের মতো তাকিয়ে বলল, 'সত্যি মনের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে আজকের রাত্তিরটা কাটানো কী সুখের!'

কথাটায়, আর যেন দৈবাৎ কাউণ্টের পা নিজের পায়ে আর একবার ঠেকে যাওয়াতে বিব্রত বোধ করল লিজা। সেটা ঢাকার জন্য কিছু না ভেবেই যা হোক একটা কিছু তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করল। বলল, 'হ্যাঁ, চাঁদের আলোয় বেড়াতে চমৎকার লাগে।' অস্বস্তি বোধ করে, ব্যাঙের ছাতার বোতল তাড়াতাড়ি বেঁধে চলে যাবার উপক্রম করেছে, কর্ণেট এসে পড়ল, আর লোকটা কেমন দেখে নেবার একটা ইচ্ছে হল তার।

'কী সুন্দর রাত্রি?' বলল কর্ণেট।

"এরা দেখছি আবহাওয়া ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা বলে না," ভাবল লিজা।

'আর দৃশ্যটা কী মধুর!' বলে চলল কর্ণেট। 'কিন্তু মনে হচ্ছে এ সবে এরি মধ্যে আপনার অরুচি ধরে গেছে,' যোগ করল সে। যাদের খুব ভালো লাগে তাদের অপ্রীতিকর কিছু একটা বলার অদ্ভুত অভ্যেস তার বরাবর আছে।

'কেন সেটা ভাবছেন? একই খাবার বা একই ফ্রকে অরুচি ধরে যায়, কিন্তু সুন্দর বাগানে কখনো অরুচি হয় না, বিশেষ করে চাঁদ যখন

আরো উঁচুতে ওঠে। মামার ঘর থেকে পুকুরের সবটা দেখা যায়। আজ রাত্তিরে দেখবো।'

'আপনাদের এখানে নাইটিংগেল নেই, মনে হচ্ছে?' বলল কাউণ্ট। অসময়ে এসে পড়ে বাধা দিয়েছে পলজভ, নৈশ অভিসারের পাকাপাকি বন্দোবস্ত কিছু করা হল না, বেজায় অসন্তুষ্ট সে।

'না। এক সময়ে ছিল, কিন্তু গেল বছরে একজন শিকারী একটিকে ধরেছিল, আর এ বছরে — মানে গত সপ্তাহে — সুন্দর ডাকছিল একটা, কিন্তু একটা কনস্টেবল গাড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে গেল, আর পাখিটা ভয় পেয়ে উড়ে গেল। গেল বছরের আগের বছরে মামা আর আমি বাগানের পথে গাছের নীচে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদের গান শুনতাম।'

'ক্ষুদে বকুনতুড়েটি কী শোনাচ্ছে আপনাদের?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু। 'কিছু মুখে দেবেন না আপনারা?'

সাপারের সময়ে কাউণ্ট খাবারের তারিফ করাতে আর এক পেট খাওয়াতে আন্না ফিওদরভনার মেজাজটা একটু ভালোর দিকে গেল। খাওয়ার পর অফিসাররা নমস্কার জানিয়ে গেল নিজেদের ঘরে। মামাবাবুর করমর্দন করল কাউণ্ট, আর আন্না ফিওদরভনাকে অবাক করে দিয়ে হাতে চুমু না খেয়ে তাঁরো করমর্দন করল, এমন কি লিজারও, করমর্দনের সময়ে সোজা তার চোখে চোখ রেখে হাসল তার সেই মৃদু ও মিষ্টি হাসি। তার চাউনিতে আবার বিব্রত লাগল লিজার।

"চেহারাটা ভালো," সে ভাবল, "কিন্তু বড্ডো জাঁক নিজের বিষয়ে।"

১৪

'তোমার লজ্জা করছে না?' নিজেদের ঘরে পেঁাছিয়ে জিজ্ঞেস করল পলজভ। 'হারার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, ক্রমাগত তোমাকে টেবিলের নীচে পা দিয়ে খোঁচা লাগিয়েছি। তোমার বিবেক বলে কিছু নেই। বৃদ্ধা ভয়ানক ব্যথিত হয়েছেন।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল কাউণ্ট।

'কী মজার বুড়ীটা! মনে বড়ো আঘাত পেয়েছেন!'

আর আবার হাসির গমকে ফেটে পড়ল সে, হাসিটা এত সংক্রামক যে তার সামনে দণ্ডায়মান জোহান পর্যন্ত চোখ নামিয়ে চোরা মুচকি হাসি হাসল একটু।

'পরিবারের পুরনো বন্ধুবরের সন্তান!.. হো, হো, হো!' হেসে চলল কাউণ্ট।

'কিন্তু সত্যি ওটা ভালো করোনি, ওঁর জন্য আমার এমন কি দুঃখ হচ্ছিল,' কর্ণেট বলল।

'কাঁচকলা! তুমি এখনো নেহাৎ বাচ্চা দেখছি! তুমি চাও আমি হারি? হারবো কেন? যখন খেলা জানতাম না তখন তো হেরেছি। দশটা রুবল কাজে লাগে, ভাই। প্র্যাকটিকাল হওয়া চাই, বুঝলে? নইলে বোকা বনে যেতে হয়।'

চুপ করে গেল পলজভ। তার ইচ্ছে আত্মস্থ হয়ে লিজার কথা ভাবা, লিজাকে তার অসাধারণ নিষ্পাপ ও সুন্দর ঠেকেছে। জামাকাপড় ছেড়ে তার জন্য পাতা নরম পরিষ্কার বিছানায় সে গা ঢেলে দিল।

"ফৌজী জীবনের সম্মান আর যশ, কী বাজে কথা সব!" শালে ঢাকা জানলা দিয়ে চুপি চুপি আসা চাঁদের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকিয়ে ভাবল সে। 'এই হল সুখ — শান্ত কোনো গেহে সহজ মধুর বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সঙ্গে থাকা! এই হল আসল আর পাকা সুখ!'

কিন্তু কী কারণে যেন মনের কথা বলল না বন্ধুকে, গাঁয়ের মেয়েটির কথা উল্লেখ পর্যন্ত করল না একবার, যদিও তার কোনো সন্দেহ ছিল না যে কাউণ্টও ভাবছে তার কথা।

'জামাকাপড় ছাড়ছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল পদচারণারত কাউণ্টকে।

'কেন জানি না ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে হলে আলোটা নিভিয়ে দাও, আমার দরকার নেই।'

পায়চারি থামাল না কাউণ্ট।

'ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না,' আওড়াল পলজভ। সে সন্ধ্যার সব ঘটনায় নিজের ওপর কাউণ্টের প্রভাবে তার বিরক্তি ধরে গেছে, এত বিরক্তি আগে কখনো হয়নি, আর প্রভাবটা দাবানোর মতো মনের অবস্থা। মনে মনে তুরবিনকে বলল, "তোমার ওই চকচকে মাথার মধ্যে কী চিন্তা

পাক খাচ্ছে ঠাহর করা শক্ত নয়! কেমন মোহিত হয়ে গিয়েছিলে ওকে দেখে সেটা তো দেখলাম! কিন্তু ওর মতো সহজ ও শুচি মানুষকে বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই। তোমার চাই মিনার মতো মেয়ে আর কর্ণেলের ভূষণ। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি লিজাকে কেমন লেগেছে।”

কিন্তু পাশ ফিরে কাউণ্টকে সম্বোধন করতে গিয়ে সংকল্প বদলাল সে। মনে হল লিজার বিষয়ে কাউণ্টের যা ধারণা হয়েছে বলে সে ধরে নিয়েছে ঠিক যদি তাই হয় তাহলে শুধু যে আপত্তি জানাতে পারবে না তা নয়, হয়ত দেখবে তার কথায় সায় পর্যন্ত দিচ্ছে, কাউণ্টের প্রভাব মেনে নেওয়া তার এমন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, যদিও দিনের পর দিন সে প্রভাবটা আরো অযৌক্তিক, আরো অসহ্য হয়ে পড়ছে।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' কাউণ্ট টুপি চাপিয়ে দরজার দিকে যেতে সে জিজ্ঞেস করল।

'আস্তাবলে। দেখে আসি সব ঠিক কিনা।'

“অদ্ভুত,” ভাবল কর্ণেট, কিন্তু আলো নিভিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে চেষ্টা করল এই সেদিনকার বন্ধুকে নিয়ে মাথায় যে সব আজগুবি ঈর্ষা ও শত্রুতার চিন্তা আসছে সেগুলো তাড়িয়ে দিতে।

এদিকে নিয়মমত ভাই, মেয়ে ও পোষ্যকে চুমু খেয়ে ও তাদের ওপর ক্রুশ-চিহ্ন করে আন্না ফিওদরভনা নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন। একদিনে এত সুতীব্র নানা অনুভূতি বহুকাল তাঁর হয়নি। এমন কি শান্তভাবে প্রার্থনা পর্যন্ত করতে পারলেন না তিনি, বিগত কাউণ্টের বিষণ্ণ ও সুস্পষ্ট স্মৃতি, আর তাঁর কাছ থেকে নির্লজ্জভাবে টাকা-কেড়ে-নেওয়া এই ছোকরা ফুলবাবুটির কথা এত বিচলিত করেছিল তাঁকে। তবু জামাকাপড় ছেড়ে, বিছানার পাশে ছোট টেবিলে তাঁর জন্য সর্বদা রাখা আধ-গেলাস ক্‌ভাস খেয়ে তিনি বরাবরকার মতো বিছানায় ঢুকলেন। পেয়ারের বেড়ালটা গুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। তাকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে শুনতে লাগলেন তার গরগরানি, ঘুম আর আসে না চোখে।

“বেড়ালটার জন্যে ঘুম আসছে না,” ভেবে ঠেলে সরিয়ে দিলেন সেটাকে। মেঝেতে টুপ করে পড়ে বেড়ালটা ফাঁপাফোলা লোমওয়ালা

ল্যাজ বেঁকিয়ে চুল্লির ওপরে উঠল লাফিয়ে। ঠিক সে সময়ে কর্ত্রীর ঘরের মেঝেতে যে ঝিটি শুত সে এসে মাদুর এনে বিছিয়ে বাতিটা নিভিয়ে আইকন-দীপ জ্বালাল। নাক ডাকাতে তার দেরী হল না, কিন্তু আন্না ফিওদরভনার বিক্ষুব্ধ মনে ঘুমের শান্তি আর আসে না। যখনি চোখ বোজেন তখনি দেখেন হুজারের মুখ, আর চোখ খুললে মনে হয় ঘরের সব কটা জিনিস্ বিচিত্রভাবে তারি প্রতিচ্ছবি — আইকন-দীপে অল্প উদ্ভাসিত কমোড, টেবিল, টাঙানো শাদা ফ্রকগুলো, সবকিছু। পালকের লেপে এই মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে, পরমুহূর্তে আবার ঘড়ির ঘণ্টা বা ঝির নাক ডাকাতে বিরক্তি ধরে যাচ্ছে। মেয়েটিকে জাগিয়ে হুকুম দিলেন যেন নাক না ডাকে। মনে অদ্ভুতভাবে জট পাকিয়ে যাচ্ছে মেয়ের কথা, বিগত কাউণ্ট ও নবীন কাউণ্টের কথা, 'প্রেফারেন্স' খেলার কথা। একবার দেখলেন ওয়াল্‌জ্‌ নাচছেন বিগত কাউণ্টের সঙ্গে, দেখলেন নিজের গোলগাল শুভ্র কাঁধ, তাতে যেন কার অধরের স্পর্শ, আবার দেখলেন নবীন কাউণ্টের বাহুবন্ধনে মেয়েকে। নাক ডাকাতে শুরু করল উস্তিউশ্‌কা আবার...

'না, না; লোকে আর আগেকার মতো নেই। আমার জন্যে তিনি আগুনে ঝাঁপ দেবার পরোয়া করতেন না। করতেন না যে, তার কারণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এটি দেখছি গাধার মতো ঘুমোচ্ছে, জিতেছে বলে খুশি, প্রেম করার জন্যে নড়াচড়ার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই। কিন্তু ওর বাপ হাঁটু গেড়ে বসে কী না বলতেন! "কী করতে বলো আমাকে? নিজেকে মেরে ফেলবো?" আর আমি চাইলে নিশ্চয় তাই করতেন।'

হঠাৎ হল-ঘরে শোনা গেল খালি পায়ের মৃদু শব্দ, আর লিজা বিবর্ণমুখে কম্পিত দেহে দৌড়ে ঘরে ঢুকে প্রায় পড়ে গেল মায়ের বিছানায়, তার গায়ে ড্রেসিং-জ্যাকেটের ওপর শুধু একটা শাল চাপানো...

মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে লিজা গিয়েছিল একা মামার ঘরে। শাদা একটা ড্রেসিং-জ্যাকেট পরে, লম্বা ঘন বিনুনি রুমালে বেঁধে, বাতি নিভিয়ে জানলা খুলে পা গুটিয়ে বসেছিল একটা চেয়ারে, বিষণ্ণ চিন্তায় মগ্ন হয়ে চেয়েছিল রূপালী আলোয় ঝিকঝিকে পুকুরটার দিকে।

তার প্রতিদিনকার সমস্ত কাজ আর আগ্রহের জিনিস হঠাৎ দেখা দিল সম্পূর্ণ নতুন একটা চেহারায়: বুড়ী খামখেয়ালী মা, যার প্রতি অকপট অনুরাগ সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে; কোমলপ্রকৃতি দুর্বল মামা, নবীনা কর্ত্রীতে অনুরক্ত বাড়ির ঝিচাকর আর চাষী, গরু আর বাছুর, আর কত না হেমন্তের ক্ষয় আর কত বসন্তের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে পরিচিত তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, যার মধ্যে ভালোবেসে ও ভালোবাসা পেয়ে সে বড়ো হয়েছে, যা থেকে পেয়েছে হালকা মধুর মনের শান্তি — সমস্ত এখন মনে হল কিছু না, মনে হল ক্লান্তিকর, অপ্রয়োজনীয়। কে যেন কানে কানে বলছে, "হায়রে, কী বোকা! কী বোকা! সত্যিকার জীবন আর সুখ কাকে বলে না জেনে বিশটা বছর অপরের সেবায় নষ্ট করেছে!" ঝকঝকে, নিস্তব্ধ বাগানের গভীরে চেয়ে এ সব চিন্তা এখন আরো প্রবলভাবে এল মাথায়, এমন প্রবলভাবে কখনো আসেনি আগে। কে জাগাল তাদের? অনেকে ভাবতে পারেন, কাউণ্টের প্রতি অকস্মাৎ অনুরাগ, কিন্তু সেটা সত্যি নয় একেবারে। বরং তাকে ভালো লাগেনি লিজার। আরো সহজে সে প্রেমে পড়তে পারত কর্ণেটের কিন্তু লোকটি সাদাসিধে, গরিব আর স্বল্পভাষী। লিজা এরিমধ্যে ভুলে গিয়েছে তাকে। কিন্তু কাউণ্টের কথা মনে পড়ছে রাগে আর বিরক্তিতে। "না, ও সে লোক নয়," মনে মনে বলল সে। তার আদর্শ মানুষ হল সর্বাঙ্গসুন্দর, এমন কেউ যাকে আজকের মতো রাত্রে, আজকের মতো পরিবেশে ভালোবাসা যায় চারিদিককার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ না করে, স্থূল বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য একবারও হেয় করা হয়নি সে আদর্শকে।

প্রেমের যে বিপুল শক্তি আমাদের সকলের অন্তরে সমানভাবে দিয়েছেন পরমেশ্বর, সেটি প্রথম প্রথম লিজার অন্তরে অটুট ও অব্যাহত ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের ফলে, কৌতূহল-জাগানো লোকের অভাবে। কিন্তু অনেক দিন নিজের মধ্যে এই কিছু একটার অস্তিত্বের বিষণ্ণ আনন্দ-ভরা অনুভূতি নিয়ে সে থেকেছে (মাঝে মাঝে রহস্যময় অন্তরের ঢাকনা খুলে চুপিচুপি তাকিয়ে তার রত্ন ভাণ্ডার উপভোগ করত) — এত দিন থেকেছে যে হঠাৎ-দেখা কোনো নবাগতকে সেটা উজাড় করে দেওয়া চলে না। ভগবান করুন যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে এই

সামান্য সুখ নিয়ে থাকে! এটাই যে শ্রেষ্ঠ ও বিপুলতম আনন্দ নয়, কে বলতে পারে? কে বলতে পারে যে একমাত্র এটাই আসল ও সম্ভাব্য আনন্দ নয়?

'হে ঈশ্বর,' মৃদু কণ্ঠে বলল লিজা, 'আমার যৌবন আর সুখ বয়ে গেছে, তাদের স্বাদ পাবো না কখনো... এটা কি সম্ভব? সত্যি কি সেটা?' আর চোখ তুলে তাকাল ঝকঝকে আকাশে, যেখানে চাঁদের দিকে অগ্রসর তুলোর মতো শাদা মেঘ ঢেকে দিচ্ছে তারাগুলোকে। 'একেবারে ওপরের মেঘটা যদি চাঁদ ছোঁয়, তাহলে এটা সত্যি,' বলল নিজেকে। দীপ্ত আকাশমণ্ডলের নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ল একটা কুয়াশা-ভরা ধোঁয়াটে ফালি, আর আস্তে আস্তে ঘাস, লাইম গাছের চূড়ো আর পুকুরের ওপরের ঝকঝকে আলো ঝাপসা হয়ে এল, অস্পষ্ট হয়ে গেল গাছের কালো ছায়া। আর যেন পৃথিবীকে আঁধার করা বিষণ্ণ ছায়াগুলোতে সাড়া দিয়ে পাতার ওপর দিয়ে বইল মৃদুমন্দ হাওয়া... জানলায় বয়ে আনল শিশিরে-ভেজা পাতা, ভেজা মাটি ও লাইলাক ফুলের গন্ধ।

"না, সত্যি নয়," নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে লিজা ভাবল, "আজ রাতে যদি একটা নাইটিংগেল গান ধরে তাহলে আমার সব বিষণ্ণ চিন্তা শুধু বোকামি, হতাশ হবার কারণ নেই।" অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল কার প্রত্যাশায়; মাঝে মাঝে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসাতে আলো হয়ে যাচ্ছে দৃশ্যপট, আবার পৃথিবীতে ছায়া ফেলে চলে যাচ্ছে মেঘের পেছনে। ঘুমিয়ে পড়েছে প্রায়, পুকুরের ধার থেকে কানে এল একটি নাইটিংগেলের মুক্তকণ্ঠ গান। চোখ খুলল গাঁয়ের কন্যাটি। দীপ্ত ও প্রশান্তভাবে চারিদিকে প্রসারিত প্রকৃতির সঙ্গে আবার নতুন উচ্ছ্বাসে একটা রহস্যময় সাযুজ্যে উজ্জীবিত হল তার হৃদয়। কনুই-এ ভর দিয়ে বসল সে। অন্তরে মধুর বিষণ্ণতার জোয়ার, চোখ ভরে গেল জলে, সে অশ্রু পরিপূরণের জন্য ব্যাকুল, বিপুল ও পূত প্রেমের জল শুভ মন-জোড়ানো চোখের জল। জানলার ধারিতে হাত রেখে তাতে মাথা রাখল সে। প্রিয় একটি প্রার্থনার মন্ত্র আপনা থেকে উচ্চারিত হল অন্তরে আর ঠিক যেমন ছিল তেমনভাবে তন্দ্রায় ঢলে পড়ল লিজা, চোখ তখনো অশ্রুসিক্ত।

কার হাতের স্পর্শে তন্দ্রা টুটল। জেগে উঠল লিজা। হালকা, মধুর স্পর্শ। মুঠো শক্ত হয়ে বসল হাতে। হঠাৎ স্থানকাল বুঝে অস্ফুট চীৎকার করে সে লাফিয়ে উঠল, জানলার ধারে দাঁড়ানো, জ্যোৎস্নায় চিকচিকে মানুষটি কাউণ্ট হতে পারে না, নিজেকে এই বলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

১৫

মানুষটি কিন্তু কাউণ্টই। মেয়েটির চীৎকার ও বেড়ার অন্যধার থেকে রাত্রির পাহারাদারের গলা খাঁকারি কানে আসাতে সে চকিতে শিশির-সিক্ত ঘাসের ওপর দৌড়িয়ে ঢুকল বাগানের গভীরে, ভাবটা হাতেনাতে ধরা-পড়া চোরের মতো। নিজেকে বলল, "কী বোকা আমি! ওকে ভয় পাইয়ে দিলাম। আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল কথা বলে ওকে জাগানো। কী গাধা আমি!" থেমে কান পেতে রইল: ফটক হয়ে বাগানে ঢুকে পাহারাদার কাঁকরের পথে লাঠি ঘষটে আসছে। না লুকোলে নয়। পুকুর পারে নেমে গেল সে। একেবারে পায়ের তলা থেকে ভয়ে লাফ দিয়ে ঝপাস্ করে জলে ঝাঁপিয়ে ব্যাঙগুলো চমকে দিল তাকে। পা ভিজে গেছে, তবু উবু হয়ে বসে নিজের কীর্তি মনে তোলাপাড়া করে দেখতে লাগল: বেড়া ডিঙিয়ে কী করে ওর জানলাটা খুঁজে বের করে শেষে দেখল ওর অস্পষ্ট ছায়া; পাছে সামান্য খসখস আওয়াজটুকু হয়, কয়েক বার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে; একবার নিশ্চিত মনে হয়েছে ও তারি অপেক্ষায় আছে, এমন কি এত দেরী করাতে বেশ চটেছে, পর মুহূর্তে আবার নিশ্চিত মনে হয়েছে, গোপন মিলনে এত চট করে রাজী হতে সে কখনো পারে না; গাঁয়ের মেয়েসুলভ সরমে পড়ে ঘুমের ভান করছে, অবশেষে এই ধরে নিয়ে কাছে গিয়ে দেখেছে সত্যি সত্যি ও ঘুমিয়ে পড়েছে; কেন জানি না তক্ষুণি ফিরে এসেছে তাড়াতাড়ি, কিন্তু নিজের কাপুরুষতায় লজ্জা বোধ করে আবার গিয়ে সাহস ভরে হাত রেখেছে তার হাতে। গলা খাঁকারি দিল আবার রাতের পাহারাদার, বাগান থেকে বেরিয়ে যাওয়াতে কিঁচকিঁচ করে উঠল ফটকটা। মেয়েটির ঘরের জানলা

দড়াম করে বন্ধ হল, ভেতরের খড়খড়ি টানা। এতে বেজায় বিরক্ত বোধ করল কাউণ্ট। সবকিছু নতুনভাবে শুরু করার জন্য সে কী না দিতে পারে! সত্যি, দ্বিতীয় বার এ রকম বোকামি সে কখনো করত না!.. "কী মধুর মেয়েটি! এত সরস! সত্যি সুন্দর! আর আমি কিনা হাত ফসকে যেতে দিলাম ওকে... কী গাধা আমি!" এতক্ষণে ঘুম তার মাথায় উঠেছে, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলে লোকে যেমন দৃঢ় পায়ে হাঁটে তেমনিভাবে সে চলল লাইম গাছের মধ্যেকার পথ ধরে।

কিন্তু আজকের রাত্রি এমন কি তারো মনে শান্তির দান হিসেবে আনল প্রশান্ত একটি বিষণ্নতা ও প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা। লাইম গাছের ঘন ডালপালা ভেদ করে সোজা এসে চাঁদের ক্ষীণ আলো ফুটফুট দাগ ফেলেছে মাটির পথে, এখানে সেখানে ঘাসের টুকরো আর শুকনো ডাঁটা ঠেলে বেরিয়েছে যে পথটায়। থেকে থেকে এক একটা বেঁকাচোরা ডালের এক দিকে আলো পড়াতে মনে হচ্ছে সেটা যেন শাদা শেওলায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে একসঙ্গে ফিসফিসিয়ে উঠছে রূপালী পাতা। বাড়ির আলো নিভোনো, সব শব্দ থেমে গেল; নাইটিংগেলের গানে শুধু ভরে উঠল এই উজ্জ্বল, নিস্তব্ধ, অবারিত স্থানকাল। "কী রাত্রি! কী অপরূপ রাত্রি!" বাগানের তাজা সুগন্ধি হাওয়া বুক ভরে নিতে নিতে ভাবল কাউণ্ট। "কিন্তু কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। মনে হচ্ছে নিজেকে বা অপরকে নিয়ে আমি আর খুশি নই, এমন কি জীবনকে নিয়েও নয়। কী সুন্দর মধুর মেয়েটি! হয়ত ও সত্যিই দুঃখিত..." ওর ভাবনাচিন্তা অন্য মোড় নিল এখন। বাগানে গাঁয়ের মেয়েটির সঙ্গে নিজেকে দেখল অত্যন্ত আজগুবি ও বিভিন্ন নানা অবস্থায়, তারপর গাঁয়ের মেয়েটির জায়গা নিল মিনা। "কী বোকামি না করেছি! উচিত ছিল শুধু ওর কোমর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া!" আর মনে এই অনুশোচনা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল কাউণ্ট।

কর্নেট তখনো ঘুমোয়নি। তখুনি পাশ ফিরে কাউণ্টের মুখের দিকে চাইল।

'এখনো জেগে?' জিজ্ঞেস করল কাউণ্ট।

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছিল বলবো নাকি?'

'কী?'

'বলা হয়ত উচিত হবে না তবু বলি। ওহে, একটু সরে শোও ত।'

আর ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া সুযোগের চিন্তা কাঁধের ঝাঁকুনিতে ঝেড়ে ফেলে বন্ধুর বিছানায় সে বসল বেশ সজীব একটা হাসি মুখে টেনে।

'বিশ্বাস হবে কথাটা? গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিল মেয়েটি।'

'কী বলছ তুমি?' লাফিয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল পলজভ।

'শোনো না, বলছি।'

'কেমন করে? কখন! বিশ্বাস করি না আমি!'

'তোমরা তখন "প্রেফারেন্সে" জিতের হিসেব করছিলে, ও বলল আজ রাতে জানলার কাছে বসে থাকবে আর জানলা হয়ে ঘরে যাওয়া যায়। প্র্যাকটিকাল লোক, এই সুবিধে, বুঝলে কিনা! তোমরা বুড়ীর সঙ্গে হিসেবে ব্যস্ত, আর আমি নিজের ব্যাপার গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। কেন, তুমি নিজেই তো ওকে বলতে শুনলে যে আজ রাতে জানলার কাছে বসে পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকার ইচ্ছে ওর।'

'হ্যাঁ, কিন্তু অমনি বলেছিল।'

'সেটাই তো সমস্যা; কথাটা ও এমনি বলেছিল না অন্যভাবে, এখনো ঠিক করে উঠতে পারছি না। হয়ত সত্যিই কিছু হঠাৎ চায়নি, শুধু মনে হয়েছিল অন্য রকম। সমস্তটার শেষ হল বিদঘুটে। আমি একেবারে গাধার মতো একটা কাণ্ড করলাম,' ঘৃণার হাসি হেসে কাউণ্ট যোগ করল।

'কী হল? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

যা ঘটেছিল কাউণ্ট বলল তাকে, বাদসাদ না দিয়ে, শুধু জানলায় যাবার আগে নিজের ইতস্তত একাধিক প্রয়াসের কথা চেপে গেল।

'আমার দোষে ভেস্তে গেল। আরো সাহসী হওয়া উচিত ছিল। ও চেঁচিয়ে পালিয়ে গেল জানলা থেকে।'

'তাহলে ও চেঁচিয়ে পালিয়ে গেল,' পুনরুক্তি করল কর্ণেট,

কাউণ্টের হাসিতে অস্বস্তি ভরে হেসে সাড়া দিয়ে; সেই কাউণ্ট যার প্রভাব তার ওপর এত প্রবল ছিল আর ছিল এতদিন ধরে।

'হ্যাঁ। যাকগে, এবার ঘুমোলে হয়।'

আবার দরজার দিকে পেছন ফিরে মিনিট দশেক চুপচাপ শুয়ে রইল কর্ণেট। সে সময়ে তার অন্তরের গভীরে কী চলেছিল ভগবান জানেন, কিন্তু আবার যখন পাশ ফিরল তখন তার মুখে যন্ত্রণা ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের একটা ছাপ।

'কাউণ্ট তুরবিন!' হঠাৎ হাঁকল সে।

'প্রলাপ বকছ নাকি?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কাউণ্ট। 'কী চাই, কর্ণেট পলজভ?'

'কাউণ্ট তুরবিন, আপনি একটা বদমাস!' বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে চেঁচিয়ে উঠল পলজভ।

১৬

স্কোয়াড্রন পরের দিন রওনা হল। বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করল না, বিদায় নিল না অফিসাররা। কোনো কথাবার্তা হল না নিজেদের মধ্যে। স্কোয়াড্রন যেখানে প্রথম থামবে সেখানে তাদের ডুয়েল লড়া ঠিক, কিন্তু কাউণ্ট যাকে নিজের সেকেণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছিল সেই হিতৈষী বন্ধু, বাহাদুর ঘোড়সওয়ার ও হুজারদের প্রিয় ক্যাপ্টেন শুল্‌ৎসের ব্যবস্থার গুণে ডুয়েলটা যে হল না শুধু তা নয়, রেজিমেণ্টের কেউ ঘুণাক্ষরে টের পেল না কথাটা। তুরবিন ও পলজভের সেই পুরনো ঘনিষ্ঠতা আর ফিরে এল না বটে, কিন্তু পরস্পরকে তারা 'তুমি' বলত, ডিনারে ও পার্টিতে দেখা হত দুজনের।

১৮৫৬



সুখের সংসার

প্রথম খণ্ড

১

মা মারা গেলেন হেমন্তে, সারা শীতটা নিজেদের গ্রামে শোকে কাটালাম আমরা তিনজন — কাতিয়া, সনিয়া আর আমি। কাতিয়া আমাদের পরিবারের পুরোনো বন্ধু; সেই গভর্ণেস হিসেবে আমাদের মানুষ করেছে, ছেলেবেলা থেকে, জ্ঞান হওয়া থেকে তাকে ভালোবেসেছি। সনিয়া আমার ছোট বোন।

পক্রভস্কয়েতে আমাদের পুরোনো বাড়িতে সে শীতটা কাটল বিষণ্ণ বিরসভাবে। বেশ ঠাণ্ডা, হাওয়ার দমক, জানলা ছাড়িয়ে উঠেছে

বরফের স্তূপ, বেশীর ভাগ সময়ে জানলাগুলো বরফে ঝাপসা জমা। সারা শীত বাড়ি ছেড়ে বেরোইনি বলতে গেলে, লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। আমাদের বাড়িতে লোক আসত ক্বচিৎ কখনো, আর এলেও আনন্দের সাড়া জাগত না। সবাই আসত বিষণ্ণ মুখে, কথা বলত নিচু গলায়, যেন কে জেগে উঠবে এই ভয়; কখনো হাসত না তারা, শুধু দীর্ঘশ্বাসের পালা, আমার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠত, কান্নাটা আরো ঘন ঘন হত কালো ফ্রক পরা ছোট্ট সনিয়াকে দেখলে। মনে হত মৃত্যু তখনো বাড়ির মায়া কাটায়নি, পরিবেশে মৃত্যুর বিষাদ আর থমথমে ভাব। মায়ের ঘর তালাচাবি দেওয়া; শুতে যাবার সময়ে ঠাণ্ডা ফাঁকা ঘরটা আমাকে টানত, মনে আসত ভয়।

আমার বয়স তখন সতেরো। মারা যাবার বছরে মা ঠিক করেছিলেন আমাকে উচ্চ সমাজে নিয়ে যাবার জন্য সহরে যাবেন। তাঁর মৃত্যুতে ভয়ানক শোক পেয়েছিলাম, কিন্তু একটা জিনিস স্বীকার করা ভালো: শোকের তলায় ছিল আর একটি অনুভূতি — আমার বয়স কম, লোকে বলে আমার চেহারাটা মিষ্টি, আর তবু কিনা গ্রামের নিঃসঙ্গতায় আর একটা শীত আমাকে কাটাতে হবে মিছিমিছি। শীতের শেষের দিকে নিঃসঙ্গতার দরুন আমার ব্যাকুলতা ও স্রেফ একঘেয়েমির বিরক্তি এত বেড়ে গেল যে ঘর ছেড়ে বেরোতাম না একেবারে; পিয়ানো কিম্বা বইতে হাত দিতাম না কখনো। কোন কিছুতে মন দেবার জন্য কাতিয়া পীড়াপীড়ি করলে বলতাম চাই না, বলতাম পারি না, কিন্তু মনে মনে শুধাতাম নিজেকে: "কেন করবো? জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি খামোখা কাটছে, কিছু করার দরকার কী? করবো কেন?" অশ্রুজল ছাড়া এ প্রশ্নের আর কোন জবাব ছিল না।

লোকে বলত আমি রোগা হয়ে গিয়েছি, দেখতে কেমন যেন সাদাসিধে, কিন্তু তাতে আমার ঔদাসীন্য কাটত না। হলাম বা তাই, কী এসে যায়? কার জন্য মাথা ব্যথা? মনে হত এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে আমার সমস্ত জীবনটা কাটবে, কাটবে আশাহীন একঘেয়েমিতে, সেটা কাটিয়ে ওঠার শক্তি বা ইচ্ছে একা আমার নেই। শীতের শেষের দিকটায়

আমার স্বাস্থ্য নিয়ে কাতিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, ঠিক করল যেমন করে হোক আমাকে বিদেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য টাকা দরকার; মা টাকাকড়ি কী রেখে গিয়েছেন আমরা জানতাম না। আমাদের অভিভাবকের বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করার কথা, তাঁর আসার অপেক্ষায় দিন গুণছিলাম।

তিনি এলেন মার্চ মাসে।

ছায়ার মতো বাড়ির এদিক সেদিক ঘুরছি একদিন, কোন কাজ নেই, মনে নেই কোন বাসনা বা চিন্তা, হঠাৎ কাতিয়া বলে উঠল, 'বাঁচলাম বাবা! সের্গেই মিখাইলিচ এসেছেন। আমাদের খোঁজ করে পাঠিয়েছেন, ডিনারে আসতে চান। মাশা, গোমড়া ভাবটা ঝেড়ে ফেল তো। তোমাকে দেখলে কী ভাববেন উনি? তোমাদের সবাইকে এত স্নেহ করেন।'

সের্গেই মিখাইলিচ আমাদের নিকট প্রতিবেশী, বাবার চেয়ে বয়সে অনেক কম হলেও তাঁর বন্ধু ছিলেন উনি। ওঁর আসাতে খুশি হলাম, এবারে তাহলে আমাদের পরিকল্পনার অদলবদল ঘটবে, পারব গ্রাম ছেড়ে যেতে। তাছাড়া, ছেলেবেলা থেকে ওঁকে ভালোবাসতাম, ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সের্গেই মিখাইলিচ যদি আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করেন তাহলে সবচেয়ে খারাপ লাগবে আমার, সেটা ঠিক আঁচ করে কাতিয়া আমাকে সামলিয়ে উঠতে বলেছিল।

ওঁকে ভালো লাগত আমার, বাড়ির সবাই ওঁকে ভালোবাসত, কাতিয়া আর সনিয়া থেকে আরম্ভ করে সহিসগুলো পর্যন্ত। সনিয়া আবার ওঁর ধর্ম-মেয়ে। তাছাড়া, আমার সামনে মা একবার একটা কথা বলেছিলেন বলে আমার অন্তরে ওঁর জন্য বিশেষ একটি স্থান ছিল। মা বলেছিলেন তাঁর ইচ্ছে এমন ধরনের মানুষের সঙ্গে যেন আমার বিয়ে হয়। সে সময়ে কথাটা শুনে অবাক হয়েছিলাম, খারাপ লেগেছিল এমন কি; আমার আদর্শ নায়ক ছিল একেবারে অন্য ধরনের। আমার মনের মানুষ পাতলা ছিমছাম চেহারার, মুখ তার পাণ্ডুর বিষণ্ণ। আর সের্গেই মিখাইলিচ তখনি যৌবন পেরিয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘাকৃতি তিনি, শরীরের

গঠন ভারি, সর্বদাই হাসিখুশি মানুষ, অন্তত আমার তাই মনে হত। তবু মা'র কথাটা আমার মনে গেঁথে বসেছিল। ছ বছর আগে, আমার বয়স তখন এগারো, উনি আমাকে তুমি বলে ডাকতেন, আমার সঙ্গে খেলতেন, আমার নাম দিয়েছিলেন 'ছোট্ট ভায়োলেট', তখনি প্রায় আতঙ্কে মাঝে মাঝে নিজেকে শুধাতাম, হঠাৎ যদি উনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়ে বসেন তাহলে কী করব?

ডিনারের আগে এসে পেঁছিলেন সের্গেই মিখাইলিচ। ডিনারের অন্যান্য পদের সঙ্গে কাতিয়া যোগ করেছিল স্পিনাকের চাটনি আর ক্রীম-কেক। জানলা দিয়ে দেখলাম একটা ছোট শ্লেজে তিনি আসছেন, বাড়ির মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে বৈঠকখানায় পালিয়ে গেলাম; ভাবলাম ভান করব যেন মোটেই ওঁর অপেক্ষায় ছিলাম না। কিন্তু সামনের হলে ওঁর পায়ের ভারি শব্দ, ওঁর দরাজ গলা আর কাতিয়ার পদধ্বনি শোনা মাত্র নিজেকে সামলাতে পারলাম না, দৌড়ে গেলাম হলে। কাতিয়ার হাত ধরে তিনি দাঁড়িয়ে, চড়া সদয় গলায় কথা বলছেন আর হাসছেন। আমাকে দেখে কথা বন্ধ করলেন, প্রীতি-সম্ভাষণ না করে কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। অস্বস্তি লাগল, বুঝতে পারলাম লাল হয়ে উঠেছি।

'আরে! আপনি?' স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় সরল গলায় বলে হাত বাড়িয়ে এলেন আমার কাছে। 'কত বদলে গেছেন আপনি! কত বড়ো হয়ে গেছেন! আমার ভায়োলেট দেখছি এখন গোলাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

বড়ো হাতের মুঠোয় আমার ছোট হাত নিয়ে সজোরে চাপ দিলেন, তবু ব্যথা পেলাম না। মনে হল আমার হাতে চুমো খাবেন, ওঁর দিকে একটু ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছি, কিন্তু উনি শুধু আমার হাতে আর একবার চাপ দিয়ে ওঁর স্থির হাসি-ভরা চোখ রাখলেন আমার চোখে।

ছ বছর দেখিনি ওঁকে, অনেক বদলে গেছেন: বয়সের ছাপ বেড়েছে, রংটা আরো ময়লা, জুলপি রেখেছেন, সেটা একেবারে বেমানান। কিন্তু ওঁর সহজ সরল ধরনটা বদলায়নি, বদলায়নি ওঁর আন্তরিকতায় ভরা অকপট মুখ; মুখের ধাঁচটা প্রশস্ত, চোখদুটি উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত, হাসিটা স্নিগ্ধ, প্রায় শিশুর মতো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি আর অতিথি রইলেন না, আমাদের সবায়ের সঙ্গে, এমন কি চাকরবাকরের সঙ্গে বাড়ির লোকের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। ওঁকে দেখে চাকরবাকররা বিশেষ করে খুশি, সেটা বোঝা গেল ওঁকে খুশি করার জন্য ওদের চেষ্টা থেকে।

মা'র মৃত্যুর পর প্রতিবেশীরা এসে যে রকমটা করতেন, সে রকমটা মোটেই তিনি করলেন না। প্রতিবেশীরা ভাবতেন এখানে এসে আমাদের পাশে বসে কথাবার্তা না বলে কান্নাকাটি করা উচিত। উনি কিন্তু বেশ কথা চালিয়ে গেলেন, ভাবটা হাসিখুশি, মাতৃবিয়োগের কথা একবারও উল্লেখ করলেন না। ওঁর ঔদাসীন্যে প্রথম প্রথম অবাক লাগল আমার, এমন কি অশোভন মনে হল সেটা, পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু উনি। কিন্তু পরে বুঝলাম ওটা ঔদাসীন্য নয়, আন্তরিকতা, আর সে জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।

সন্ধ্যেবেলায় বৈঠকখানার পুরোনো জায়গায় বসে কাতিয়া চা ঢেলে দিল, ঠিক মায়ের আমলে যেমন। ওর পাশে বসলাম আমি আর সনিয়া। বাবার একটা পাইপ পেয়েছিল বুড়ো গ্রিগরি, ও সেটা সের্গেই মিখাইলিচকে এনে দিল। আগেকার দিনের মতো পাইপ টানতে টানতে তিনি ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটু থেমে বললেন, 'কত না দুঃখের জিনিস ঘটেছে বাড়িটায়!'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কাতিয়া। সামোভারে ঢাকনাটা চাপিয়ে তাকাল ওঁর দিকে, চোখে প্রায় জল এসে পড়ল।

'বাবাকে আপনার মনে আছে তো?' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সের্গেই মিখাইলিচ।

'সামান্য,' স্বীকার করলাম।

'এখন তিনি আপনাদের সঙ্গে থাকলে কী ভালোটাই না হত,' মৃদুকণ্ঠে বললেন তিনি; আমার মাথা পেরিয়ে গেল ওঁর চিন্তাকুল দৃষ্টি। গলা আরো নামিয়ে বললেন, 'আপনার বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসতাম।' মনে হল, ওঁর চোখদুটো আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'আর এখন ওর মা-ও স্বর্গে গিয়েছেন,' অস্ফুট কণ্ঠে বলে কাতিয়া চায়ের পাত্রের উপরে তাড়াতাড়ি ন্যাপকিন চাপা দিয়ে চোখের জল মোছার জন্য রুমাল বের করল।

'হ্যাঁ, অনেক দুঃখের জিনিস ঘটেছে বাড়িটায়,' মুখ ঘুরিয়ে তিনি আবার বললেন। যোগ করলেন, 'তোমার খেলনাগুলো দেখাও তো, সনিয়া,' তারপর ড্রয়িং-রুমে চলে গেলেন। জল-ভরা চোখে কাতিয়ার দিকে তাকালাম আমি।

'ওঁর মতো বন্ধু লোক আর হয় না!' বলল কাতিয়া।

আর সত্যি, আমাদের অনাত্মীয় এই ভালো লোকটির সহানুভূতিতে উষ্ণ ও প্রীতিকর একটা ভাব এল মনে।

কানে এল ড্রয়িং-রুমে সের্গেই মিখাইলিচ সনিয়ার সঙ্গে নেচে কুঁদে খেলছেন, সনিয়া গলা ফাটিয়ে হাসছে। ওঁর জন্য চা পাঠিয়ে দিলাম; তারপর শুনলাম উনি পিয়ানোতে বসে সনিয়ার ছোট্ট আঙুল দিয়ে চাবিতে টোকা দিচ্ছেন।

ডাক দিয়ে বললেন, 'মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আসুন তো, আমাদের জন্য একটা কিছু বাজান।'

ঘরোয়াভাবে, বন্ধুর মতো আমার সঙ্গে ব্যবহার করছেন, বেশ ভালো লাগল। ওঁর কাছে গেলাম।

বীঠোফেনের 'quasi una fantasia'* সোনাটার আডাজিও অংশটি খুলে বললেন, 'এই নিন, দেখি কেমন বাজান।' চায়ের গেলাস হাতে পিয়ানো ছেড়ে একটা কোণে চলে গেলেন।

কেন জানি মনে হল, ওঁকে 'না' বলা, খারাপ বাজাই ভণিতা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই কোন কথা না বলে ওঁর আদেশ মেনে নিয়ে সাধ্যমত বাজাতে শুরু করলাম; ওঁর বিচার শক্তিকে ডরাতাম, জানতাম উনি গানবাজনা বোঝেন আর ভালোবাসেন। চায়ের সময় আমাদের কথাবার্তায় যে পূর্বস্মৃতির মেজাজ এসেছিল, আডাজিওটি সে মেজাজের; আমার মনে হল ভালোই বাজিয়েছি। কিন্তু স্কার্‌ত্‌সোটি

* স্বপ্নলোকের সোনাটা।

শেষ করতে আমাকে দিলেন না উনি। 'না, এটা আপনি ভালো বাজাচ্ছেন না,' কাছে এসে বললেন। 'ওটা রেখে দিন; প্রথমটা মন্দ বাজাননি। গানবাজনা বোঝেন মনে হচ্ছে।' আহামরি প্রশংসা নয়, তবু খুশিতে লাল হয়ে উঠলাম। বাবার বন্ধু উনি, বাবার সমকক্ষ, আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমি বড়ো হয়ে গিয়েছি, আর ছেলেমানুষটি নেই, ব্যাপারটা আমার কাছে এত অভিনব আর এত প্রীতিকর! সনিয়াকে ঘুম পাড়াতে কাতিয়া দোতলায় গেল, ড্রয়িং-রুমে রইলাম উনি আর আমি।

বাবার কথা বলতে শুরু করলেন উনি — কীভাবে তাঁর সঙ্গে চেনাপরিচয় হয়েছিল; যখন আমি শুধু বই আর খেলনা নিয়ে ব্যস্ত সে সব পুরোনো দিনে কী চমৎকার থেকেছিলেন ওঁরা দুজনে, সেই সব কথা। ওঁর গল্প থেকে বাবার সম্বন্ধে এই প্রথম জানলাম যে, সহজ সরল মানুষ ছিলেন তিনি, লোকে তাঁকে ভালোবাসত, তাঁর সম্বন্ধে আগে এমন ভাবিনি কখনো। তারপর উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কী করে সময় কাটাতে আমি ভালোবাসি, কী বই পড়ি, কী করব ঠিক করেছি; উপদেশ দিলেন আমাকে। এখন আর তিনি সেই হাসিখুশি খেলার সাথী নন যিনি আমার পিছনে লাগতেন, খেলনা বানাতেন আমার জন্য; এখন তিনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, স্নেহপ্রবণ, স্পষ্টবক্তা। আপনা থেকেই ওঁকে আমার ভালো লাগল, ভক্তিশ্রদ্ধা বোধ করলাম ওঁর প্রতি। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগছিল, কিন্তু তবু একটা ক্লেশ ও ভীরু ভাবের হাত কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। মেপে মেপে প্রত্যেকটি কথা সাবধানে বললাম, ওঁর স্নেহ পাবার জন্য এত ব্যাকুল ছিলাম। এতদিন তো বন্ধুর মেয়ে বলে শুধু আমাকে উনি স্নেহের চোখে দেখেছেন।

সনিয়াকে শুইয়ে কাতিয়া ফিরে এল। আমার মন-মরা ভাবের কথা তুলে নালিশ করল ওঁর কাছে; ওটার বিষয়ে আমি কিছুই বলিনি।

'তাহলে সবচেয়ে বড়ো কথাটা ও আমার কাছে চেপে গিয়েছে,' হেসে, ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন সের্গেই মিখাইলিচ।

'বলার কী আর আছে?' উত্তর দিলাম। 'ব্যাপারটা অত্যন্ত বিরক্তিকর, কেটে যাবে শীগগিরই।' (সে মুহূর্তে সত্যি মনে হল আমার বিষণ্ণতা শুধু যে কেটে যাবে তা নয়, কেটে গিয়েছে এরি মধ্যে, আর তার অস্তিত্ব ছিল না কখনো।)

'নিঃসঙ্গতা সইতে না পারাটা খারাপ,' উনি বললেন। 'আপনি কি সত্যি সত্যি মিসি বাবা?'

'তা নয়ত আর কী,' হেসে বললাম।

'না, মিসি বাবা ভালো নয়। সবায়ের তারিফ পাবার জন্যে ব্যাকুল, আর একলা থাকলেই শুকিয়ে যায় একেবারে, জীবনের স্বাদ আর থাকে না। সবকিছু লোক দেখানোর জন্যে, নিজের জন্যে কিছু না।'

'আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটি তো বেশ,' বললাম, কিছু একটা বলতে হবে বলে।

'না,' বলে উঠলেন উনি, তারপর একটু থেমে বললেন, 'বাপের মেয়ে তো মিছিমিছি নন, আপনার মধ্যে কিছু একটা আছে।' আর ওঁর সদয় মনোযোগী দৃষ্টিতে গর্ব হল, বিব্রত খুশির ভাবে আবার মনটা ভরে গেল।

শুধু তখনি লক্ষ্য করলাম ওঁর মুখে হাসিখুশির ছাপের নিচে একটা কিছু আছে যেটা শুধু বিশেষ করে ওঁর; দৃষ্টিটা প্রথমে স্বচ্ছ, কিন্তু ক্রমশ তাতে আসে একটা অবহিত ভাব, এমন কি একটু বিষণ্ণতাও।

'একঘেয়ে লাগার কোন ছুতো নেই, ওটা আপনাকে এড়াতেই হবে,' উনি বললেন। 'গানবাজনা আপনার ভালো লাগে, তাছাড়া বই আর পড়াশুনো আছে। সামনে পড়ে রয়েছে সমস্ত জীবন, তার জন্য তৈরী হবার সময় এখনি, তাহলে পরে আর অনুশোচনা করতে হবে না। বছরখানেক পরে বড্ডো দেরী হয়ে যাবে।'

বাপ-খুড়োর মতো উনি আমার সঙ্গে কথা চালালেন। মনে হল আমার পর্যায়ে নিজেকে রাখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। আমাকে নিজের চেয়ে নিচু স্তরের ভাবছেন বলে রাগ হল, তবু শুধু আমারি খাতিরে আলাদাভাবে কথা বলার চেষ্টা করছেন তো, সেটা ভালো লাগল।

বাকি সন্ধ্যাটা কাতিয়ার সঙ্গে জমিদারীর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি।

'আসি তাহলে,' দাঁড়িয়ে উঠে বললেন। আমার কাছে এসে হাত ধরলেন।

'আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?' কাতিয়া জিজ্ঞেস করল।

'বসন্তকালে,' বললেন তিনি, আমার হাত তখনো ছাড়েননি।

'এখন যাচ্ছি দানিলভ্‌কাতে' (আমাদের অন্য গ্রাম), 'ওখানকার ব্যাপার কী দেখবো, বন্দোবস্ত যা করার করবো, তারপর নিজের কাজে যাবো মস্কোয়। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেখাশোনা হবে।'

'এত দিনের জন্যে যাচ্ছেন কেন?' অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে বললাম। আশা ছিল রোজ দেখা হবে ওঁর সঙ্গে; খারাপ লাগল, ভয় হল যে বিষণ্ণতা আবার আমাকে পেয়ে বসবে। আমার চাউনি আর গলার স্বর থেকে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল নিশ্চয়ই।

'পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকবেন, মন-মরা হতে দেবেন না নিজেকে, বুঝলেন।' গলাটা অত্যন্ত ভাবলেশহীন, সাধারণ। 'বসন্তকালে আপনার পরীক্ষা নেবো,' আরো বললেন উনি, তারপর আমার দিকে না তাকিয়ে হাতটা ছেড়ে দিলেন।

সদর ঘরে ওঁকে বিদায় জানাচ্ছি, উনি তাড়াহুড়ো করে কোটটা চাপিয়ে নিলেন, আমার দিকে একবার চাইলেন না পর্যন্ত। "অত চেষ্টার কী দরকার ওঁর?" ভাবলাম। "উনি তাকালে আনন্দে গলে যাবো, সত্যি কি তাই ভাবেন? লোক ভালো উনি, খুব ভালো লোক... ব্যস এই পর্যন্ত।"

তবু সে রাত্রে কাতিয়ার আর আমার চোখে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। দুজনের গল্প চলল, ওঁর বিষয়ে নয়, কী করে গ্রীষ্ম আর পরের শীতটা কাটাবো তাই নিয়ে। ভয়াবহ সেই প্রশ্ন, 'কেন?' আর আমাকে ভোগাল না। মনে হল এটা তো সহজ স্পষ্ট কথা যে, সুখী হবার জন্য বাঁচা দরকার। আর মনে মনে আশা হল ভবিষ্যতে অসীম সুখী হবো আমি। পক্রভস্কয়েতে আমাদের পুরোনো নিরানন্দ বাড়িটা হঠাৎ আলোয় আর প্রাণে ভরে গেল যেন।

২

বসন্তকাল এল। আমার পুরোনো বিষণ্ণতার জায়গা নিল নিরুদ্দেশ আশা আর আকাঙ্ক্ষার জট-পাকানো স্বপ্নালু বিষণ্ণতা, যেটা বসন্তকালের সঙ্গী। শীতের শুরুতে যেমনভাবে থাকতাম তেমনভাবে আর রইলাম না; সনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত, গানবাজনা আর পড়াশুনো নিয়ে সময় কাটে। মাঝে মাঝে বাগানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে ঘুরে বেড়াই, কিম্বা বেঞ্চে বসে ভাবি আর ভাবি। কী যে চাই, কিসের আশায় আছি, ভগবান জানেন শুধু। মাঝে মাঝে সমস্ত রাত, বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাত, জানলার ধারে কাটে। কখনো কখনো কাতিয়ার অজানতে, গায়ে কোট না চাপিয়ে বাগানে গোপনে চলে যাই, শিশিরে-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাই পুকুর পারে; একবার বাইরের মাঠে গিয়ে একলা নিশীথ রাতে বাগানের চারপাশে ঘুরে এলাম।

কী সব স্বপ্ন সে সব দিনে আমার কল্পনা ভরে রাখত এখন তা মনে করা বা বুঝে ওঠা কঠিন। আর যখন সত্যি সত্যি সেগুলোকে মনে করি তখন আমার নিজের বলে বিশ্বাস হয় না, এত অদ্ভুত তারা, জীবন থেকে এত দূরে।

মে-র শেষে কথামত সফর থেকে ফিরে এলেন সের্গেই মিখাইলিচ। প্রথম যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন সন্ধ্যে, মোটেই আশা করিনি তিনি আসছেন। বারান্দায় বসে চা খাবার উপক্রম করছি। বাগানে ইতিমধ্যে সবুজের বাহার, আ-ছাঁটা ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছে নাইটিংগেলগুলো, অর্ধেক গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটাবে ওরা। এখানে সেখানে লাইলাকের ঘন ঝোপে লালচে-বেগুনী বা শাদা শাদা ছোপ। কুঁড়ি ফোটার আয়োজন সম্পূর্ণ। পথে সারি বাঁধা বার্চের পাতা সন্ধ্যালোকে স্বচ্ছ। ঢাকা বারান্দায় একটা তাজা ঠাণ্ডা ভাব। সন্ধ্যার ভারি শিশিরবিন্দু ঘাসে জমার কথা। বাগানের ওপারের আঙিনা থেকে আসছে দিনশেষের নানা শব্দ, ঘরে-তাড়ানো গরুমোষের ডাক। জলের পিপে নিয়ে বাড়ির সামনের পথে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে পাগলা নিকন। ডালিয়ায় জল দিচ্ছে সে, গুঁড়ি আর খুঁটির চারধারে খোঁড়া মাটিতে কালো কালো বৃত্ত ফুটে উঠেছে জলের পিপে থেকে পড়া ঠাণ্ডা ধারায়।

বারান্দায় বসে আছি, টেবিলে পাতা ধবধবে চাদর। সদ্য পালিশ-করা সামোভারটা ঝকঝক করছে, বাষ্প বেরোচ্ছে মুখ থেকে। টেবিলে রেকাবী ভর্তি ক্রেন্দেলকি*, বিস্কুট, একজগ ক্রীম। গোলগাল হাতে ভালো করে কাপ ধুচ্ছে কাতিয়া। স্নানের পর বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে আমার, চায়ের অপেক্ষা না করে ঘন ক্রীমে ভিজিয়ে রুটি খেতে শুরু করেছি। কোড়া লিনেনের খোলা-হাতা ব্লাউজ গায়ে, ভিজে চুল রুমাল দিয়ে বাঁধা। সের্গেই মিখাইলিচকে প্রথমে দেখতে পেল কাতিয়া।

বলে উঠল, 'সের্গেই মিখাইলিচ! এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল।'

জামাকাপড় বদলাবার জন্য উঠে পড়েছি, কিন্তু দোরগোড়ায় আমাকে আটকালেন উনি।

'পাড়াগাঁয়ে আবার এত ভদ্রতার কী দরকার?' রুমালে বাঁধা আমার মাথার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন উনি। 'বুড়ো গ্রিগরির কাছে এ ভাবে বেরোতে তো আপনার লজ্জা করে না, আর আপনার কাছে ও যা আমিও তাই।'

কিন্তু মনে হল গ্রিগরির মতো নয়, সম্পূর্ণ অন্যভাবে উনি দেখছেন আমাকে; লজ্জা পেলাম।

'এক্ষুণি আসছি,' চলে যেতে যেতে বললাম।

পিছন ডেকে উনি বললেন, 'ব্লাউজটা কী দোষ করল? ওটা পরে একেবারে কিষাণ কন্যার মতো দেখাচ্ছে।'

দোতলায় জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে ভাবলাম, "কী অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন উনি। যাক, উনি এসেছেন, বাঁচা গেল, বেশ মজা হবে এখন।" আয়নায় চেহারাটা একবার দেখে নিয়ে খুশিতে তড়তড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলাম, নিজের তাড়াটা লুকোবার চেষ্টা করলাম না, বারান্দায় যখন পৌঁছলাম তখন হাঁফ ধরে গিয়েছে। টেবিলের পাশে বসে উনি কাতিয়াকে জমিদারীর কথা বলছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে একবার হেসে কথা বলে চললেন। ওঁর মতে, আমাদের জমিদারীর অবস্থা চমৎকার। শুধু এই গ্রীষ্মকালটা আমাদের

---

* আটার তৈরী মিষ্টি।

কাটাতে হবে গ্রামে; তারপর সনিয়ার লেখাপড়ার জন্য পিটার্সবুর্গে বা বিদেশে যাবার কথা।

'আপনি আমাদের সঙ্গে বিদেশে এলে চমৎকার হয়!' কাতিয়া বলল। 'আপনাকে ছাড়া একেবারে অসহায় লাগবে।'

'আপনাদের সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘুরলে বেড়ে হত,' উনি বললেন আধো-ঠাট্টা, আধো-গম্ভীর সুরে।

'তাহলে চলুন সারা পৃথিবী একসাথে চক্কর দিই,' আমি বললাম।

হেসে মাথা নাড়লেন উনি।

'আর আমার মা'র কী হবে? আমার নিজের কাজকর্ম?' জিজ্ঞেস করলেন।

'যাক, ওটা অপ্রাসঙ্গিক — এবার বলুন তো কেমন ছিলেন। আশা করি আবার মন-মরা হয়ে পড়েননি?'

বললাম উনি চলে যাবার পর থেকে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলাম, বিষণ্ন ভাব আর ছিল না; আমার সায় দিল কাতিয়া। উনি তখন প্রশংসা করলেন আমাকে, কথা আর চোখ দিয়ে শিশুর মতো আদর করলেন, যেন তেমনটা করার বিশেষ অধিকার আছে ওঁর। আর মনে হল ওঁর সঙ্গে একেবারে অকপট আন্তরিকভাবে চলা উচিত আমার, ভালো যা করেছি সব বলতে হবে ওঁকে, খারাপ লাগবে এমন কিছু যদি করে থাকি তা ঢাকলে চলবে না, স্বীকার করতে হবে। উনি যেন আমার পাদ্রিমশাই।

সন্ধ্যেটা সুন্দর, চায়ের জিনিসপত্র সরিয়ে নেবার পরও আমরা বারান্দায় বসে রইলাম। কথাবার্তায় মন বসে গিয়েছিল, কখন যে বাড়ি আর বাইরে মানুষের সব শব্দ আস্তে আস্তে থেমে গেল লক্ষ্য করিনি। ফুলের গন্ধ আরো জোরালো হয়ে উঠল, ঘাস শিশিরে ভেজা। কাছের লাইলাক ঝোপে একটা নাইটিংগেল সুর ভাঁজতে শুরু করে, আমাদের গলা শুনে থেমে গেল। মনে হল নক্ষত্র খচিত আকাশ আমাদের কাছে নেমে এসেছে।

নিঃশব্দে একটা বাদুড় বারান্দায় উড়ে এসে আমার মাথায় বাঁধা শাদা রুমালটার ওপর ঝটপট করাতে তখনি শুধু বুঝতে পারলাম অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। দেয়ালের গায়ে শিঁটিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম

আর একটু হলে, কিন্তু বাদুড়টা এসেছিল যেমন, ঠিক তেমনি নিঃশব্দে, ক্ষিপ্রগতিতে ফলের বাগানের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কথাবার্তার ফাঁকে সেগেই মিখাইলিচ বলে উঠলেন, 'আপনাদের পক্রভস্কয়ে আমার এত ভালো লাগে! সারা জীবনটা যদি এই বারান্দায় বসে কাটত!'

'তাহলে বসে থাকুন,' বলল কাতিয়া।

'বসলে ভালো হয়,' অনুচ্চকণ্ঠে বললেন উনি। 'কিন্তু জীবন তো আর বসে থাকে না।'

'বিয়ে করেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল কাতিয়া। 'স্বামী হিসেবে আপনি তো খাসা হবেন।'

হেসে বললেন উনি, 'করি না, বসে থাকতে চাই বলে। না, কাতেরিনা কার্‌লভনা, আপনার আর আমার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে। পাত্র হিসেবে আমাকে লোকে দেখে না অনেক দিন। আমিও মোটে দেখি না, আর তাই খাসা আছি, সত্যি বলছি।'

আমার মনে হল কথাটা বললেন অস্বাভাবিক জোর দিয়ে।

'তা আর নয়!' বলল কাতিয়া। 'বয়স তো মাত্র ছত্রিশ, এরি মধ্যে জীবন শেষ!'

'সব শেষ,' সায় দিয়ে উনি বললেন। 'আমি শুধু বসে থাকতে চাই, কিন্তু বিয়ে করতে হলে আরো কিছু করা দরকার। বরং ওকে জিজ্ঞেস করুন,' আমার দিকে মাথা নেড়ে যোগ করলেন। 'ওর মতো লোকের বিয়ে করা উচিত, আর আপনি আর আমি, ওদের বিয়ে দেখে আমাদের আনন্দ।'

ওঁর গলায় বিষণ্নতা ও ক্লেশের একটা সুর ধরা পড়ল আমার কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন উনি; কাতিয়া আর আমিও কোন কথা বললাম না।

'আচ্ছা, ধরুন,' চেয়ারে ঘুরে বসে উনি বলে চললেন, 'একটি সপ্তদশীকে না হয় হঠাৎ বিয়ে করে ফেললাম ঘটনার ফেরে, যেমন মাশাকে — মানে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে। দৃষ্টান্তটা চমৎকার। এভাবে কথাটা উঠেছে বলে আমি বেজায় খুশি ... এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত আর হতে পারে না।'

হাসতে শুরু করলাম আমি; কেন যে উনি খুশি, 'এভাবে উঠেছে' সেটা কী আমার মাথায় ঢুকল না ...

'আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে সত্যি বলুন তো,' পরিহাস করে উনি বললেন, 'দিনকাল গিয়েছে এমন একটা বুড়োর সঙ্গে বাঁধা পড়লে আপনার খারাপ লাগবে না? সে শুধু বসে থাকতে চায়, অথচ আপনার মনে কত না ব্যাকুলতা, কত না ইচ্ছা।'

বিব্রত লাগল; কী বলব ভেবে না পাওয়াতে চুপ করে রইলাম।

হেসে উনি বললেন, 'অবশ্য বিয়ের প্রস্তাব করছি না আপনাকে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় একলা বাগানে ঘোরার সময় যে ধরনের বরের স্বপ্ন দেখেন আমি তো তা নই, সত্যি না? আর সেটা দুর্ভাগ্য হবে, তাই না?'

'দুর্ভাগ্য নয়...' আমি শুরু করলাম।

'কিন্তু সুখেরও নয়,' কথাটা উনি সম্পূর্ণ করলেন।

'না, কিন্তু হয়ত আমাকে ভুল ...'

বাধা দিয়ে উনি আবার বললেন, 'তাহলে দেখলেন তো। ঠিক কথা বলেছে ও, স্পষ্ট বলার জন্যে আর আজকের কথাবার্তার জন্যে ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার পক্ষেও ব্যাপারটা বেজায় করুণ হত,' যোগ করলেন উনি।

'অদ্ভুত মানুষ আপনি — ঠিক আগেকার মতো,' বলল কাতিয়া। রাত্রের খাবার দিতে বলার জন্য বাড়ির ভিতরে গেল।

কাতিয়া যাবার পর আমরা দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম; চারিদিক নিঃশব্দ। গাইতে শুরু করল একটি নাইটিংগেল, আবেগ-ভরা থামা-থামা পুরবী নয় এবার, রাত্রির গান, প্রশান্ত, কোন তাড়াহুড়ো নেই। সমস্ত বাগান ভরে গেল সে গানে, খাদ থেকে জবাব দিল আর একটি নাইটিংগেল — সে সন্ধ্যায় খাদে প্রথম গান ধরেছিল সে-ই। বাগানের পাখিটা যেন শোনার জন্য মুহূর্তকাল চুপ করল, তারপর আরো জোরে, আরো তীব্রভাবে গান ধরল। নৈশ পৃথিবী তাদের গানের প্রশান্ত মহিমায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, সে পৃথিবীকে আমরা কতটুকু চিনি।

আমাদের পেরিয়ে ফুলের ঘরে শুতে চলে গেল মালী, পথে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল তার ভারি বুটের শব্দ। পাহাড়ের তলা থেকে তীক্ষ্ণ

শিস শোনা গেল দ্বার, তারপর সব চুপচাপ। পাতাগুলোর সামান্য খসখস শব্দ, আমাদের ওপর ফেটে পড়ল গন্ধে-ভরা এক ঝলক হাওয়া, নড়ে উঠল বারান্দার চাঁদোয়াটা।

যা কথা হয়েছে তারপর চুপ করে থাকা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর, কিন্তু কী বলব ভেবে পেলাম না। ওঁর দিকে তাকালাম — অস্পষ্ট আলোয় দীপ্ত চোখে উনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

'বেঁচে থাকাটা চমৎকার জিনিস,' মৃদুকণ্ঠে উনি বললেন।

কী কারণে জানি না আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'কী?' উনি বললেন।

'হ্যাঁ, বেঁচে থাকাটা চমৎকার জিনিস,' কথাটার পুনরুক্তি করলাম।

দুজনে চুপ করে গেলাম, আবার অস্বস্তি লাগল আমার। মনে হল ওঁর বয়স হয়েছে সে কথায় সায় দিয়ে ব্যথা দিয়েছি ওঁকে। সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, কিন্তু কী করে ভেবে পেলাম না।

'আচ্ছা, তাহলে আসি,' উঠতে উঠতে উনি বললেন। 'রাত্তিরে বাড়িতে খাবো বলে মা বসে আছেন। ওঁর সঙ্গে বলতে গেলে আজ দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম নতুন সোনাটাটা আপনাকে শোনাবো,' আমি বললাম।

'আর একদিন হবে,' জবাবটা নিরাসক্ত শোনাল। 'আসি তাহলে।'

এবার কোন সন্দেহ রইল না উনি চটেছেন, খারাপ লাগল। ওঁর সঙ্গে কাতিয়া আর আমি গাড়িবারান্দা পর্যন্ত গেলাম, পথে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন উনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে বারান্দায় ফিরে চেয়ে রইলাম বাগানের দিকে, রাত্রির শব্দ-ভরা জোলো শাদা কুয়াশার দিকে। অনেকক্ষণ বসে বসে স্বপ্ন দেখলাম, আর স্বপ্নটা মনে হল সত্যি। যা দেখতে চাই, যা শুনতে চাই দেখলাম আর শুনলাম।

সেগেই মিখাইলিচ আবার এলেন, তারপর আবার, আর আমাদের বিচিত্র আলোচনার ফলে যে অস্বস্তির ভাবটা হয়েছিল সেটা কেটে গেল একেবারে। সারা গ্রীষ্মকালটা সপ্তাহে দু তিন বার উনি আমাদের কাছে

আসতেন। ওঁর আসায় এত অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে কিছুদিন না এলে ভয়ানক খারাপ লাগত। ভাবতাম আমাকে ত্যাগ করেছেন, দুর্ব্যবহার করছেন, খুব রাগ হত। কমবয়সী প্রিয় বন্ধু যেন আমি, এভাবে আমার সঙ্গে চলতেন উনি। নানা কথা জিজ্ঞেস করতেন আমাকে, তাঁর আন্তরিকতার জন্য গোপন কথা বলতাম তাঁকে, উনি উপদেশ দিতেন, উৎসাহ দিতেন, মাঝে মাঝে বকে আমার অনুচিত ঝোঁক শোধরাতেন। আমি ওঁর সমান, এইভাবে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন বটে উনি, কিন্তু ওঁকে যতটা জানি তার পিছনে আমার অচেনা একটি সম্পূর্ণ জগৎ ওঁর আছে মনে হত — সে জগতে আমার প্রবেশের দরকার নেই তিনি ভাবতেন। ওঁর এই ভাবটাই সবচেয়ে বেশী করে আমাকে টানত, এরি জন্য শ্রদ্ধা করতাম ওঁকে। কাতিয়া ও প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছিলাম যে বুড়ী মার সেবাযত্ন, নিজের জমিদারীর দেখাশোনা, আর আমাদের অভিভাবকত্ব করা ছাড়াও ওঁর সামাজিক কাজকর্ম কী যেন ছিল, সেটা ওঁকে বেশ ভোগাত। তবু এ সবের বিষয়ে উনি কী ভাবেন, ওঁর ধ্যানধারণা, পরিকল্পনা বা আশা আনন্দ কী কখনো বের করতে পারিনি ওঁর কাছ থেকে। ওঁর কাজকর্মের সম্বন্ধে কথা তুললেই উনি নিজস্ব একটি ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকাতেন, মনে হত বলছেন, "থাক, থাক, ও সব নিয়ে আপনার আবার মাথাব্যথা কেন?" আর তৎক্ষণাৎ কথা ঘুরিয়ে নিতেন। প্রথম প্রথম চটতাম বটে কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার নিজের বিষয় নিয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনায় এত অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে সেটা স্বাভাবিক বলে ধরে নিলাম।

আর একটা জিনিস প্রথম প্রথম আমার খারাপ লাগত, পরে সেটা অবশ্য ভালো লাগল। সেটা হল আমার চেহারার বিষয়ে ওঁর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, এমন কি বাহ্য অবজ্ঞার ভাব। আমার চেহারা যে ভালো, সেটার আভাস পর্যন্ত কথায় বা ইঙ্গিতে কখনো উনি দিতেন না, বরং ওঁর সামনে কেউ আমাকে সুন্দর বললে নাক কুঁচকিয়ে হেসে উঠতেন। এমন কি আমার চেহারার খুঁত বের করে তা নিয়ে পেছনে লাগতেন। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে কায়দাদুরস্ত ফ্রকে আমাকে সাজিয়ে আনন্দ পেত কাতিয়া, নতুন নতুন কায়দায় চুল বেঁধে দিত, সে সব

হত ওঁর উপহাসের বস্তু। এতে ব্যথা পেত কাতিয়া বেচারী, গোড়াতে ভয়ানক বিব্রত লাগত আমার। আমাকে ওঁর পছন্দ ধরে নিয়েছিল কাতিয়া, ও কিছুতেই বুঝতে পারত না ভালোবাসার পাত্রীকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে না দেখতে চাওয়াটা কী করে সম্ভব। আর আমি — উনি কী চান বেশীদিন যেতে না যেতে বুঝে ফেললাম — উনি বিশ্বাস করতে চান যে আমি মন-ভোলানো গোছের মেয়ে নই। বুঝলাম সেটা, আর অল্পদিনের মধ্যে আমার জামাকাপড়ে, চুল বাঁধার ধরনে, আমার আচরণে মন-ভোলানোর ছিটেফোঁটা পর্যন্ত রইল না। তার বদলে এল সারল্যের একটা বাহ্য মন-ভোলানো ভাব, কেননা তখন পর্যন্ত সত্যি সরল হওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। জানতাম উনি ভালোবাসেন আমাকে, কিশোরী হিসেবে না নারী হিসেবে, সেটা তখনো শুধাইনি নিজেকে, তবু সে ভালোবাসার কদর করতাম। দুনিয়ার সেরা মেয়ে বলে আমাকে ভাবেন জানতাম, আর এ মিথ্যে ধারণা তাঁর থেকে যাক, এ ইচ্ছা না করে পারিনি। তাই আপনা থেকেই তাঁকে ঠকাতাম। কিন্তু ওঁকে ঠকাতে গিয়ে নিজের উন্নতি হল। অনুভব করলাম দেহের নয়, মনের সৌন্দর্য ওঁকে দেখানো আরো অনেক ভালো, অনেক বেশী যোগ্য কাজ। আমার কেশ, আমার মুখ, বাহু, আমার ধরণধারণ ভালো হোক মন্দ হোক, সে সব তো উনি জানেন, একবার তাকালেই বুঝতে পারেন — এত ভালোভাবে পারেন যে ওঁর তারিফ বাড়ানোর জন্য আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই, ঠকাবার ইচ্ছেটা ছাড়া। আমার অন্তরও ওঁর কাছে অজানা, আমাকে ভালোবাসেন বলে, অন্তরের বিকাশ ও বৃদ্ধি তখনো ঘটছে বলে, এ ক্ষেত্রে ঠকাতে পারি ওঁকে, ঠকাতামও। এটা বুঝতে পেরে ওঁর সাহচর্যে থাকাটা কত সহজ হয়ে এল! আমার অকারণ বিব্রত ভাব, আমার কষ্টকৃত ধরণধারণ উধাও হয়ে গেল একেবারে। বুঝলাম, যে ভাবেই উনি আমাকে দেখুন না কেন সবটাই দেখেন, সামনে হোক বা পাশ থেকে হোক, সে আমি দাঁড়িয়ে থাকি বা বসে থাকি, চুলটা উঁচু করে বাঁধা হোক বা নিচু করে, সবটা দেখেন উনি, আর আমি যা তাই নিয়ে উনি সন্তুষ্ট। মনে হয়, নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে যদি উনি অন্যদের মতো হঠাৎ বলে বসতেন যে আমার মুখটা বেশ মিষ্টি, তাহলে

মোটেই খুশি হতাম না। কিন্তু কী খুশি আর হালকা লাগত যখন আমার কোন মন্তব্যের পর এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সহৃদয় গলায়, একটু পরিহাসের আমেজ তাতে লাগাবার চেষ্টা করে উনি বলতেন:

'সত্যি, আপনার মধ্যে একটা কিছু আছে। চমৎকার মেয়ে আপনি, না বলে পারছি না।'

গর্বে আর আনন্দে হৃদয় যেত ভরে। প্রশংসার উপলক্ষটা কী? হয়ত আমি বলেছি বুড়ো গ্রিগরি নাতনীকে ভয়ানক ভালোবাসে, সেটা আমার মনকে নাড়া দেয়; কিম্বা হয়ত কোন কবিতা বা উপন্যাস পড়ে আবেগে কেঁদে ফেলেছি; কিম্বা শুলহফের চেয়ে মোৎসার্টকে আমার বেশী পছন্দ। যা কিছু ভালো, যা কিছু ভালোবাসার যোগ্য তা আঁচ করে নেবার তখনকার ক্ষমতাটা অসাধারণ মনে হত; অবশ্য কী ভালো, কী বা ভালোবাসার যোগ্য, সে বিষয়ে সত্যি ছিটেফোঁটা জ্ঞান ছিল না আমার।

আমার আগেকার নানা রুচি ও অভ্যেসের বেশীর ভাগ অপছন্দ ছিল সের্গেই মিখাইলিচের। কিছু একটা বলতে যাচ্ছি, ওঁর চাউনিতে বা ভ্রূভঙ্গিতে টের পেতাম সেটা তিনি পছন্দ করেন না, ওঁর মুখে আসত সেই একটা বিষণ্ণ ও অল্প অবজ্ঞার ভাব, ব্যস, তাই যথেষ্ট, আমি ভেবে নিতাম কথাটা সত্যি আমার ভালো লাগে না, যদিও বরাবর সেটা ভালো লেগে এসেছে। মাঝে মাঝে উনি উপদেশ দিতে যাচ্ছেন, কী বলতে চান আঁচ করে ফেলেছি মনে হত। আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলেন হয়ত, কী চান উনি বুঝে ফেলতাম ওঁর দৃষ্টি থেকে। সে সব সময়ে আমার সব ধারণা, আমার সব অনুভূতি আমার নিজের ছিল না, ওঁর ধারণা, ওঁর অনুভূতিই হঠাৎ আমার হয়ে যেত, আমার জীবনে প্রবেশ করে আলোয় আলো করে দিত। নিজের অজ্ঞাতসারে সবকিছুকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করলাম, কাতিয়াকে, চাকরবাকরদের, সোনিয়াকে, নিজেকে, নিজের কাজকর্মকে। আগে বই পড়তাম একঘেয়েমি কাটাবার জন্য, এখন বই হয়ে দাঁড়াল আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দের একটা উৎস, আর সেটা হল এই জন্য যে, উনি আর আমি এক সঙ্গে পড়তাম, আলোচনা করতাম, নতুন নতুন বই উনি এনে দিতেন আমাকে।

আগে সনিয়াকে দেখাশোনা, ওকে পড়ানো বেশ কঠিন মনে হত, শুধু কর্তব্য বোধের তাগিদে জোর করে করতাম। পড়ানোর সময়ে উনি উপস্থিত ছিলেন, তারপর থেকে সনিয়ার উন্নতিতে আমার খুশি লাগতে শুরু করল। এর আগে একটা গোটা রচনা পিয়ানোয় রপ্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হত, কিন্তু এখন উনি শুনবেন, হয়ত তারিফ করবেন, এই ভেবে একই গৎ বার বার বাজাতাম। বেচারী কাতিয়াকে কানে তুলো গুঁজে রাখতে হত অবশ্য, কিন্তু আমার একঘেয়ে লাগত না। পুরোনো সোনাটাগুলোয় একেবারে আলাদা সুর লেগেছে মনে হত — অনেক ভালোভাবে বাজত তারা। যে কাতিয়াকে নিজের মতো করে জানতাম, ভালোবাসতাম, সে পর্যন্ত আমার চোখে আলাদাভাবে ধরা পড়ল। এখনি শুধু হৃদয়ঙ্গম হল যে একাধারে আমাদের মা, বান্ধবী ও দাসী হবার কোন বাধ্যবাধকতা ওর নেই। বুঝতে পারলাম এই মধুর মানুষটি কত নিঃস্বার্থ, অনুগত ও স্নেহশীলা — বুঝতে পারলাম ওর কাছে কতটা ঋণী আমি আর আরো বেশী করে ভালোবাসতে লাগলাম ওকে। আমাদের চাষীদের, বাড়ির ঝিচাকরদের, একেবারে অন্যভাবে দেখতে শেখালেন সের্গেই মিখাইলিচ। শুনলে হাসি পাবে হয়ত, সতেরো বছর পর্যন্ত যাদের সঙ্গে থেকেছি তারা ছিল আমার কাছে অচেনা, অদেখা মানুষরা আরো বেশী চেনা ছিল ওদের তুলনায়। কখনো ভাবিনি যে ওদেরো অনুরাগ আছে আমারি মতো, আছে বাসনা আর ব্যথা। এতদিন চেনা আমাদের বাগান, কুঞ্জ আর মাঠঘাট হঠাৎ আমার কাছে নতুন আর সুন্দর হয়ে উঠল। সের্গেই মিখাইলিচ ঠিকই বলেছিলেন, জীবনে সত্যিকারের আনন্দ মাত্র একটি -- অপরের জন্য বাঁচা। কথাটা তখন বিচিত্র ঠেকেছিল, মাথায় ঢোকেনি; কিন্তু ধারণাটি অজানতে দানা বাঁধতে শুরু করল আমার হৃদয়ে। আমার জীবনযাত্রায় কিছু অদলবদল না করে, কোন কিছুতে শুধু নিজের ছাপ ছাড়া অন্য কিছু যোগ না করে চারিদিকে একটি আনন্দময় জগত খুলে ধরলেন তিনি। শৈশব থেকে সে জগতের সর্বকিছু আমাকে ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু মুখ খোলেনি কখনো; উনি এলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা মুখর

হয়ে উঠল, চাইল আমার অন্তরে প্রবেশ করতে, আনন্দে ভরপুর করে দিতে।

সেবারের গ্রীষ্মে প্রায়ই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তাম। বসন্তের সেই সব পুরোনো আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা ও ভবিষ্যতের আশার বদলে আমাকে ভরিয়ে দিত বর্তমান সুখের একটা উত্তেজনা। ঘুম আসত না চোখে, কাতিয়ার বিছানায় উঠে গিয়ে বলতাম আমার সুখের সীমা নেই। এখন সে কথা ভাবলে মনে হয় ওটা না বললেও চলত, ও নিজে জানত আমি কত সুখী। আর ও বলত, ও যা চায় তাই পেয়েছে, নিজে অত্যন্ত সুখী ও, চুমো খেত আমাকে। বিশ্বাস করতাম ওকে; মনে হত সবাই সুখী হবে সেটা তো স্বাভাবিক, সে রকমটা হওয়াই তো উচিত। কিন্তু আরো একটা জিনিস দরকার ছিল কাতিয়ার — ঘুমের। মাঝে মাঝে ও এমন কি রাগের ভান করে, বিছানা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আর আমি যে সব জিনিস সুখী করেছে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে তা নিয়ে ভাবতাম। মাঝে মাঝে উঠে বসে দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করতাম... নিজের ভাষায় প্রার্থনা চলত, অসীম সুখী আমি, সেজন্য ধন্যবাদ জানাতাম ভগবানকে।

ছোট্ট ঘরটা নিঃশব্দ, শুধু কাতিয়ার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের টানা শব্দ, আর ওর পাশের ঘড়িটার টিক টিক। এপাশ ওপাশ করতাম, ফিসফিস করে প্রার্থনা মন্ত্র চলত, বুকে ক্রুশচিহ্ন করতাম, গলার ক্রুশে চুমো খেতাম। দরজা বন্ধ, জানলাগুলোর খড়খড়ি টানা, একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে একটা মাছি না মশা গুন গুন করছে। আর মনে হত ঘর ছেড়ে বাইরে যাবো না কখনো, ভোর যেন কখনো না হয়, আমাকে ঘেরা মনোময় নিঃসঙ্গতার এই আবহাওয়া যেন কখনো টুটে না যায়। মনে হত আমার স্বপ্ন, আমার ধ্যানধারণা, আমার প্রার্থনা এই অন্ধকারে জীবন্ত প্রাণীর মতো আমার সঙ্গে রয়েছে, উড়ছে বিছানার কাছাকাছি, দাঁড়িয়ে আছে আমার ওপর। আর আমার সমস্ত ধ্যানধারণা ওঁর ধ্যানধারণা, সমস্ত অনুভূতি ওঁর অনুভূতি। এটা যে পূর্বরাগ তখনো বুঝিনি। মনে হত আপনা থেকে যে কোন সময়ে এ ধরনের অনুভূতি আসতে পারে।

৩

ফসল কাটার সময়ে একদিন দুপুরের খাবারের পর কাতিয়া ও আমি সনিয়াকে সঙ্গে করে বাগানে গেলাম। খাদের ওপর লাইম গাছের ছায়ার নিচে আমাদের প্রিয় বেঞ্চিটাতে বসা গেল। ওখান থেকে দূরের বন মাঠঘাট নজরে পড়ে। তিনদিন সের্গেই মিখাইলিচ আসেননি; সেদিন ওঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম; নায়েবের কাছে শুনেছিলাম উনি কথা দিয়েছেন আমাদের ক্ষেত দেখতে আসবেন। একটার অল্পক্ষণ পরে দেখলাম ঘোড়ার পিঠে গম-ক্ষেত হয়ে উনি আসছেন। ওঁর প্রিয় পিচ ও চেরি কিছু আনিয়ে নিল কাতিয়া। তারপর হেসে আমার দিকে একবার চেয়ে বেঞ্চে শুয়ে পড়ে ঝিমোতে লাগল। লাইম গাছের একটা ভোঁতা বেঁকা, সরস পাতা ও ভিজে ছালওয়ালা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে কাতিয়াকে হাওয়া করতে লাগলাম, সঙ্গে সঙ্গে পড়া চলল। মাঝে মাঝে মেঠো রাস্তার দিকে তাকাচ্ছি, ওটা হয়ে তো ওঁর আসার কথা। পুরোনো একটা লাইম গাছের শেকড়ের গায়ে পুতুলের ঘর বানাচ্ছে সনিয়া।

তপ্ত গুমোট দিন, হাওয়া নেই। মেঘ ক্রমশ আরো কালো হয়ে আসছে, সকাল থেকে ঝড়বিদ্যুতের আভাস। অস্থির লেগেছিল আমার, ঝড়বিদ্যুতের আগে যেমনটা আমার বরাবর হয়। কিন্তু দুপুরের পর মেঘগুলো সরে গেল ঈশান কোণে, পরিষ্কার আকাশে বেরিয়ে এল সূর্য। শুধু মাঝে মাঝে একদিকে বজ্রের গুরু গুরু ধ্বনি, দিগন্তে ক্ষেতের ধুলোর সঙ্গে মিশেছে জগদ্দল মেঘ, মেঘ চিরে বেরিয়ে আসছে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা ক্ষীণ ঝলক। স্পষ্ট বোঝা গেল আজ আর ঝড় আসবে না, অন্তত আশেপাশে কোথাও নয়। বাগানের ওধারে চোখে পড়ে রাস্তায় শস্যের আঁটি উঁচু করে বোঝাই ক্যাঁচকেঁচে গাড়িগুলো ঢিমেতালে ঘরে ফিরছে, ক্রমাগত তাদের সাড়া, উল্টো দিকে ফাঁকা সব গাড়ি চলেছে ঘড়ঘড়িয়ে, লোকগুলো বসে আছে পা ঝুলিয়ে, সার্ট উড়ছে। ভারি ধুলো কেটে যাচ্ছে না, মাটিতে বসছেও না, কঞ্চির বেড়ার ওদিকে আর ফলের বাগানের পাতার মধ্যে ভাসছে। আরো দূরে, শস্যের মাড়াই স্থানে একই গলার আওয়াজ, গাড়ির চাকার সেই ক্যাঁচক্যাঁচ,

দেখা যাচ্ছে শস্যের সেই একই হলদে আঁটি, প্রথমে কণ্ডির বেড়া বরাবর মন্থর তাদের গতি, তারপর হঠাৎ ওপরে উঠছে ঝটকায়, আমার চোখের সামনে আঁটিগুলো ডিমের আকারের বাড়ির মতো রূপ নিচ্ছে, ছাতগুলো চোখা, ওপরে ভিড় করে আছে চাষীরা। সামনের দিকটায় ধুলো-ভরা ক্ষেতে গাড়িগুলোর এদিক সেদিক যাতায়াত, আবার নজরে পড়ছে হলদে আঁটি, কানে আসছে গাড়ির, গলার, গানের শব্দ। একদিকে ফসল-কাটা মাঠের ক্রমশ বিস্তৃত প্রসার, ক্ষেতের মাঝে মাঝে সীমারেখার মতো সোমরাজের ফালি। নিচে, ডান দিকে রঙচঙে জামাকাপড় পরা কিষাণীরা ফসল-কাটা এবড়োখেবড়ো ক্ষেতে শস্যের আঁটি বেঁধে রাখছে: ঝুঁকে পড়ে সামনে পিছনে সমানে হাত ঘোরাচ্ছে ওরা, যত এগোচ্ছে তত নিয়মিত সারিতে রাখা শস্যের আঁটিতে ছিমছাম দেখাচ্ছে ক্ষেতটাকে। মনে হল হঠাৎ আমার চোখের সামনে গ্রীষ্ম পরিণত হচ্ছে হেমন্তে। চারিদিকে গরম আর ধুলো, বাগানে আমাদের প্রিয় জায়গাটা ছাড়া। চারিদিকে ধুলো আর গরম, আর সবকিছু ছাপিয়ে কাঠ ফাটা রোদে কর্মরত চাষীদের হৈচৈ, কথাবার্তা, অঙ্গ সঞ্চালন।

শাদা স্বচ্ছ রুমালে মুখ ঢেকে ঠাণ্ডা বেঞ্চে শুয়ে কেমন সুন্দর নাক ডাকাচ্ছে কাতিয়া! রেকাবীতে চেরিগুলো কী টুসটুসে, কী ঝকঝকে কালো! কী তাজা আর পরিষ্কার আমাদের ফ্রকগুলো! জগের জল সূর্যালোকে কী উজ্জ্বল আর উৎফুল্ল! কী সুখী লাগছে নিজেকে! "কী আর করা যায়?" ভাবলাম। "এত সুখী লাগছে সেটা কি আমার দোষ? কিন্তু সুখের ভাগ অন্যকে দেব কী করে? কাকে দেবো নিজেকে উজাড় করে, দেবো আমার সমস্ত সুখ?"

পথের ধারে বার্চ গাছের চূড়ার নিচে সূর্য ইতিমধ্যে অস্ত গিয়েছে: দূরের জিনিস সূর্যের তেরছা আলোয় উজ্জ্বল আর প্রখর; মাটিতে বসছে ধুলো; একেবারে ছত্রভঙ্গ মেঘগুলো; গ্রামের ওপারে শস্যের তিনটে নতুন গাদা চোখে পড়ল, চাষীরা সেগুলো থেকে নেমে এসেছে; ঘড়ঘড়িয়ে চলে গিয়েছে গাড়িগুলো, শেষবারের মতো নিশ্চয়, গাড়িতে বসা লোকের চেঁচানি; গলা ফাটিয়ে গাইতে গাইতে ঘরে ফিরেছে মেয়েরা, কাঁধে উকনঠেঙ্গা, কটিবন্ধে খড় বাঁধার দড়ি: কিন্তু সের্গেই

মিখাইলিচ তো এলেন না এখনো, অনেকক্ষণ আগে তো একটা টিলা থেকে ঘোড়ায় চেপে নামতে দেখেছি ওঁকে। তারপর হঠাৎ দেখলাম ওঁকে, যেদিক থেকে এলেন একেবারে আশা করিনি সেদিক থেকে আসবেন (উনি এসেছেন খাদ হয়ে)। দীর্ঘ পদক্ষেপে আসছেন আমাদের কাছে, মুখে হাসি আর খুশির ছাপ, টুপিটা হাতে। দেখলেন কাতিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠোঁট চিপে চোখ কোঁচকালেন, তারপর এলেন পা টিপে টিপে। বুঝলাম উনি সেই অকারণ প্রাণবন্ত মেজাজে আছেন যেটা আমার ভালো লাগত খুব, যেটাকে আমরা বলতাম 'বুনো উচ্ছ্বাস'। ঠিক স্কুল পালানো ছেলের মতো; সমস্ত চেহারায় আনন্দের, সুখের, বালকসুলভ দুষ্টুমির ছাপ।

'কী খবর, ছোট্ট ভায়োলেট, কেমন আছেন? খাসা আছেন তো?' হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে শুধালেন। 'আমি চমৎকার আছি,' প্রশ্নের জবাবে বললেন। 'আজ তেরোয় পড়লাম যে, মনে হচ্ছে ঘোড়ায় চাপি বা গাছে চড়ি।'

'"বুনো উচ্ছ্বাস" বুঝি?' ওঁর হাসি-ভরা চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম, বুঝতে পারলাম ওঁর মেজাজের ছোঁয়াচ লাগছে আমায়।

'হ্যাঁ,' চোখ ঠেরে, না হাসার চেষ্টা করে জবাব দিলেন উনি। 'কিন্তু কাতেরিনা কার্‌লভনার নাকে ঘা দিয়ে লাভটা কী?'

ওঁর দিকে তাকিয়ে লাইমের ডালটা দুলিয়ে গিয়েছি, খেয়াল করিনি কাতিয়ার রুমালটা ডালের ঘায়ে খসে পড়েছে, পাতা লাগছে ওর মুখে। হেসে উঠলাম।

'ও বলবে ও ঘুমোয়নি,' ফিসফিসিয়ে বললাম, যেন ওর ঘুম না ভাঙে; কিন্তু আসলে তা নয় — ফিসফিসিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিল বলে।

আমার নকল করে ঠোঁট নড়ালেন উনি, যেন আমি এত আস্তে কথা বলেছি যে ওঁর কানে কিছু যায়নি। তারপর চেরির প্লেটটা চোখে পড়াতে চোরের মতো সেটা তুলে নিয়ে গেলেন লাইম গাছের নিচে সনিয়ার কাছে, সেখানে ওর পুতুলগুলোর ওপর বসে পড়লেন। সনিয়া

চটে গেল প্রথমে, কিন্তু উনি খেলতে লাগলেন ওঁর সঙ্গে, মিটমাট হতে তাই দেরী হল না। খেলাটা হল কে আগে ভাগে চেরিগুলো সাবাড় করে ফেলতে পারে।

'ওদের বলি আরো চেরি আনতে,' বললাম। 'কিম্বা আমরা তিনজনে গিয়ে নিয়ে আসি।'

রেকাবীটা নিয়ে তার ওপর পুতুলগুলো বসালেন উনি, আমরা চললাম ফলের চালার দিকে, পিছু পিছু দৌড়চ্ছে সনিয়া, পুতুলগুলো ফিরে পাবার জন্য ওঁর কোট ধরে টানছে। পুতুলগুলো দিয়ে উনি গম্ভীরভাবে আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

বললেন, 'সত্যি আপনি ভায়োলেট,' গলার স্বর তখনো মৃদু, যদিও কারো ঘুম ভাঙবার আশঙ্কা আর ছিল না। 'ধুলো আর গরম আর কাজের পর এলাম আপনার কাছে, মনে হল ভায়োলেটের গন্ধ পেলাম — বাগানের ভায়োলেটের গন্ধ নয়, ঋতুর প্রথম কালচে ছোট্ট ভায়োলেট, তাতে গলন্ত বরফ আর বাসন্তী ঘাসের গন্ধ।'

'ফসল কাটা কেমন চলেছে?' ওঁর কথায় আমার আনন্দ ও বিব্রত ভাব ঢাকা দেবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম।

'চমৎকার! চমৎকার লোক এরা সবাই। ওদের যত বেশী চেনা যায় তত ভালো লাগে।'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'আপনি আসার আগে বাগানে বসে ওদের কাজ দেখছিলাম, আর হঠাৎ এমন লজ্জা করল, ওরা কাজ করছে, আর আমি ...'

'আদিখ্যেতা করবেন না,' বাধা দিয়ে বললেন উনি, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে আমার দিকে তাকালেন, ওঁর চাউনিটা কিন্তু কোমল। 'ওটা পবিত্র জিনিস। এ ধরনের অনুভূতি নিয়ে কখনো জাঁক করা উচিত নয়।'

'কিন্তু কথাটা তো শুধু আপনাকে বলেছি।'

'তা জানি। যাক গে, চেরিগুলোর কী হল?'

ফলের বাগানের গেট তালাবন্ধ, মালীদের কাউকে দেখা গেল না (ফসল তোলায় হাত লাগাতে সবাইকে পাঠিয়েছিলেন উনি)। চাবি

আনতে দৌড়ল সনিয়া, কিন্তু ওর জন্য না দাঁড়িয়ে উনি দেয়ালের ওপর উঠে জালটা তুলে লাফিয়ে পড়লেন ওদিকে।

'চেরি চাই না কি?' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। 'রেকাবীটা দিন তো।'

'না, আমি নিজের হাতে তুলতে চাই — চাবিটা নিয়ে আসি। সনিয়া খুঁজে পাবে না ...'

কিন্তু ওখানে উনি কী করছেন দেখার ইচ্ছে হল; যখন নিজেকে একেবারে একলা ভাবেন তখন ওঁকে কী রকম দেখায়, ওঁর হাবভাবটা কেমন, দেখতে ইচ্ছে হল। সত্যি কথা বলতে, নিমেষের জন্যও ওঁকে চোখ ছাড়া করতে আমার অনিচ্ছা।

বিছুটির ওপর দিয়ে দেয়াল ঘুরে পা টিপে দৌড়িয়ে অন্য দিকটায় গেলাম, ওখানটা আরো নিচু। একটা খালি পিপের ওপর দাঁড়ালাম, দেয়ালের ওপর দিকটা আমার বুক পর্যন্ত নয়, ঝুঁকে পড়ে দেখলাম। গাঁটওয়ালা বুড়ো বুড়ো গাছ, চওড়া, দাঁতওয়ালা পাতার নিচে সরস কালো চেরি ভারি হয়ে ঝুলছে, দেখে নিলাম একবার। জালের নিচে দিয়ে মাথা গলিয়ে একটি গ্রন্থিল ডালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম সের্গেই মিখাইলিচকে। উনি ধরে নিয়েছিলেন আমি চলে গিয়েছি, কেউ ওঁকে দেখতে পাবে না। টুপি খুলে একটি গাছের ফেঁকড়ায় বসে আছেন, চোখ বোজা, এঁটেল একটা চেরি দলা পাকিয়ে গোল করছেন। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে চোখ খুললেন, অল্প হেসে অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন বললেন। হাসিটা, কথাটা ওঁর পক্ষে এত অস্বাভাবিক যে আড়ি পাততে লজ্জা হল। মনে হল উনি বলেছেন, "মাশা।" ভাবলাম, না তা হতে পারে না। আবার বললেন উনি, "মাশা আমার" -- এবার আরো আস্তে, আরো কোমলভাবে। এবারে কথাগুলো স্পষ্টভাবে কানে এল। বুক এত ঢিপঢিপ করতে লাগল, এমন একটা তীব্র, প্রায় নিষিদ্ধ, আনন্দ আমাকে অভিভূত করে ফেলল যে দেয়ালটা আঁকড়ে ধরলাম দুহাতে, যাতে পড়ে গিয়ে ধরা না পড়ি।

শুনতে পেলেন উনি, চমকে উঠে চারিদিক দেখে নিয়ে চোখ বুজলেন, মুখটা ছোট ছেলের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠল। কী একটা বলতে চাইলেন আমাকে, কিন্তু পারলেন না, আরক্তিম মুখে

দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমিও হাসলাম। সুখে ওঁর সারা মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। পরিবারের প্রবীণ বন্ধু উনি আর নন, এমন একজন নন যিনি আদর করেন আমাকে, আমাকে শেখান। এখন তিনি আমার সমান — এমন একজন মানুষ যিনি ভালোবাসেন আমাকে আর ভয় করেন, যাঁকে ভালোবাসি আর ভয় করি আমি। কোন্ কথা বললাম না দুজনে, শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ উনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন; হাসি আর চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি মিলিয়ে গেল; পুরোনো, পিতৃসুলভ গলায়, নিরাসক্তভাবে তাকালেন আমার দিকে আবার, যেন অসমীচীন কিছু একটা আমরা করেছি, এখন সামলে নিয়েছেন নিজেকে, আমাকেও বলছেন সামলে নিতে।

'নেমে পড়ুন, নইলে পড়ে যাবেন,' বললেন উনি। 'আর চুলটা ঠিক করে নিন, চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখুন দিকি।'

বিরক্ত হয়ে ভাবলাম, "উনি ভান করছেন কেন? আমাকে ব্যথা দিতে চান কেন?" সে মুহূর্তে ওঁকে আবার বিব্রত করার, ওঁর ওপর আমার শক্তি পরখ করার দুর্দম বাসনা একটা পেয়ে বসল আমাকে।

'না, আমি নিজে হাতে চেরি তুলতে চাই,' বলে একেবারে কাছের ডালটা ধরে দেয়ালে উঠলাম। উনি হাত বাড়াতে না বাড়াতে লাফিয়ে নামলাম ফলের বাগানে।

'কী বোকামী!' বলে আবার লাল হয়ে উঠলেন, আর নিজের বিব্রত ভাবটা লুকোবার জন্য বিরক্তির ভান করলেন। 'লাগত যদি? আর এখান থেকে বেরোবো কী করে?'

আগের চেয়ে বিব্রত উনি, কিন্তু এবার তাতে আনন্দ হল না, ভয় হল। এবার আমার বিব্রত হবার পালা। লাল হয়ে উঠলাম, তাকালাম না ওঁর দিকে। এত লজ্জা করল যে রাখার মতো কিছু না থাকলেও চেরি তুলতে শুরু করে দিলাম। ধিক্কার দিলাম নিজেকে, যা করেছি অনুশোচনা হল তার জন্য। ভয় হল আজকের ছেলেমানুষি কাণ্ডটার জন্য ওঁর কাছে চিরকালের জন্য খেলো হয়ে যাব। দুজনেই চুপচাপ, দুজনেরি খারাপ লাগছে। চাবি নিয়ে সনিয়া দৌড়িয়ে আসাতে অস্বস্তির

হাত থেকে রেহাই পেলাম। এরপর অনেকক্ষণ দুজনে কথা বললাম না, সনিয়াকে নিয়ে দুজনেই ব্যস্ত। কাতিয়ার কাছে ফিরে যাওয়াতে ও বলল যে ও ঘুমোয়নি মোটেই, সব কথা ওর কানে গিয়েছে। আমি অনেকটা টাল সামলে নিলাম, আর উনি আবার ওঁর পিতৃসুলভ খবরদারীর ভাবটা আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেটাতে বিশেষ ফল হল না, আমি ভুললাম না তাতে।

কিছুদিন আগেকার কথাবার্তা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। কাতিয়া বলেছিল মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ভালোবাসা আর সে ভালোবাসা প্রকাশ করা আরো সহজ।

ও বলেছিল, 'পুরুষে বলতে পারে ভালোবাসি, মেয়েরা পারে না।'

'আমার তো মনে হয়, "ভালোবাসি" কথাটা পুরুষে বলতে পারে না, বলা উচিত নয়,' উনি বলেছিলেন।

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'কেননা, সেটা মিথ্যে বলা হবে। ভালোবাসার কথা বলাটা মানুষের পক্ষে বিদ্যে প্রকাশের সামিল না কি? যেন "ভালোবাসি" বলার সঙ্গে সঙ্গে চিচিংফাঁক গোছের কিছু একটা হবে, আর লোকে ভালোবেসে ফেলবে। যেন কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অবাক কাণ্ড কিছু একটা ঘটা চাই, কোন ভেলকি, হাজারটা তোপ একসঙ্গে গর্জে উঠবে। আমার মনে হয়,' উনি বলে চললেন, 'ভালোবাসার কথাটা যারা গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে তারা হয় নিজেদের ঠকায় নয় অন্যদের, সেটা আরো খারাপ।'

'কিন্তু পুরুষে না বললে মেয়েটি কী করে বুঝবে যে তাকে ভালোবাসে?' জিজ্ঞেস করেছিল কাতিয়া।

'জানি না,' উনি জবাবে বলেছিলেন। 'প্রত্যেক মানুষের নিজের ভাষা আছে। অনুভূতি যদি থাকে, সেটা প্রকাশ পাবে। উপন্যাস পড়ার সময়ে খালি কল্পনা করি, লেফটেনাণ্ট স্ত্রেল্‌স্কি বা আলফ্রেড বলে উঠল "তোমায় ভালোবাসি, এলিওনরা", আর সে সময় তাদের মুখে কী রকম বুঝি হতবুদ্ধি ভাব আসে। ওরা তো ভাবে যে বলার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু তাদের বা প্রেমিকার কিসসু ঘটে না, নাক চোখ সবকিছু তো থাকে অবিকল আগেকার মতো।'

তখন মনে হয়েছিল ওঁর ঠাট্টার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আছে — আমাকে নিয়ে কিছু একটা — কিন্তু উপন্যাসের নায়কনায়িকাদের তাচ্ছিল্য করতে কাতিয়া দেবে না কাউকে।

'হামেশা বেঁকিয়ে কথা বলেন আপনি,' কাতিয়া বলেছিল। 'আচ্ছা, ঠিক বলুন তো, আপনি কখনো কোন মেয়েকে "ভালোবাসি" বলেননি?'

'কখখনো না, আর এক পায়ে হাঁটু গেড়ে বসিনি কখখনো,' হেসে জবাব দিয়েছিলেন উনি, 'আর সেটা করবো না এ জন্মে।'

সে কথাবার্তা স্পষ্ট মনে পড়ল; ভাবলাম, "আমাকে ভালোবাসেন বলার দরকার নেই ওঁর। উনি ভালোবাসেন আমাকে সেটা জানি। আর নির্বিকার ভাব যতই করুন না কেন, আমি ভোলবার নই।"

সেদিন সারা সন্ধ্যে আমার সঙ্গে খুব কম কথা বললেন উনি, কিন্তু কাতিয়া আর সনিয়াকে বলা প্রতিটি কথায়, ওঁর প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনে, দৃষ্টিপাতে অনুরাগের চিহ্ন দেখলাম, দেখলাম নিঃসন্দেহে। শুধু বিরক্ত লাগল, দুঃখ হল ওঁর জন্য: কেন উনি ভাবছেন যে মনের ভাব গোপন রাখতে হবে, উদাসীনতার ভান করে যেতে হবে? এখন তো সবকিছু পরিষ্কার, এখন অবিশ্বাস্য রকমের সুখ পাওয়া কত সহজ, কত স্বাভাবিক। কিন্তু ফলের বাগানে আমার লাফিয়ে নামার কথাটা পীড়া দিতে লাগল আমাকে, যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছি। মনে হল উনি আমার খাতির আর করেন না, চটে গিয়েছেন আমার ওপর।

খাবার পর পিয়ানোর কাছে গেলাম, উনি এলেন পিছন পিছন।

বৈঠকখানায় আমাকে ধরে ফেলে বললেন, 'একটা কিছু বাজান তো। অনেক দিন আপনার বাজনা শুনিনি।'

'সের্গেই মিখাইলিচ ... আমি,' হঠাৎ ওঁর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আপনি আমার ওপর চটেননি তো?'

'চটবো কেন?'

'দুপুরের খাবার পর আপনার কথা শুনিনি বলে,' আরক্তিম মুখে বললাম।

কথাটা বুঝলেন উনি, হেসে মাথা নাড়লেন। ওঁর চাউনিটার মানে, আমাকে বকা উচিত, কিন্তু বকার মতো মনের জোর ওঁর নেই।

'যাক, তাহলে কিছু হয়নি, আমাদের আবার ভাব হয়ে গিয়েছে,' পিয়ানোয় বসতে বসতে বললাম।

'তাই তো মনে হচ্ছে!' বললেন উনি।

বড়ো, উঁচু ছাতওয়ালা হলে পিয়ানোর ওপরে দুটো মোমবাতি শুধু, বাকি ঘরটা আধো-অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে স্বচ্ছ গ্রীষ্ম রাত্রির উঁকিঝুঁকি। সব নিস্তব্ধ, শুধু কাতিয়ার পায়ের চাপে অন্ধকার বৈঠকখানার মেঝের পাটাতনের কিঁচকিঁচ আর জানলার নিচে বাঁধা সের্গেই মিখাইলিচের ঘোড়া বার্ডকে পা ঠুকছে আর নাক দিয়ে আওয়াজ করছে।

আমার পেছন দিকে উনি বসেছিলেন বলে ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন ঘরের সবখানে, আমার সঙ্গীতে, আমার অন্তরে ওঁর উপস্থিতির অনুভূতি। ওঁর প্রতিটি দৃষ্টি, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে কিন্তু ওঁর সবকিছুতে সাড়া দিচ্ছিল আমার হৃদয়। মোৎসার্টের সোনাটা ফান্টাজিয়াটা উনি এনেছিলেন, উনি ফিরে আসার পর সেটা শিখেছিলাম ওঁরি জন্য, সেটা বাজালাম। কী বাজালাম মোটে ভাবিনি, কিন্তু মনে হল বাজিয়েছি ভালোই, অনুভব করলাম উনি খুশি হয়েছেন। উনি যে আনন্দ পাচ্ছেন বুঝলাম সেটা, ওঁর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু না ভেবে, আঙুলগুলো আপনা থেকে তখনো বাজিয়ে চলেছে, ফিরে তাকালাম ওঁর দিকে। জ্যোৎস্না রাত্রির পটভূমিতে ওঁর মাথাটা স্পষ্ট দেখা গেল। হাতে চিবুক রেখে উনি বসে আছেন, দীপ্ত চোখ আমাতে নিবদ্ধ। ওঁর সে দৃষ্টি দেখে অল্প হেসে বাজানো থামিয়ে দিলাম। উনিও অল্প হাসলেন, তারপর বকুনির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন বাজিয়ে যেতে।

বাজনা শেষ হল, চাঁদ তখন অনেক উঁচুতে, ঘরে মোমবাতির ক্ষীণ শিখা ছাড়া জানলা দিয়ে অন্য ধরনের রুপালী আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। কাতিয়া বলল সবচেয়ে ভালো জায়গাতে থেমে যাওয়াটা কেমন ধারা কাণ্ড, খারাপ বাজিয়েছি আমি। উনি বললেন বরং এত ভালো কখনো বাজাইনি আগে, তারপর এ ঘর ও ঘরে পায়চারি শুরু করলেন, অন্ধকার বৈঠকখানা আর হলে আসা আর যাওয়া, মাঝে মাঝে থেমে আমার দিকে

তাকিয়ে হাসছেন। আমারো মুখে মৃদু হাসি, বাস্তবিক, ইচ্ছে হচ্ছিল বিনা কারণে জোরে হাসি, একটা কিছু ঘটেছে বলে এত সুখ মনে, সেটা ঘটেছে আজ, এইমাত্র, এই মুহূর্তে। ঘর ছেড়ে উনি বেরিয়ে যাচ্ছেন আর আমি কাতিয়ার গলা জড়িয়ে (আমরা দুজনে পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম) ওর নরম চিবুকের নিচে আমার আদরের জায়গাটিতে চুমু খাচ্ছি। যেই উনি ফিরে আসছেন, মুখে ভারিক্কি ভাব আনার চেষ্টা করছি, অতি কষ্টে হাসি চেপে রাখছি।

'ওর কী হয়েছে আজ?' কাতিয়া জিজ্ঞেস করল ওঁকে।

উত্তর না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে শুধু হাসলেন উনি — কী ঘটেছে উনি তো জানেন।

'রাত্তিরটা কেমন দেখুন একবার!' বাগানের দিকে বারান্দার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বৈঠকখানা থেকে ডেকে বললেন উনি।

কাছে গেলাম আমরা। ও রকম রাত্রি সত্যি আর কখনো দেখিনি পরে। বাড়ির পিছনে, দৃষ্টির বাইরে, পূর্ণিমার চাঁদ, আলোয় ছাতের আর থামগুলোর আর চাঁদোয়ার ছায়া তেরছাভাবে পড়েছে বালু পথে আর ফুলের কেয়ারিতে। বাকি সবকিছুতে আলোর বান ডেকেছে, সবকিছু শিশিরে আর চন্দ্রালোকে রূপালী। ফুলের মধ্য দিয়ে চওড়া পথ, একদিকে আড়াআড়ি পড়েছে ডালিয়া ফুল ও কাঠিগুলোর ছায়া, ঠাণ্ডা ঝকঝকে কাঁকর বিছানো পথটা সটান চলে গিয়েছে কুয়াশাচ্ছন্ন সুদূরে। পথটায় চাঁদের চিকচিকে আলো। গাছের মাঝখানে ফুলের ঘরের চকচকে চালের আভাস, খাদ থেকে উঠছে ক্রমশ ঘন কুয়াশা। লাইলাক ঝোপের পাতা তখুনি ঝরতে শুরু করেছে, প্রত্যেকটি ডাল উদ্ভাসিত। বাগানে শিশিরে-ভেজা প্রত্যেকটি ফুল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বীথিকাগুলোয় আলো ও ছায়া মিশেছে এমনভাবে যে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে দোলন্ত স্বচ্ছ অলৌকিক বাড়ির মতো। ডান দিকে বাড়িটার ছায়ায় সবকিছু কালো, খাপছাড়া, ভয়াবহ। সে ছায়া থেকে খামখেয়ালে ঠেলে ওঠা পপলারের ঝোপড়া মাথাটা আরো উজ্জ্বল, কী বিচিত্র কারণে যেন বাড়ির একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে আলোয়, উচিত ছিল তো আকাশের দূর নীলে ভেসে যাওয়া।

'একটু বেড়িয়ে আসা যাক,' বললাম আমি।

রাজী হয়ে গেল কাতিয়া, শুধু বলল আমার গালোশ পড়া উচিত।

'লাগবে না,' বললাম। 'সেগেই মিখাইলিচের হাত ধরে যাবো।'

উনি হাত ধরলে যেন পা ভিজবে না! কিন্তু তখন আমাদের তিনজনেরি কথাটা ঠিক মনে হল, অদ্ভুত ঠেকল না। এর আগে কখনো আমার হাত ধরে উনি হাঁটেননি, সেদিন নিজে আমি ওঁর হাতটা নিলাম, সেটা বিচিত্র লাগল না ওঁর। বারান্দা থেকে নামলাম তিনজনে, আর সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, বাগান আর হাওয়া মনে হল সম্পূর্ণ নতুন, আমার অচেনা।

বীথিকা হয়ে হাঁটছি, সামনে তাকিয়ে মনে হচ্ছে ও দিকে আর এগোনো অসম্ভব একেবারে, ওখানে সম্ভাব্য পৃথিবীর সমাপ্তি, ওখানে যা আছে তা নিজের সৌন্দর্যলোকে চিরকালের জন্য আবদ্ধ। কিন্তু আরো এগোচ্ছি আর সেই সৌন্দর্যলোকের রহস্য-দ্বার খুলে যাচ্ছে আমাদের জন্য, সেখানেও মনে হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত সেই বাগান, সেই গাছ আর পথ আর শুকনো পাতা। মনে হল আমরা সত্যি যেন পথ হয়ে হাঁটছি, আলোছায়ার বৃত্তে পা দিচ্ছি, আর সত্যি যেন পায়ের নিচে শুকনো পাতার খসখস শব্দ, মুখে লাগছে তাজা ডাল একটা। আর আমার হাত সাবধানে নিয়ে কোমল নিয়মিত পদক্ষেপে সত্যি তিনি হাঁটছেন পাশে পাশে, বালুতে শব্দ তুলে পাশে যে হাঁটছে সত্যি সে কাতিয়া। নিস্পন্দ শাখার মধ্য দিয়ে আমাদের মুখে আলো এসে পড়েছে, সেটা চাঁদের আলো না হয়ে যায় না।

প্রতি পদক্ষেপে পিছনে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রহস্য-দ্বার, বিশ্বাস হচ্ছে না আরো এগিয়ে যেতে পারি আমরা, ধরা ছোঁয়ার জগতে বিশ্বাস লুপ্ত হল আমার।

'এঃ! কোলা ব্যাঙ একটা!' কাতিয়া বলে উঠল।

কে বলল কথাটা, বলল কেন? অবাক হয়ে ভাবলাম। তারপর মনে পড়ল — ও, কাতিয়ার গলা ওটা, কোলা ব্যাঙে ওর আতঙ্ক, নিচে চেয়ে দেখলাম। সামনে ছোট্ট একটা কোলা ব্যাঙ একবার লাফিয়ে

নড়ল না ওখান থেকে, পথের চকচকে বালুতে পড়ল ওর অতি ক্ষীণ কালো ছায়া।

'ভয় করছে নাকি?' উনি শুধালেন।

ওঁর দিকে তাকালাম, ওখানটায় গাছগুলো একটু ফাঁক, ওঁর মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল। কী সুন্দর সে মুখ, কী সুখী!

বললেন, 'ভয় করছে নাকি?' কিন্তু আমি শুনলাম উনি বলছেন, 'তোমায় ভালোবাসি।' ওঁর চাউনি, ওঁর স্পর্শ ঝঙ্কার তুলল, 'ভালোবাসি, ভালোবাসি!' আর সে কথাটা বলল আলো আর ছায়া আর বাতাস, সবকিছু।

বাগানটা পুরো চক্কর দিলাম আমরা। খুটখুট করে পাশে পাশে হাঁটছে কাতিয়া, হাঁপাচ্ছে। ক্লান্ত ও, বলল ফেরার সময় হয়েছে এবার। দুঃখ হল বেচারীর জন্য। ভাবলাম আমাদের মতো অনুভূতি নেই কেন কাতিয়ার? সবাই কেন আজকের রাত্তিরটার মতো, আমাদের দুজনের মতো সুখী আর নবীন নয়?

বাড়িতে ফিরে গেলাম, কিন্তু উনি অনেকক্ষণ রয়ে গেলেন — মোরগ ডাকছে, সবাই শুতে চলে গিয়েছে, জানলার নিচে ওঁর ঘোড়াটা মাটিতে পা ঠুকছে আর অস্থির শব্দ করছে নাক দিয়ে, তবু উনি গেলেন না। অনেক রাত হয়েছে সেটা আমাদের মনে করিয়ে দিল না কাতিয়া, আমরা আজেবাজে গল্প করে চললাম, বুঝতে পারিনি কখন তিনটে বাজল। তৃতীয় বার মোরগ ডাকল, ভোর হয় হয়, তখন উনি গেলেন। সচরাচরকার মতো বিদায় জানালেন, কথায় অসাধারণ কিছু ছিল না, কিন্তু আমি জানলাম সেদিন থেকে উনি আমার, কখনো হারাব না ওঁকে। ওঁকে ভালোবাসি, সেটা নিজের কাছে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে কাতিয়াকেও সবকিছু বললাম। খুশি হল ও, ওকে যে খুলে বলেছি তাতে ওর মনে নাড়া লেগেছে; সে রাত্রে কাতিয়া বেচারীর ঘুমের অভাব হল না অবশ্য, কিন্তু আমি অনেকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করে শেষে বাগানে গিয়ে দুজনের চলা পথে আবার হাঁটলাম, ওঁর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালন আবার মনে করলাম। সারা রাত ঘুম এল না, আর জীবনে সেই প্রথম অত ভোরে সূর্যোদয় দেখলাম। সে রকম রাত্রি আর প্রভাত

পরে আর কখনো দেখিনি। "উনি কেন সোজাসুজি বলেন না যে আমায় ভালোবাসেন?" ভাবলাম আমি। "কেন তোলেন বাধাবিঘ্নের কথা, বুড়ো বলেন নিজেকে? সবকিছু তো এত সহজ আর সুন্দর এখন। এই সোনালি দিন কেন বৃথায় যেতে দিচ্ছেন, এ দিন আর কখনো ফিরে আসবে না হয়ত। বলুন উনি, 'তোমায় ভালোবাসি,' মুখ ফুটে বলুন। আমার হাত হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলুন, 'তোমায় ভালোবাসি।' লজ্জায় লাল হয়ে উঠুন উনি, চোখ বুজে যাক, আর তখন সব কথা জানাবো ওঁকে। কিম্বা কিছু বলবো না হয়ত, ওঁকে জড়িয়ে কাছ ঘেঁষে শুধু কাঁদবো। তারপর হঠাৎ মনে হল: যদি ভুল করে থাকি, যদি উনি আমাকে না ভালোবাসেন!"

ভেবে ভয় হল। তাহলে আমার দুর্দশার সীমা আর থাকবে না। ফলের বাগানের দেয়াল টপকে ওঁর কাছে যাওয়াতে ওঁর আর আমার বিব্রত ভাবটার কথা মনে পড়ল। ভারি হয়ে উঠল আমার বুক, জল ছাপিয়ে এল চোখে, প্রার্থনা করতে লাগলাম। তারপর আমার ভাবনাচিন্তা ও আশাকে জুড়িয়ে একটা কথা এল মাথায়। ঠিক করলাম আজকের দিন থেকে উপোস করব, আমার জন্মদিনে ইউকারিষ্ট গ্রহণ করে বাগদত্তা হব ওঁর।

কেন সে রকমটা হবে জানি না, কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে আমার বিশ্বাস হল ওটা না হয়ে যায় না। ঘরে ফিরে গেলাম যখন তখন ভোর হয়েছে, চাকরবাকররা উঠে পড়ছে।

৪

উসপেনস্কির পর্ব তখন, তাই আমার উপোস করার সিদ্ধান্তে কেউ অবাক হল না।

সারা সপ্তাহে একবারও এলেন না উনি, কিন্তু তাতে অবাক হলাম না, উৎকণ্ঠা বা রাগ হল না। না আসতে বরং খুশি হলাম, আমার জন্মদিনে উনি আসবেন তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে সপ্তাহে প্রত্যেকদিন খুব ভোরে উঠতাম, ঘোড়াকে ওরা সাজাত, বাগানে ঘুরে বেড়াতাম একলা,

আগের দিনে কৃত নিজের দোষের কথা ভাবতাম, বিনা দোষে নতুন দিনটা কী করে কাটাব, কী করে আমাকে ভরিয়ে দেবে দিনটা, তা নিয়ে জল্পনা চলত। একেবারে দোষ পাপ না করে থাকাটা সহজ মনে হত সে সব দিনে। ভাবতাম, তার জন্য শুধু অল্প চেষ্টা করা চাই, আর কিছু না।

ঘোড়ার গাড়িটা আসত, কাতিয়া বা কোনো পরিচারিকাকে নিয়ে তিন ভার্স্ট দূরের গির্জাতে যেতাম। প্রবেশ করার আগে প্রতিবার নিজেকে বলতাম, "ধর্মভয় নিয়ে যারা প্রবেশ করে ধন্য তারা," আর সেই অনুভূতি সঙ্গে করে গির্জার প্রবেশ-দ্বারে ঘাসে-ভরা দুটো ধাপ ওঠবার চেষ্টা করতাম। সে সময়ে গির্জায় বেশী লোক থাকত না — গুটি দশেক উপবাসব্রতী চাষী আর ঝিচাকর শুধু। ওদের নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার জানাবার চেষ্টা করতাম সবিনয়ে। নিজে মোমবাতির বাক্সের কাছে গিয়ে (সে রকম করাটা প্রশংসনীয় মনে হত) বাতি নিতাম গির্জার মাতব্বর বুড়ো সৈনিকটির কাছ থেকে, রাখতাম আইকনগুলোর সামনে। পূত দ্বারের মধ্য দিয়ে চোখে পড়ত বেদীর পর্দা, আমার মায়ের তৈরী। সেখানে আইকনস্থানের উপর সেই দুটি কাঠের দেবদূত দাঁড়িয়ে ছোটবেলায় যাদের মনে হত প্রকাণ্ড, আর পীতাভ জ্যোতির্ময় কপোতটি, বরাবর আমাকে আকর্ষণ করত যেটি। গায়কদের স্থানের ওধারে চোখে পড়ত এবড়োখেবড়ো জলাধারটি, আমাদের চাকরবাকরের কত বাচ্ছার দীক্ষা দিয়েছি ওখানে, আমার নিজেরো দীক্ষা হয়েছে ওখানে। বুড়ো পাদ্রী বেরিয়ে আসতেন, তাঁর গায়ের আলখাল্লাটি আমার বাবার শবাধারের কাপড়ে তৈরী; তিনি মন্ত্রপাঠ করতেন, আমার জ্ঞান হওয়া অবধি তাঁকে যেমনভাবে আমাদের বাড়িতে মন্ত্রপাঠ করতে শুনেছি — সনিয়ার নামকরণে, বাবার আত্মার শান্তি প্রার্থনায়, মায়ের অন্ত্যেষ্টিতে। গায়কদলের মধ্য থেকে ভেসে আসত পাদ্রীর সহকারীর সেই কম্পিত গলার সুর; আর সেই বক্রদেহা বৃদ্ধাটি, আমার মনে পড়ে, গির্জার কোনো প্রার্থনা যার বাদ যেত না, দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, অশ্রুরুদ্ধ চোখ আইকনে নিবদ্ধ, ক্রুশচিহ্ন করার সময় মলিন হয়ে আসা রুমালে তিনটি আঙুল চাপা; দন্তহীন মুখ নড়ে চলেছে অবিরাম।

এ সবকিছু আমার কাছে আর বিচিত্র নয়, স্মৃতি জাগাত বলে শুধু যে এ সব ভালো লাগত তা নয়। আমার চোখে এরা এখন মহান ও পূত, অতল তাৎপর্যে ভরা। প্রার্থনার প্রত্যেকটি কথা মন দিয়ে শুনতাম, চেষ্টা করতাম অন্তর দিয়ে সাড়া দেবার। কিছু না বুঝলে অনুরোধ জানাতাম ভগবানকে, যেন জ্ঞানের আলো দেন, কিছু শুনতে না পেলে নিজের কথায় প্রার্থনা করতাম। অনুশোচনা স্তবের নির্দোষ সময় মনে পড়ত অতীতের কথা, আত্মার সহজভাবের তুলনায় আমার ছেলেবেলাকার সহজ সরল দিনগুলো এত মিশকালো ঠেকত যে আতঙ্ক হত, নিজের প্রতি, করুণায় চোখে জল এসে যেত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতাম যে সবকিছুর মার্জনা মিলবে, পাপ আরো বেশী করে থাকলে অনুশোচনা হত আরো মধুর। প্রার্থনাশেষে পাদ্রী বলতেন, 'ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন,' তখন কথাটা সঙ্গে সঙ্গে আনত শারীরিক মঙ্গলের একটা অনুভূতি। যেন অন্তরে আসত আলো আর উত্তাপ। উপাসনার শেষে পাদ্রী কাছে এসে জিজ্ঞেস করতেন সন্ধ্যার আরাধনার জন্য আমাদের বাড়িতে আসবেন কিনা, এলে কখন আসবেন। আমার জন্য আসতে চান বলে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে বলতাম, না, আমি নিজে আসব।

'তাহলে নিজে কষ্ট করে আসবেন?' জিজ্ঞেস করতেন তিনি; কী বলব ভেবে পেতাম না, অহঙ্কারের পাপ যদি হয়।

উপাসনার পর, কাতিয়া সঙ্গে না থাকলে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে একলা হেঁটে বাড়ি ফিরতাম, পথে-দেখা-হওয়া সবাইকে সবিনয়ে নমস্কার জানাতাম। সাহায্য করার, উপদেশ দেবার, কারো জন্য আত্মত্যাগের জন্য এত ব্যাকুল আমি যে হয়ত কোনো বোঝা তুলতে হাত লাগাতাম, দোলাতাম কোন বাচ্ছাকে, কিম্বা অন্যদের পথ ছেড়ে দেবার জন্য নাবতাম কাদায়।

একদিন সন্ধ্যায় শুনলাম নায়েব কাতিয়াকে বলছে আমাদের একজন চাষী, সেমিওন, মেয়ের শবাধারের জন্য কিছু কাঠের তক্তা আর অন্ত্যেষ্টির ভোজের জন্য এক রুবল চাইতে এসেছিল, তাকে কাঠ ও টাকা দিয়ে দিয়েছে নায়েব।

'সত্যি ওরা এত গরীব?' জিজ্ঞেস করলাম। 'হ্যাঁ, দিদিমণি, ভয়ানক গরীব, এমন কি নুন কেনার পয়সা পর্যন্ত নেই ওদের,' বলল নায়েব। বুকটা আমার মুচড়িয়ে উঠল, কিন্তু আনন্দও হল এক ধরনের। কাতিয়াকে ধাপ্পা দেবার জন্য বললাম বেড়িয়ে আসতে যাচ্ছি, তারপর দৌড়িয়ে দোতলায় গিয়ে আমার সমস্ত টাকা সঙ্গে নিলাম (বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু যা ছিল সবটা নিলাম)। ক্রুশ-চিহ্ন করে গেলাম বারান্দায়, তারপর বাগান হয়ে গ্রামে। গ্রামের প্রান্তে সেমিওনের কুঁড়েঘর। সবায়ের অলক্ষিতে জানলায় গিয়ে সেখানে টাকা রেখে শার্সিতে দিলাম টোকা। কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে কে যেন সাড়া দিল, দরজায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। ভয়ে শিউরে উঠে দৌড়ে বাড়ি ফিরলাম, যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছি।

কাতিয়া জিজ্ঞেস করল কোথায় গিয়েছিলাম, কী হয়েছে আমার, কিন্তু কী বলছে ও বোধগম্য হল না আমার, জবাব দিলাম না। সবকিছু হঠাৎ মনে হল তুচ্ছ আর নীচ। দরজা বন্ধ করে ঘরে পায়চারি করলাম অনেকক্ষণ, কিছু করার সামর্থ নেই, গুছিয়ে ভাবতে পারছি না, নিজের অনুভূতি পর্যন্ত বোঝার ক্ষমতা নেই। ভাবলাম সেমিওনের পরিবার কী খুশিটা না হবে, টাকা যে রেখে গিয়েছে তার প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা হবে ওদের; নিজের হাতে টাকাটা দিইনি বলে আফসোস হল। আমার কীর্তিটা জানতে পারলে সের্গেই মিখাইলিচ কী বলতেন ভাবলাম, কেউ জানতে পারবে না ভেবে আনন্দ হল। আনন্দের বান ডেকেছে অন্তরে, সবাইকে, এমন কি নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হল, সবায়ের দিকে, নিজের দিকেও, এমন বিনম্র আমার দৃষ্টিভঙ্গি যে মৃত্যুচিন্তা আমার কাছে এল সুখস্বপ্নের মতো। হাসলাম, কাঁদলাম, প্রার্থনা করলাম। সে মুহূর্তে পৃথিবীর সবাইকে, নিজেকে সুদ্ধ ভালোবাসলাম গভীর আবেগে, তীব্রভাবে।

প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে যীশুর জীবনবৃত্তান্ত পড়তাম, আমার কাছে সে বৃত্তান্ত তখন আরো বোধগম্য। সেই স্বর্গীয় জীবনকাহিনী আরো সহজ, আরো মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল, যীশুর শিক্ষাবলীর গভীর প্রেম আর ভাবসম্ভার আরো অতল হয়ে উঠল, বেশী করে ভয়ভক্তি জাগাল মনে। বাইবেল রেখে দিয়ে আশেপাশের জীবন যখন খুঁটিয়ে

দেখতাম আর ভাবতাম তখন সবকিছু লাগত ভয়ানক স্বচ্ছ আর সহজ। মনে হত অসৎভাবে থাকে অতি কঠিন, সবাই যে সবাইকে ভালোবাসবে কত সহজ সেটা। সবাই আমার প্রতি এত সদয়, এত ভালো ব্যবহার করে! এমন কি সনিয়া পর্যন্ত। তাকে তখনো পড়াই; আমি যা বলি তা বোঝার আর করার চেষ্টা করে ও, আর জ্বালায় না আমাকে। সবায়ের প্রতি আমার যে রকম ব্যবহার, আমার প্রতি তাদেরো ব্যবহার সে রকম।

পাদ্রীর কাছে স্বীকারোক্তির আগে শত্রুদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করা চাই; শত্রুর কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল শুধু একজন মেয়ের কথা — বাড়ির লোক নন তিনি, প্রতিবেশিনী, অন্যান্য অতিথিদের সামনে বছর খানেক আগে প্রকাশ্যে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিলাম বলে তিনি আমাদের এখানে আসা বন্ধ করে দেন। নিজের দোষ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলাম তাঁকে। জবাব দিলেন তিনি, লিখলেন আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমিও যেন ক্ষমা করি তাঁকে। সহজ ছত্রগুলি পড়ে আনন্দে চোখে জল এসে গেল, সে সময় ছত্রগুলি মনে হয়েছিল মর্মস্পর্শী।

বুড়ী আয়ার কাছে ক্ষমা চাওয়াতে কেঁদে ফেলল সে। "এরা সবাই আমার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করে কেন?" শুধালাম নিজেকে। "এত ভালোবাসা পাবার মতো কী করেছি?"

আপনা থেকে মনে পড়ত সের্গেই মিখাইলিচকে, অনেকক্ষণ ভাবতাম তাঁর কথা। না ভেবে পারতাম না, ভাবাটা পাপ বলে মনে হত না। কিন্তু ওঁকে ভালোবাসি, সে কথাটা যে রাত্রে টের পাই সে রকম ভাবে নয়, নিজের কথা যেমন ভাবে চিন্তা করতাম তেমনি ভাবে ওঁর কথা ভাবতাম, আমার ভবিষ্যতের প্রতিটি চিন্তায় আপনা থেকে উনি জড়িত হতেন। উনি কাছে থাকলে আমার সেই বাধো-বাধো ভাবটা একেবারে মিলিয়ে যেত। মনে হত আমি ওঁর সমকক্ষ, আমার আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসের উচ্চ চূড়া থেকে সম্পূর্ণ বুঝতাম ওঁকে। আগে অদ্ভুত-ঠেকা সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠল। অপরের জন্য বাঁচা একমাত্র আনন্দ, কথাটা কেন উনি বলেছিলেন হৃদয়ঙ্গম হল, সম্পূর্ণ মেনে নিলাম কথাটি। দুজনে বরাবর

সুখে শান্তিতে থাকব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। বিদেশ যাত্রার, উচ্চ সমাজের চাকচিক্যের স্বপ্ন নয়, একেবারে বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার স্বপ্ন দেখতাম — গ্রামে সুখে শান্তিতে ভরা সংসার, সে জীবনে আত্মবিসর্জনের, পরস্পরের প্রতি অনুরাগের বিরাম হবে না, সে জীবনে থাকবে একটা অনুভূতি যে পরমেশ্বর মমতা-ভরা সহায়তায় দৃষ্টি রেখেছেন সবকিছুর ওপর।

পরিকল্পনামত জন্মদিনে ইউকারিষ্ট গ্রহণ করলাম। সেদিন গির্জা থেকে ফিরে অন্তরে এত অখণ্ড আনন্দ যে ভয় হল জীবনে, ভয় হল পাছে কিছুতে আমার আনন্দের হানি হয়। গাড়ি থেকে প্রবেশ-দ্বারে নেমেছি, পুলের ওপরে পরিচিত একটি গাড়ির খটখট শব্দ, দেখলাম সের্গেই মিখাইলিচকে। জন্মদিনের জন্য অভিনন্দন জানালেন আমাকে, দুজনে গেলাম বৈঠকখানায়। সে সকালটায় ওঁর সামনে এত ধীর ও আত্মস্থ লাগল, ওঁকে জানার পর সে রকমটা লাগেনি কখনো। মনে হল আমার ভিতরে এখন সম্পূর্ণ নতুন একটি পৃথিবী, সেটা জানেন না উনি, ওঁর পৃথিবীর চেয়ে মহান সেটা। ওঁর সান্নিধ্যে একটুও বিব্রত লাগল না। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন উনি, কেননা আমার সঙ্গে অত্যন্ত কোমল ও সম্ভ্রম-ভরা ব্যবহার করলেন। পিয়ানোর কাছে গেলাম, উনি কিন্তু পিয়ানোটা বন্ধ করে পকেটে রাখলেন চাবিটা।

বললেন, 'মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে আপনার অন্তরের সঙ্গীত পৃথিবীর যে কোন সঙ্গীতের চেয়ে ভালো।'

কৃতজ্ঞ বোধ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটু বিরক্ত লাগল; আমার অন্তরের সব কথা কেন জেনে ফেললেন এত সহজে, এত সঠিকভাবে; সেগুলো কারো কাছে ধরা পড়া উচিত নয়। খাবার খেতে খেতে উনি বললেন আমাকে শুভ জন্মদিন জানাতে এসেছেন, আর এসেছেন বিদায় নিতে, পরের দিন মস্কো চলে যাবেন। কথাটা বললেন কাতিয়ার দিকে চেয়ে, তারপর তাকালেন আমার দিকে, আমার মুখে উত্তেজনার ছাপ আসবে এই ওঁর ভয়, বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার অবাক বা বিচলিত লাগল না, এমন কি জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলাম না কতদিনের জন্য যাচ্ছেন। জানতাম চলে যাবার কথা বলবেন উনি, আর জানতাম উনি যাবেন না। কী করে

জানলাম? কেন, এখনো সেটা নিজেকে বোঝাতে পারি না, কিন্তু সেদিন আমি অনুভব করেছিলাম যে সবকিছু আমি জানি, যা ঘটেছে, যা ঘটবে, সবকিছু। অপরূপ একটি স্বপ্নের মধ্যে আছি যেন, মনে হয় যা ঘটেছে, ঘটেছে অনেকদিন আগে, সব আমার জানা বহুদিন আগে; সবকিছু ঘটবে আবার, ঘটবে যে আমি জানি।

খাবারের পর তক্ষুণি চলে যেতে চাইলেন উনি; কিন্তু প্রার্থনার পর ক্লান্ত হয়ে কাতিয়া শুয়ে পড়েছে, ও জাগা না পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওঁকে, বিদায় জানিয়ে যেতে হবে তো।

হলে বড্ডো বেশী আলো, দুজনে গেলাম বারান্দায়। বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি শান্তভাবে এমন সব জিনিসের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলাম যার ওপর আমার প্রেমের পরিণাম নির্ভর করছে। শুরু করলাম ঠিক বসার সঙ্গে সঙ্গে, এক মুহূর্ত আগে বা পরে নয়, তার আগে এমন কোন কথা হয়নি, এমন কোন বলার ঢং আমরা নিইনি, এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করিনি যাতে ওঁকে আমার বক্তব্য বাধা পেতে পারে। জানি না কোথা থেকে এল এত স্থৈর্য, এত দৃঢ় সঙ্কল্প, শব্দের এত সঠিক ব্যবহার। যেন বক্তা আমি নই, আমার ভিতরে আর একজন কে, আমার ইচ্ছাধীন সে নয়। রেলিং-এ হেলান দিয়ে আমার উল্টো দিকে বসেছিলেন উনি, লাইলাকের একটা ডাল টেনে নিয়ে পাতা ছিঁড়ছিলেন। আমি কথা শুরু করাতে ডালটা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে মাথা রাখলেন। যে ভাবে বসেছেন সেটা সম্পূর্ণ স্থৈর্যের চিহ্ন হতে পারে, হতে পারে প্রবল উত্তেজনার।

'কেন আপনি চলে যাচ্ছেন?' আস্তে আস্তে, কথা মেপে, সোজা ওঁর দিকে তাকিয়ে শুধালাম।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না উনি। একটু পরে চোখ নামিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'কাজ আছে।'

বুঝলাম আমার কাছে মিথ্যে বলাটা কত কঠিন ওঁর কাছে, বিশেষ করে যখন এত খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করেছি।

'আজকের দিনটা আমার কাছে কতখানি জানেন তো,' আমি বললাম। 'কয়েকটি কারণে দিনটা আমার কাছে দামী। আপনি কেন

যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করাটা শুধু লোক-দেখানো ব্যাপার নয়। আপনি তো জানেন, আপনাকে দেখা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, ভালোবাসি আপনাকে। আমি জিজ্ঞেস করছি, কেননা আমাকে জানতেই হবে। কেন চলে যাচ্ছেন আপনি?'

'যাবার সত্যিকার কারণটা আপনাকে বলা আমার পক্ষে শক্ত,' উনি জবাব দিলেন। 'এ সপ্তাহটা আপনাকে আর আমাকে নিয়ে বিস্তর ভেবেছি, আর ঠিক করেছি আমাকে যেতেই হবে। কেন জানেন? আর যদি আমাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।' কপাল রগড়ে চোখ বুজলেন উনি। 'আমার পক্ষে এটা কঠিন ... আর আপনি বোঝেন।'

বুক ঢিপঢিপ করতে শুরু করল।

'না, বুঝি না,' বললাম, 'বুঝি না আমি, তাই বলুন আপনি ... ভগবানের দোহাই বলুন, এ দিনটা আমার কাছে কত বড়ো, এদিনটার খাতিরে বলুন, সবকিছু শান্তভাবে শুনবো।'

নড়েচড়ে বসে উনি তাকালেন আমার দিকে, ডালটা তুলে নিলেন আবার।

'বেশ,' বলে মুহূর্তকাল ইতস্তত করে শুরু করলেন, গলাটা দৃঢ় শোনায় বৃথা চেষ্টা তাঁর। 'ভাষায় বলা বোকামি, বলা অসম্ভব, আর আমার পক্ষে কষ্টকর, তবু বোঝাবার চেষ্টা করবো।' শারীরিক যন্ত্রণায় যেন ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

'বলুন,' আমি বললাম।

'আচ্ছা ধরুন,' উনি বললেন, 'একটি লোক আছে, "ক" বলে ডাকা যাক তাকে, লোকটার অনেক বয়স হয়েছে, নিজের কালে দেখেছে শুনেছে সে। আর আছে একটি মেয়ে — "খ" বলে ডাকা যাক তাকে, মেয়েটির বয়স কম, হাসিখুশি মেয়েটি লোকজন বা সংসার সম্বন্ধে কিছু জানে না। পারিবারিক ঘটনাচক্রে লোকটি তাকে মেয়ের মতো ভালোবাসত, অন্যভাবে ভালোবাসবে সে আশঙ্কা হয়নি।'

থামলেন উনি। ওঁকে বাধা দিলাম না।

'কিন্তু "ক" ভুলে গিয়েছিল যে "খ"র বয়স কম — জীবনটা তার কাছে তখনো খেলার সামিল।' এবার উনি বলে চললেন তাড়াতাড়ি,

দৃঢ়ভাবে, আমার দিকে না তাকিয়ে। 'ভুলে গিয়েছিল ওকে অন্যভাবে ভালোবাসাটা সহজ ব্যাপার, কিন্তু সেটা ওর কাছে হবে খেলার সামিল। ভুল করল "ক", হঠাৎ বুঝল অন্য ধরনের অনুভূতি এসেছে মনে, অনুশোচনার মতো ব্যথা ভরা সেটা, ভয় পেল সে। ভয় হল দুজনের আগেকার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে, সেটা ঘটার আগেই চলে যেতে মনস্থ করল।' কথাটা বলে উনি চোখ রগড়ালেন এমনি যেন, তারপর চোখ বুজলেন আবার।

'অন্যভাবে ভালোবাসতে ভয় পেল কেন?' জিজ্ঞেস করলাম মৃদু স্বরে, উত্তেজনা চেপে রেখে শান্ত গলায়।

প্রশ্নটা বিদ্রূপের মতো শোনাল নিশ্চয়, কেননা ওঁর উত্তরে ব্যথার একটা আভাস যেন এল। 'আপনার বয়স কম, আমার বয়স হয়েছে। আপনি খেলতে চান, আমি চাই অন্য কিছু। খেলে যান আপনি, কিন্তু আমার সঙ্গে নয়, কেননা খেলাটা সত্যিকার বলে আমার ধারণা হতে পারে; তাতে ব্যথা পাব, আপনারো লজ্জা হবে ... এটা হল "ক"র কথা,' যোগ করলেন উনি, 'বাজে কথা সমস্ত অবশ্য, কিন্তু আমি কেন চলে যাচ্ছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়। এ নিয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই, দোহাই আপনার!'

'না, না! আরো কিছু বলা দরকার,' আমি বলে উঠলাম, কান্নায় কেঁপে উঠল গলা। 'সে ওকে ভালোবাসত, না বাসত না?'

জবাব দিলেন না উনি।

'ভালো না বাসলে কেন ওর সঙ্গে মিছিমিছি খেলা করেছিল, যেন ও কচি মেয়ে এমনভাবে?'

'হ্যাঁ, দোষ করেছিল "ক",' বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন উনি, 'কিন্তু সমাপ্তি হল সবকিছুর, ওদের ছাড়াছাড়ি হল ... বন্ধুভাবে।'

'কী ভয়ঙ্কর! আর কোনো সমাপ্তি নেই বুঝি?' প্রায় শোনা যায় না এমন ভাবে বললাম, ভয় পেলাম নিজের কথায়।

মুখ নড়ছিল ওঁর, মুখ থেকে হাত সরিয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, 'অন্য সমাপ্তি আছে অবশ্য। দুরকমের আছে। কিন্তু বাধা দেবেন না দোহাই আপনার, শান্ত হয়ে শুনুন।' দাঁড়িয়ে উঠে ক্লিষ্ট হাসি

হেসে আবার শুরু করলেন, 'কেউ কেউ বলে "ক"র মাথা খারাপ হয়ে গেল, পাগলের মতো প্রেমে পড়ল "খ"র, আর সেটা জানাল ওকে... আর "খ" শুধু হেসে উঠল। ব্যাপারটা ওর কাছে নিতান্ত মজার, কিন্তু "ক"র কাছে জীবনমরণের সামিল।'

চমকে উঠে বাধা দিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম আমার হয়ে কথা বলার কী অধিকার ওঁর, উনি আমার হাতে হাত রেখে বাধা দিলেন।

'দাঁড়ান,' গলা ওঁর কাঁপছে। 'আবার কেউ কেউ বলে মেয়েটির দয়া হল ওর ওপর। সংসার চেনে না, বেচারী ভাবল সত্যি বুঝি ওকে ভালোবাসা যায়, রাজী হল ওকে বিয়ে করতে। আর লোকটাও পাগল বলে বিশ্বাস করল, সত্যি বিশ্বাস করল যে ওর জীবন আবার শুরু হবে নতুনভাবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে মেয়েটি বুঝল লোকটিকে ঠকিয়েছে, আর সেও ঠকিয়েছে তাকে।... যাক, এ নিয়ে আর কথা বলব না,' উপসংহারে বললেন উনি; বোঝা গেল আর বলার ক্ষমতা নেই ওঁর, নিঃশব্দে পায়চারি শুরু করলেন আমার সামনে।

বললেন বটে, 'আর কথা বলবো না,' কিন্তু বুঝলাম আমি কী বলি শোনার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠায় আছেন। কিছু একটা বলতে গেলাম, কিন্তু ঢোঁক গিলতে কষ্ট হল। ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন, নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে। দুঃখ হল ওঁর ওপর। কষ্ট করে, হঠাৎ স্তব্ধতার ডোর ভেঙে কথা বলতে শুরু করলাম আবেগ-ভরা গলায়, ভয় হল যে কোনো মুহূর্তে গলা ধরে যাবে।

'আর তৃতীয় সমাপ্তিটা...' বলে থেমে গেলাম, উনি কিন্তু নির্বাক। 'তৃতীয় সমাপ্তিটা হল... লোকটি ভালোবাসত না ওকে, গভীর ব্যথা দিল ওর মনে, আর ঠিক করেছি ভেবে চলে গেল, কী কারণে যেন গর্ব ওর মনে। ব্যাপারটা আপনার কাছে মজার, আমার কাছে নয়; প্রথম থেকে ভালোবেসেছি আপনাকে, সত্যি ভালোবেসেছি,' আবার বললাম আমি, বলতে গিয়ে আমার আবেগ-ভরা মৃদু কণ্ঠে এল চিৎকার, এত তীব্র চিৎকার যে নিজেরি ভয় হল।

আমার সামনে বিবর্ণ মুখে উনি দাঁড়িয়ে রইলেন; ঠোঁট আরো কাঁপছে, দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে এল গালে।

'অত্যন্ত খারাপ করেছেন আপনি!' প্রায় চিৎকার করে রাগে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম। 'কেন করলেন?' চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

আমাকে যেতে দিলেন না উনি। কোলে মাথা রেখে আমার কম্পিত হাতে চুমু খেতে লাগলেন, হাত ভিজে গেল ওঁর চোখের জলে।

'হে ভগবান! যদি আগে জানতাম,' বললেন অস্ফুট কণ্ঠে।

'কেন করলেন? কেন?' জোরে বললাম বটে আবার, কিন্তু আমার বুক তখন সুখে ভরে গিয়েছে। চিরতরে বিদায় নিয়েছে সে সুখ, কখনো ফিরবে না আর।

মিনিট পাঁচেক পর সনিয়া দোতলায় ছুটে গেল কাতিয়ার কাছে, চিৎকার করে সমস্ত বাড়িকে জানিয়ে দিল যে মাশা সের্গেই মিখাইলিচকে বিয়ে করতে চায়।

৫

বিয়ে পিছিয়ে দেবার কোনো কারণ ছিল না, উনি বা আমি কেউ চাই না সেটা। কাতিয়ার অবশ্য ইচ্ছে যে মস্কোয় গিয়ে আমার জন্য গয়নাগাটি আর বধূর সজ্জার ফরমায়েস করা, আর ওঁর মায়ের সাধ যে সের্গেই মিখাইলিচ নতুন একটা গাড়ি আর আসবাবপত্র কিনুক বিয়ের আগে, বাড়ির দেয়ালে নতুন করে কাগজ লাগানো হোক; কিন্তু আমরা দুজনে জোর করে বললাম যদি ও সব করা আবশ্যক মনে করেন তাহলে পরে করলে চলবে; আমার জন্মদিনের দু সপ্তাহ পরে বিয়েটা হয়ে যাক, হৈচৈ-র দরকার নেই, দরকার নেই গয়নাগাটি আর বধূর সজ্জার, কনের সখি বা মিতবরের, বিবাহ ভোজ বা শ্যাম্পেনের, কিম্বা বিয়ের গতানুগতিক অনুষ্ঠানের অন্য সব। বিয়েতে না হবে গানবাজনা, স্তূপাকারে থাকবে না তোরঙ্গ, না হবে বাড়ির ভোল ফেরানো, মা তাই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, সের্গেই মিখাইলিচ বললেন আমাকে — ব্যাপারটা মোটেই তাঁর বিয়ের মতো হচ্ছে না, তিরিশ হাজার রুবল খরচা হয়েছিল সে বিয়েতে। সের্গেই মিখাইলিচ আরো জানালেন, গুদামঘরে রাখা বাক্সপেঁটরা ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ওঁর মা, গালিচা, পর্দা আর ট্রে নিয়ে গোপন মন্ত্রণা চলেছে মারিয়ুশ্‌কার সঙ্গে, ও সব জিনিস তো আমাদের সুখের জন্য অপরিহার্য।

আমাদের বাড়িতে একই ব্যাপার চলেছে কাতিয়া আর আমাদের বুড়ী আয়া কুর্জমিনিশ্‌নার মধ্যে। এ নিয়ে কাতিয়ার সঙ্গে ইয়ার্কি করা অসম্ভব। ওর বদ্ধ ধারণা, ভবিষ্যতের বিষয়ে আমাদের দুজনের আলাপ শুধু সোহাগপনা, তুচ্ছ সব জিনিস নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা — আমাদের অবস্থার লোকের কাছে আর কী বা আশা করা যায়: আমাদের সত্যিকারের সুখ তো নির্ভর করে সেমিজের সঠিক কাট আর সেলাই-এর ওপর, টেবিলের চাদরে আর ন্যাপকিনে ঠিক পাড় বসানোর ওপর। বিয়ের উদ্যোগ নিয়ে এ বাড়ি ও বাড়িতে দিনে কয়েকবার গুপ্ত কথার আদানপ্রদান চলল; বাইরে থেকে কাতিয়া আর ওঁর মা, তাতিয়ানা সেমিওনভনার সম্পর্কটা অত্যন্ত মধুর, কিন্তু তখনি কিছুটা শত্রুতা আর সূক্ষ্ম কূটনীতির আভাস ধরা পড়েছে।

আরো ভালো করে চিনলাম তাতিয়ানা সেমিওনভনাকে, পরিপাটি কড়া গৃহিণী — যে যুগের মহিলা তিনি সে যুগ বিগত। সের্গেই মিখাইলিচ ভালোবাসতেন তাঁকে, সন্তানের কর্তব্যবোধের তাগিদে শুধু নয়, উনি ভাবতেন ওঁর মা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সহৃদয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ও স্নেহপ্রবণ মহিলা। তিনি বরাবর আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে আমার সঙ্গে, ছেলে বিয়ে করছে বলে তিনি খুশি। তবু ছেলের বাগদত্তা হিসেবে ওঁর সঙ্গে দেখা করে মনে হল উনি আমাকে বোঝাতে চান যে ছেলে ইচ্ছে করলে আরো ভালো পাত্রী জুটত, সে কথাটা আমার ভুলে যাওয়া অনুচিত হবে। পুরোপুরি বুঝলাম ওঁকে, ওঁর সঙ্গে একমত হলাম।

সেই দুটো সপ্তাহে রোজ দেখা হত সের্গেই মিখাইলিচের সঙ্গে। দুপুরবেলায় আসতেন উনি, থাকতেন মাঝরাত পর্যন্ত। বলতেন বটে আমাকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব ওঁর পক্ষে (সত্যি বলছেন সেটা জানতাম), তবু আমার সঙ্গে কখনো সারা দিন কাটাতেন না, আগেকার মতো নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করতেন। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাইরে থেকে, কোনো পরিবর্তন এল না আমাদের সম্পর্কে; 'আপনি' বলে সম্বোধন করতাম পরস্পরকে, হাতে চুমো খেতেন না উনি কখনো, আমার সঙ্গে নিরালায় থাকার সুযোগ খোঁজা দূরের কথা সে

সব সুযোগ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। যে স্নেহের উচ্ছ্বাস ওঁর অন্তরে, তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াতে যেন ওঁর ভয়, সেটাকে যেন খারাপ মনে করেন উনি। জানি না, কে বদলে গিয়েছিল, উনি না আমি, কিন্তু এখন নিজেকে মনে হল একেবারে ওঁর সমকক্ষ। ওঁর মধ্যে সেই সারল্য, যেটাকে কষ্টকৃত মনে হত আমার, চোখে আর পড়ত না; সামনের লোকটি সুখে বিভোর শিশুর মতো; ভয়ভক্তি আর সমীহ উদ্রেক করা পুরুষ নন, দেখে মাঝে মাঝে ভয়ানক ভালো লাগে।

তাহলে সত্যিকারের উনি হচ্ছেন এই, ভাবলাম আমি। ঠিক আমার মতো মানুষ, বেশী কিছু নন। মনে হল ওঁকে চেনার কিছু বাকি নেই, তন্নতন্ন করে চিনেছি ওঁকে। আর ওঁর যা কিছু জানলাম সব সুন্দর, আমার মনের মতো। এমন কি আমাদের সংসারযাত্রার বিষয়ে ওঁর জল্পনাকল্পনাগুলো অবিকল আমার মতো, শুধু সেগুলো আরো স্পষ্ট, সেগুলোকে আরো গুছিয়ে প্রকাশ করেন উনি।

আবহাওয়া খারাপ, বেশীর ভাগ সময় কাটত ঘরে বসে। আমাদের সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আলোচনা হত ড্রয়িং-রুমে, পিয়ানো আর জানলার মধ্যেকার জায়গাটায় বসে। জানলার কালো শার্সিতে প্রদীপ শিখার আলো, কখনো-সখনো বৃষ্টি বিন্দু চকচকে কাঁচে ঘা খেয়ে গড়িয়ে পড়ত। ছাতে বৃষ্টিধারার শব্দ, নালির নিচে জলের কলকলধ্বনি, শার্সি চুঁইয়ে আসত স্যাঁৎসেঁতে ভাব; আর এ সবকিছুর জন্য মনে হত আমাদের জায়গাটা আরো আরামের, আরো উজ্জ্বল, আরো হাসিখুশি।

একদিন সন্ধ্যে শেষ হতে চলেছে, আমাদের কোণটায় বসে আছি দুজনে, উনি শুরু করলেন, 'অনেকদিন ধরে একটা কথা আপনাকে বলবো ভাবছি। আপনি বাজাচ্ছিলেন, আর কথাটা খালি ভাবছিলাম।'

'থাক, কিছু বলার দরকার নেই, আপনি না বললেও সব জানি,' আমি জবাব দিলাম।

স্মিত হেসে উনি বললেন, 'তা ঠিক। বলবো না তাহলে।'

'না, বলুন, কথাটা কী?'

'বেশ, তাহলে বলি। "ক" আর "খ"র কথাটা বলেছিলাম, মনে আছে?'

'ও রকম ডাহা বোকামি কী করে ভুলবো বলুন? ব্যাপারটা যে এইভাবে শেষ হয়েছে, ভালোয় ভালোয়...'

'হ্যাঁ, আর একটু ওদিক হলে নিজের সুখ নিজে নষ্ট করে ফেলতাম একেবারে। আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তখন সত্যি কথা বলিনি, আর তাই আমার অস্বস্তি। শেষ পর্যন্ত বলি, শুনুন।'

'থাক, থাক, দরকার নেই।'

হেসে উনি বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। শুধু কথাটা খুলে বলা চাই। বলতে শুরু করে সবকিছু যুক্তিতর্ক করে দেখতে চেয়েছিলাম।'

'যুক্তিতর্কে লাভটা কী?' জিজ্ঞেস করলাম। 'ওর কোন দরকার নেই কখনো।'

'তা বটে। যুক্তিটাও ঠিক মতো করিনি। জীবনে অনেক ভুল, অনেক হতাশার পর গ্রীষ্মকালে যখন এখানে এলাম, নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে আমার পক্ষে ভালোবাসা অসম্ভব, সব ফুরিয়ে গেছে আমার, শুধু আছে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা; এত দৃঢ় ভাবে নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে অনেকদিন পর্যন্ত আপনার সম্বন্ধে আমার মনের গতিকটা খেয়াল করিনি, বুঝতে পারিনি পরিণামটা কী দাঁড়াবে। আশা ছাড়িনি, এক একবার ভাবতাম আপনি বুঝি মন ভোলাতে চাইছেন; আবার বিশ্বাস হত আপনার আন্তরিকতায়, ভেবে পেতাম না কী করবো। কিন্তু সে রাত্তিরটার পর, ওই যেদিন দুজনে বাগানে বেড়িয়েছিলাম, ভয় হল। সুখের সম্ভারটা মনে হল আশার অতীত, সত্যি বলতে অসম্ভব। আশা করে থাকি যদি, আর নিরাশ হই, তাহলে কী হবে? শুধু নিজের কথাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, অত্যন্ত স্বার্থপর লোক তো বটে।'

আমার দিকে তাকিয়ে থামলেন উনি।

'তবু তখন যা বলেছিলাম তার সবটাই বাজে নয়। ভয়ের কারণ ছিল, ভয় পাওয়া উচিত ছিল আমার। আপনার কাছ থেকে কত না আদায় করি, প্রতিদানের ক্ষমতা কতটুকু আমার। আপনি এখনো ছেলেমানুষ, সদ্য ফুটন্ত ফুলের কুঁড়ির মতো। এই প্রথম আপনি ভালোবেসেছেন, আর আমি...'

'সত্যি বলুন তো, আপনি কি...' কথাটা শুরু করে ভয় হল উত্তরে কী বলবেন উনি। 'না থাক, কিছু বলতে হবে না,' যোগ করলাম।

'আগে কখনো প্রেমে পড়েছি কি না? এই তো?'

চট করে আঁচ করে নিলেন উনি।

'সে কথা আপনাকে বলতে পারি। না, ভালোবাসিনি। এখনকার মতো অনুভূতি আগে কখনো হয়নি...' হঠাৎ কী একটা ব্যথা-ভরা স্মৃতি ঝলকিয়ে উঠল মুখভাবে। 'আপনাকে ভালোবাসার অধিকার পাবার আগে জানা দরকার ছিল যে আপনার হৃদয় আমার,' বললেন বিষণ্ণভাবে। 'তাই আপনাকে ভালোবাসি বলার আগে ভেবেচিন্তে নেওয়াটা আবশ্যক ছিল, নয় কি? কী দিতে পারি আপনাকে? ভালোবাসা শুধু।'

'সেটা কি সামান্য জিনিস?' ওঁর চোখে চোখ রেখে শুধালাম।

জবাবে উনি বললেন, 'সেটা সব নয়, আপনার পক্ষে সব নয়। আপনার রূপ আছে, আছে যৌবন। মাঝে মাঝে আজকাল রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না, এত সুখী আমি; দুজনের জীবনযাত্রার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবি। অনেকদিন বেঁচেছি আমি, মনে হয় সুখী হতে হলে যা চাই তা পেয়েছি — গ্রামের শান্ত বিজনে জীবনযাপন, অন্যদের ভালো করার সুযোগ — যারা ভালোর স্বাদ পায়নি তাদের ভালো করা কত না সহজ; তাছাড়া কাজ, কাজের মতো কাজ, অবসর, প্রকৃতি, বই, গানবাজনা, আপন জনের প্রতি অনুরাগ — এই তো হল সুখ, এর চেয়ে বেশী কিছু আমার কল্পনার বাইরে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, আপনার মতো সঙ্গী; ছেলেপুলে হবে হয়ত — ব্যস, এর বেশী মানুষে আর কী আশা করতে পারে।'

'তা ঠিক,' সায় দিয়ে বললাম।

'আমার পক্ষে, আমার তো যৌবন পেরিয়ে গিয়েছে,' বলে চললেন উনি। 'কিন্তু আপনার পক্ষে নয়। আপনি এখনো জীবন দেখেননি। অন্য কিছুতে সুখের সন্ধান আপনি হয়ত করবেন, তাতে সুখ মিলবে হয়ত। আমাকে ভালোবাসেন বলে এখন আপনার মনে হচ্ছে এটাই সুখ।'

'না, শান্ত পারিবারিক জীবন বরাবর আমার পছন্দ, বরাবর তাই চেয়েছি,' আমি বললাম। 'আপনি শুধু আমার মনের কথা বলছেন।'

অল্প হাসলেন উনি।

'সেটা আপনার মনে হচ্ছে শুধু। এটা আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আপনার রূপ আছে, আছে যৌবন,' কী যেন ভাবতে ভাবতে আবার বললেন উনি।

আমাকে বিশ্বাস করছেন না, রূপ আর যৌবন আছে বলে ভর্ৎসনা করছেন যেন, বিরক্ত লাগল।

রেগে বললাম, 'তাহলে আমাকে ভালোবাসেন কেন? যৌবনের জন্যে, না আমি যা তাই বলে?'

'জানি না কেন, কিন্তু ভালোবাসি,' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একাগ্র, বশ-মানানো সে দৃষ্টি।

উত্তরে কিছু বললাম না আমি, শুধু ওঁর চোখে চোখ রাখলাম। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল হঠাৎ — প্রথমে চারপাশের জিনিস আর পড়ল না দৃষ্টিপটে, তারপর ওঁর মুখ মিলিয়ে গেল, শুধু দেখা গেল দীপ্ত চোখদুটো, আমার চোখের খুব কাছে; তারপর ওঁর চোখ আমার ভিতরে প্রবেশ করল, আর সবকিছু কালো হয়ে গেল, আর কিছু চোখে পড়ছে না, — ওঁর চাউনিতে যে আনন্দ, যে ভয় মনে জাগছে সেটা কাটাবার জন্য শক্ত করে চোখ বুজতে হল আমাকে...

বিয়ের আগের দিন আকাশ পরিষ্কার হল। গ্রীষ্মের বৃষ্টির জায়গায় এল হেমন্তের প্রথম হিম ঝকঝকে সন্ধ্যা। সবকিছু ভিজে ঠান্ডা আর স্বচ্ছ, বাগানে হেমন্তের প্রথম ছাপ — উদার রঙবেরঙ আর রিক্ত সে রূপ। আকাশ পরিষ্কার, ঠান্ডা আর পান্ডুর। কালকে, আমাদের বিয়ের দিনে আবহাওয়াটা সুন্দর হবে, এই ভেবে খুশি মনে ঘুমোতে গেলাম।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙল, আজই বিয়ে ভেবে অবাক লাগল, ভয় হল। বাগানে গেলাম। সবেমাত্র সূর্য উঠেছে, লাইম গাছগুলোর পাতলা হয়ে আসা পীতাভ ডালের মধ্য দিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোর

জোয়ার। খসখসে পাতায় পথটা ঢাকা। রোয়ান ঝোপের শাখায় শাখায় কুঞ্চিত ফলগুলির আরক্তিম ঝলক, অবশিষ্ট পাতাগুলো হিমে মৃত, বেঁকে গিয়েছে। শুকিয়ে কালো হয়ে ঝুলছে ডালিয়াগুলো। ফিকে সবুজ ঘাস আর বাড়ির কাছের পায়ে-দলা বার্ডকে এই প্রথম ঘনীভূত শিশিরের রূপালি আভাস। স্বচ্ছ হিম আকাশে মেঘ নেই একটাও, থাকবে কেমন করে?

"তাহলে সত্যি আজ?" শুধালাম নিজেকে, নিজের সুখে বিশ্বাস হল না।

"তাহলে কাল আমার ঘুম ভাঙবে না এখানে, ঘুম ভাঙবে নিকলস্কয়ের ওই থামওয়ালা অদ্ভুত বাড়িটাতে? আর কখনো ওঁর অপেক্ষায় থাকবো না, দেখা করতে যাবো না ওঁর সঙ্গে, রাত্রে ওঁকে নিয়ে কাতিয়ার সঙ্গে কথা আর হবে না? আমাদের ড্রয়িং-রুমে ওঁকে পাশে নিয়ে পিয়ানোয় বসবো না কখনো? তারপর ওঁকে এগিয়ে দেওয়া, অন্ধকার রাত্রে কী করে যাবেন তা নিয়ে উৎকণ্ঠা?" তারপর মনে পড়ল কাল উনি বলেছিলেন শেষবারের মতো এসেছেন এখানে, কাতিয়া বিয়ের সাজটা আমাকে পরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'কাল পর্যন্ত বিদায়।' বিশ্বাস ফিরে এল নিমেষের জন্য, তারপর সন্দেহ হল আবার। "সত্যি কি আজ থেকে শাশুড়ীর সঙ্গে থাকবো, সঙ্গে থাকবে না নাদেজ্দা, বুড়ো গ্রিগরি, কাতিয়া? বুড়ী আয়াকে রাত্রে চুমো খাবো না আর, আমার ওপরে ক্রুশ-চিহ্ন করতে করতে বরাবরকার মতো ওর কথা — 'তাহলে আসি দিদিমণি,' কানে আসবে না? পড়াবো না সনিয়াকে, খেলবো না ওর সঙ্গে, সকালে দেয়ালে টোকা দিয়ে শুনবো না ওর খিলখিল হাসি? সত্যি কি নিজের কাছে আজ থেকে অচেনা হয়ে যাবো, শুরু হবে নতুন জীবন, সার্থক হবে আমার সমস্ত আশা আর স্বপ্ন? নতুন জীবন কি বরাবর টিকবে?"

অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করলাম, কখন সের্গেই মিখাইলিচ আসবেন; নিজের ভাবনা নিয়ে একলা থাকা দুঃসহ। ওঁর আসতে দেরী হল না, আর তখুনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল যে আজ থেকে ওঁর স্ত্রী হব আমি; শুধু তখুনি চিন্তাটায় ভীতি কেটে গেল আমার।

দুপুরের খাবারের আগে বাবার উপলক্ষে প্রার্থনার জন্য গির্জায় গেলাম আমরা।

"বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন!" ওঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন যিনি তাঁর হাতে শান্তভাবে হাত রেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম। প্রার্থনার সময়ে এত নিচুতে মাথা নুইয়েছিলাম যে গির্জার মেঝের ঠাণ্ডা পাথর লেগেছিল কপালে, এত স্পষ্টভাবে বাবাকে দেখেছিলাম, এত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ওঁর আত্মা বুঝেছে আমার অন্তরকে আর আমার পছন্দকে আশীর্বাদ করেছেন উনি, মনে হল আমাদের ওপরে ওঁর আত্মা তখনো বিদ্যমান, মনে হল কানে আসছে ওঁর আশীর্বাদবাণী। স্মৃতি আর আশা, আনন্দ আর বিষাদ মিশে একটি গম্ভীর প্রীতিকর একান্ত ভাবাবেগ হল, সে আবেগ এক সুরে বাঁধা আজকের নিস্পন্দ, ঝরঝরে আবহাওয়ার সঙ্গে, আজকের এই নিঃশব্দতা, রিক্ত মাঠ আর পাণ্ডুর আকাশের সঙ্গে; আকাশ থেকে দীপ্ত আলো ঝরছে সবকিছুর উপর, রোদ কিন্তু কড়া নয়, মুখে জ্বালা ধরিয়ে দেয় না। মনে হল পাশের মানুষটি বুঝেছে আমার ভাবাবেগ, সাড়া দিচ্ছে তাতে। কোনো কথা না বলে উনি শান্তভাবে হাঁটছেন, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি ওঁর দিকে, মুখে সেই একই আনন্দ-বিষাদ মেশানো গম্ভীর আবেগের ছাপ, যে আবেগ আমার অন্তরে আর বহিঃপ্রকৃতিতে।

হঠাৎ উনি ঘুরলেন আমার দিকে, বুঝলাম কিছু একটা বলতে যাচ্ছেন। হঠাৎ মনে হল, "আমি যা ভাবছি যদি সে কথা না বলে বলেন অন্য কিছু?" কিন্তু বাবার নামোল্লেখ না করে তাঁরি কথা বললেন:

'একবার উনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "আমার মাশাকে বিয়ে কোরো!"'

'বেঁচে থাকলে ওঁর কত না আনন্দ হত!' ওঁর হাতে চাপ দিয়ে বললাম।

'হ্যাঁ, আপনি তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলেন,' আমার চোখে চোখ রেখে উনি বলে চললেন। 'তখন আপনার চোখে চুমো খেতাম, চোখদুটো ঠিক ওঁর মতো ছিল বলে ভালো লাগত শুধু; কখনো ভাবিনি নিজের গুণে চোখদুটো আমার এত আদরের হয়ে উঠবে। তখনি আপনাকে মাশা বলে ডাকতাম।'

'এখন "তুমি" বলে ডাকুন।'

'ডাকতে যাচ্ছিলাম তাই বলে; শুধু এখনি মনে হচ্ছে তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার,' উনি বললেন, সুখে-ভরা ওঁর প্রশান্ত দৃষ্টি আমাতে নিবদ্ধ।

দলিত ফসল-কাটা ক্ষেত হয়ে পায়ে-না-চলা পথ দিয়ে দুজনে চললাম, শুধু আমাদের পদধ্বনি আর কণ্ঠস্বর, আর কোনো শব্দ নেই। এক দিকে, খাদ হয়ে বাদামি ফসল-কাটা ক্ষেত দূরের একটা রিক্ত কুঞ্জে গিয়ে পড়েছে, কাঠের লাঙল দিয়ে একটি চাষী নিঃশব্দে মাঠে কালো ফালি আঁকছে, ফালিটার আয়তন বাড়ছে ক্রমশ। পাহাড়ের নিচে এদিকে সেদিকে চরা ঘোড়ার পালকে মনে হচ্ছে খুব কাছে। অন্য দিকটায় মাঠ চষা হয়েছে বাগান আর আমাদের বাড়ি পর্যন্ত, বীজ বোনা হয়েছে, বাগান পেরিয়ে বাড়িটা চোখে পড়ে। বরফ-গলা মাটি কালো, কিন্তু এখানে-সেখানে শীতের গমের সবজে চারা দেখা দিতে শুরু করেছে। সবকিছুর ওপরে ঠাণ্ডা সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি, সবকিছুর ওপর মাকড়সা জাল বিছিয়েছে। আমাদের চারিদিকে হাওয়ায় ভাসছে উর্ণনাভ, লাগছে ঠাণ্ডায় ইতিমধ্যে শুকিয়ে যাওয়া শস্যের নাড়ায়। চুলে আর চোখে লাগছে, আটকে যাচ্ছে জামাকাপড়ে। কথা বললে সে শব্দ হাওয়ায় নিস্পন্দ হয়ে রইছে, যেন সারা পৃথিবীতে শুধু আমরা দুজনে — আমরা একা নীল আকাশমণ্ডলের নিচে, সেখানে স্পন্দমান দীপ্ত সূর্য হিম তাপ ছড়াচ্ছে।

ইচ্ছে হল ওঁকে 'তুমি' বলে ডাকি, কিন্তু লজ্জা পেলাম।

'এত তাড়াতাড়ি কেন হাঁটছ?' তাড়াতাড়ি প্রায় ফিসফিসিয়ে বললাম, আপনা থেকে মুখ লাল হয়ে উঠল।

গতিবেগ কমিয়ে আরো স্নেহে তাকালেন আমার দিকে, মুখে আরো সুখের আর আনন্দের ছাপ।

বাড়ি ফিরে দেখলাম সের্গেই মিখাইলিচের মা ও যাঁদের নিমন্ত্রণ না করে পারিনি তাঁরা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। তাই গির্জা ছেড়ে নিকলস্কয়েতে যাবার জন্য গাড়িতে না চাপা পর্যন্ত আর একলা পাইনি ওঁকে।

গির্জা প্রায় ফাঁকা। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম ওঁর মা গায়কদের জায়গার কাছে পাতা একটা কম্বলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন খাড়া হয়ে, লালচে-বেগুনি রিবন লাগানো টুপি মাথায় কাতিয়া, গালদুটো অশ্রুসিক্ত, দু তিনজন চাকর কৌতূহল ভরে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ওঁর দিকে চাইলাম না, আমার পাশে ওঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। প্রার্থনার বাক্যগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনে আবৃত্তি করলাম, কিন্তু অন্তরে কোন সাড়া জাগল না। প্রার্থনা এল না, বিরস চোখে আইকন, মোমবাতি, পাদ্রীর আলখাল্লার পিঠে আঁকা ক্রুশ, আইকনস্থান আর জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম, মাথায় ঢুকল না কিছু। শুধু মনে হল আমাকে ঘিরে কী একটা অনুষ্ঠান চলেছে, সেটা মামুলি নয়। তারপর ক্রুশ হাতে পাদ্রী ঘুরে দাঁড়ালেন আমাদের দিকে। অভিনন্দন করলেন আমাদের, মনে পড়িয়ে দিলেন যে আমার নামকরণ হয়েছিল তাঁরি দ্বারা, আর এখন ঈশ্বরের কৃপায় বিয়েটা হল তাঁরি হাতে। আমাকে চুমো খেল কাতিয়া আর সের্গেই মিখাইলিচের মা, শুনলাম গ্রিগরি গাড়ি ডাকছে। অবাক লাগল, ভয় হল, সবকিছু তাহলে শেষ অথচ আমাকে নিয়ে যে অদ্ভুত অনুষ্ঠানটা হল তাতে আমার অন্তরে অসাধারণ কোন সাড়া জাগেনি। উনি আমাকে চুমো খেলেন, আর আমি ওঁকে; চুম্বনটা কী অদ্ভুত, আমাদের কাছে কত বিজাতীয়! "তাহলে এ-ই সব," মনে মনে বললাম।

প্রবেশ-দ্বারে আমরা গেলাম, গির্জার খিলানের নিচে গাড়ির চাকার মুখর ধ্বনি, মুখে লাগল তাজা হাওয়ার ঝলক। টুপিটা পরে উনি আমার হাত ধরে গাড়িতে তুললেন। জানলা থেকে চোখে পড়ল হিম চাঁদ, চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল। পাশে বসে দরজাটা উনি বন্ধ করে দিলেন। কেন জানি না আমার বুক মুচড়িয়ে উঠল। যে রকম স্থিরভাবে দরজা উনি বন্ধ করলেন সেটা প্রায় অপমানকর লাগল। কানে এল কাতিয়া ডেকে বলছে মাথা ঢাকা দিতে, পাথরের ওপর চাকার ঘর্ঘর, তারপর কাঁচা রাস্তা, আমাদের যাত্রা হল শুরু। একটা কোণে আড়ষ্ট হয়ে সরে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম দূরের দীপ্ত মাঠঘাটের দিকে, ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নালোকে ক্রমশ দূরে সরে-যাওয়া পথটির দিকে। ওঁর দিকে চাইলাম

না, কিন্তু পাশে ওঁর সান্নিধ্য অনুভব করলাম। "তাহলে যে মুহূর্তটি নিয়ে আমার এত প্রত্যাশা সে মুহূর্তে শুধু এই পেলাম," ভাবলাম আমি, আর ওঁর এত কাছে একা বসে থাকাটা কেন যেন লজ্জাকর, অপমানকর মনে হল। ওঁর দিকে ঘুরে কিছু একটা বলতে চাইলাম, কিন্তু কথা এল না মুখে; যেন ওঁর প্রতি আমার আগেকার কোমল সব অনুভূতি বিদায় নিয়েছে, তার জায়গায় এসেছে অপমান আর ভীতির বোধ।

'এ যে সম্ভব, এ মুহূর্তটির আগে পর্যন্ত ভাবতে পারিনি,' আমার দৃষ্টিতে সাড়া দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন উনি।

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন জানি না আমার ভয় করছে,' আমি বললাম।

'আমাকে ভয় করছে নাকি, মণি?' জিজ্ঞেস করলেন উনি, হাতটা নিয়ে সেদিকে মাথা নোওয়ালেন।

হাতটা অসাড় পড়ে রইল ওঁর হাতে, অন্তরে কোনো অনুভূতি নেই।

অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল, কেঁপে উঠল হাতটা, আঁকড়ে ধরলাম ওঁর হাত। গরম লাগছে, আবছা আলোয় তাকালাম ওঁর চোখে। তখুনি বুঝলাম যে ওঁকে ভয় পাইনি — এ ভয়টা হল ভালোবাসা — সে ভালোবাসা নতুন, আগেকার চেয়ে কোমল আর প্রবল। মনে হল আমার সর্বস্ব ওঁর, আমার ওপর ওঁর প্রভুত্বে সুখী লাগল।

দ্বিতীয় খণ্ড

৬

দিনের পর দিন কাটল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ; গ্রামের শান্তিতে কেটে গেল দুটো মাস, কাটল অলক্ষিতে, তখন মনে হয়েছিল তাই। আর সে দুটো মাসের অনুরাগ উত্তেজনা আর আনন্দ সারা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারত। গ্রামে আমাদের জীবনযাত্রার বিষয়ে দুজনের নানা স্বপ্ন অন্যভাবে রূপ নিল, যা ভেবেছিলাম সেভাবে মোটেই নয় বটে কিন্তু স্বপ্নের তুলনায় খারাপভাবে নয়। সত্যি বটে, বাগদত্তা হিসেবে যেমনটা

ধরে নিয়েছিলাম তেমন কঠোর পরিশ্রমের, আত্মত্যাগের আর পরার্থে জীবন নয়। বরং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার, আর ভালোবাসা পাবার একটা স্বার্থপর বোধ ছিল — অকারণ, অবিরাম সুখের উচ্ছ্বাস, পৃথিবীর আর সবকিছু খালি ভুলে যাওয়া। পড়ার ঘরে অবশ্য মাঝে মাঝে গিয়ে উনি কিছু একটা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। কখনো-সখনো কাজে যেতেন শহরে, জমিদারীতে ঘুরতেন। কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাওয়া কত কঠিন ওঁর কাছে জানতে বাকি রইত না। আর উনি নিজে স্বীকার করতেন আমাকে ছাড়া পৃথিবী কত অর্থহীন ঠেকে ওঁর কাছে, ও সব কাজে ব্যস্ত হওয়া কী করে সম্ভব ভেবে পান না। আমারো তাই লাগত। পড়তাম বটে, গানবাজনা, শাশুড়ি আর স্কুলে যথাবিধি সময় দিতাম, কিন্তু এ সবকিছু করতাম তাদের সঙ্গে ওঁর কিছু যোগসূত্র আছে বলে, ওঁর তারিফ পাবার জন্য। ওঁর কথা মনে হয় না এমন কোনো কাজে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ একেবারে লোপ পেত, ওঁকে ছাড়া পৃথিবীতে যে আর কিছু থাকতে পারে সেটা মজার ব্যাপার। তুচ্ছ, স্বার্থপর অনুভূতি হয়ত, কিন্তু সুখী লাগত নিজেকে, মনে হত গোটা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে উঠেছি। আমার কাছে উনি ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, ওঁর মতো সুন্দর অভ্রান্ত মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। আমি যে বেঁচে আছি তা ওঁরি জন্য, আমাকে যে ধরনের মানুষ ভাবেন ঠিক তাই হবার জন্য। উনি ভাবতেন জগতের সবচেয়ে সুন্দর আর ভালো মেয়ে আমি, আমার গুণের আর অন্ত নেই, আর জগতের সবচেয়ে সুন্দর আর ভালো লোকটির খাতিরে ঠিক তেমনটি হবার চেষ্টা করতাম।

প্রার্থনা করছি একদিন, উনি ঘরে ঢুকলেন। একবার ওঁর দিকে চেয়ে প্রার্থনা করে চললাম। টেবিলে বসে একটা বই খুললেন, যাতে আমার বাধা না পড়ে। কিন্তু বুঝলাম উনি চেয়ে আছেন আমার দিকে, ফিরে তাকালাম। অল্প হাসলেন উনি, আর আমি জোরে হেসে উঠলাম। আর প্রার্থনা করা চলল না।

‘তোমার প্রার্থনা শেষ হয়ে গিয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘হ্যাঁ। তোমাকে বাধা দিতে চাই না। চলে যাচ্ছি।’

‘প্রার্থনা করবে নাকি?’

উত্তর দিলেন না উনি, বেরিয়ে যেতেন হয়ত, কিন্তু আমি বাধা দিলাম।

'দাঁড়াও তো লক্ষ্মীটি, আমার খাতিরে না হয় একসঙ্গে প্রার্থনা করলে।'

আমার পাশে দাঁড়িয়ে, হাতদুটো কেমন বিদঘুটেভাবে জুড়ে শুরু করলেন উনি। মুখখানা গম্ভীর, কথাগুলো আটকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অনুমোদন ও সাহায্যের প্রত্যাশায় ঘুরে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। ওঁর শেষ হলে হেসে ওঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

লাল হয়ে উঠলেন উনি, হাতে চুমো খেয়ে বললেন, 'নাঃ, তুমি আর বদলাবে না দেখছি! তোমাকে দেখলেই নিজের বয়স বছর দশেক কমে যায়।'

পরস্পরকে ভালোবেসে, সমীহ করে কয়েক পুরুষ থেকেছে, আমাদের গাঁয়ের পুরনো বাড়িটা হল সে রকম। সবকিছুতে পারিবারিক স্মৃতির সুন্দর শুদ্ধ ছাপ, ওখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো যেন আমার নিজের স্মৃতি হয়ে গেল। বাড়িটা সাজিয়েছিলেন তাতিয়ানা সেমিওনভনা, সেকেলে রীতিতে তিনি চালাতেন সংসার। সমস্তটা যে সুন্দর আর সুষ্ঠু সেটা বলা অবশ্য শক্ত, কিন্তু সমস্ত কিছুর ছড়াছড়ি — চাকরবাকর, আসবাবপত্র, খাবারদাবার, আর সবকিছু টেকসই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সঠিক, দেখলে সম্ভ্রম হয়। বৈঠকখানার আসবাবপত্র সুসমঞ্জসভাবে সাজানো, দেয়ালে মানুষের ছবি, মেঝেতে বাড়ির তৈরী গালিচা আর কম্বল। হলে পুরোনো একটা পিয়ানো, আলাদা আলাদা ধরনের আলমারি, সোফা, আর গিলটি আর কারুকার্য করা টেবিল। সবচেয়ে ভালো আসবাবপত্র আমার ঘরে, সেটা নিজে কষ্ট করে সাজিয়েছিলেন তাতিয়ানা সেমিওনভনা। ভিন্ন ভিন্ন যুগের, ভিন্ন ভিন্ন রীতির আসবাব, বড় ফ্রেমের পুরোনো একটা আয়না; প্রথম প্রথম তাতে মুখ দেখতে লজ্জা হত, পরে সেটা আমার খুব প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়, পুরনো বন্ধুর মতো।

কখনো চড়া গলায় কথা বলতেন না তাতিয়ানা সেমিওনভনা, তবু চাকরবাকরের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও বাড়ির সবকিছু চলত ঘড়ির কাঁটার মতো। নরম, হিলবিহীন জুতো-পরা সব লোকজন (জুতোর মচমচ আর হিলের খটখট তাতিয়ানা সেমিওনভনার মতে দুনিয়ার সবচেয়ে অপ্রীতিকর

জিনিস), তাদের দেখলে মনে হত নিজেদের কাজ নিয়ে সবাই গর্বিত। বৃদ্ধা কর্ত্রীর সামনে তাদের থরহরি কম্প, কিন্তু আমার স্বামী আর আমার প্রতি তাদের একটা মুরুব্বীয়ানা মেশানো স্নেহের ভাব, মনে হত অসাধারণ খুশিতে কাজকর্ম করে তারা। শনিবার শনিবার নিয়ম করে মেঝে ধোয়াপোঁছা হত, ঝাড়া হত গালিচা; মাসের প্রথম দিনে প্রার্থনা আর জল পূত করে নেওয়া। তাতিয়ানা সেমিওনভনা আর তাঁর ছেলের নামকরণের দিনে (আর সেবার হেমন্তে আমার নামকরণের দিনে সেই প্রথম) খেতে ডাকা হত পাড়াপ্রতিবেশী সবাইকে। যতদিনকার কথা মনে আছে তাতিয়ানা সেমিওনভনার ততদিন থেকে চলে আসছে এ সব রেওয়াজ।

সংসারের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না আমার স্বামী; জমিজমার কাজ আর চাষীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, খাটুনি কম ছিল না। এমন কি শীতকালেও অতি ভোরে উনি উঠতেন, জেগে উঠে দেখতাম উনি চলে গিয়েছেন। সাধারণত চায়ের সময়ে ফিরে আসতেন, আমরা দুজনে খেতাম, জমিদারী সংক্রান্ত নানা উৎকণ্ঠা আর পরিশ্রমের পর এ সময়টা প্রায় সর্বদাই সেই বিশেষ হাসিখুশি মেজাজে তিনি থাকতেন, যেটাকে আমরা বলতাম 'বুনো উচ্ছ্বাস', সারা সকালটা কী করেছেন জানতে চাইতাম আমি প্রায়ই, আর এমন সব উদ্ভট কথা তিনি বলতেন যে হেসে দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মাঝে মাঝে জোর দিয়ে বলতাম সত্যি কী করেছ বলো, বলতেন উনি, কষ্টে হাসি চেপে রেখে। চেয়ে থাকতাম ওঁর চোখ আর নড়ন্ত ঠোঁটের দিকে, কিছু ঢুকত না মাথায় — ওঁকে দেখতে পারছি, কানে আসছে ওঁর গলা, তাতেই আনন্দ।

'কী বলেছি বলো তো?' জিজ্ঞেস করতেন উনি। 'শুনি একবার।' কিন্তু এক অক্ষর বলতে পারতাম না। নিজের আর আমার বিষয়ে কথা বলছেন না, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস নিয়ে বলছেন, অদ্ভুত লাগত সেটা। বাইরের পৃথিবীতে যা ঘটছে তাতে যেন কিছু এসে যায়। অনেক পরে শুধু ওঁর কাজকর্ম একটু বুঝতে শুরু করি, আগ্রহ জন্মায় তাতে।

ডিনারের আগে ঘর ছেড়ে বেরোতেন না তাতিয়ানা সেমিওনভনা; চা খেতেন একলা, দূতের মাধ্যমে চলত সকালের শুভেচ্ছার বিনিময়।

ওঁর পরিচারিকা এসে বুকে হাত জুড়ে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে জানাত তাতিয়ানা সেমিওনভনা ওকে আদেশ করছেন আমাদের জিজ্ঞেস করতে কাল বেড়িয়ে আসার পর সুনিদ্রা হয়েছে কিনা; উনি নিজে সারা রাত গায়ের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছেন, গ্রামের একটা হতচ্ছাড়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে — আমাদের পাগল করা সুখের পৃথিবীতে ওঁর গম্ভীর সুশৃংখল ঘর থেকে আসা বার্তা এত খাপছাড়া ঠেকত যে মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে হেসে ফেলতাম, সামলাতে পারতাম না নিজেকে। তাতিয়ানা সেমিওনভনা আর একটি কথা জানার আদেশ করেছেন পরিচারিকাকে — আজকের বিস্কুটগুলো কেমন লেগেছে; আর আমাদের জানা উচিত যে ওগুলো তারাস সেঁকেনি, সেঁকেছে নিকলাশা, এই প্রথম সে কাজটা করেছে, ওকে পরখ করে দেখা হয়েছে; ওঁর মতে কাজটা ভালোই করেছে, বিশেষ করে ক্রেন্দেলকিটা, অবশ্য টোস্টটা প্রায় পুড়িয়ে ফেলেছে।

দুপুরের খাবারের আগে স্বামীর সঙ্গে দেখা হত খুব কম। আমি হয় পিয়ানো বাজাতাম নয় পড়তাম, উনি লিখতেন বা আবার বেরিয়ে যেতেন। চারটের সময়ে সবাই যেতাম ড্রয়িং-রুমে, মা বেরিয়ে আসতেন নিজের ঘর থেকে, বাড়িতে সর্বদাই বিত্তহীন অভিজাত কন্যা ও তীর্থ যাত্রিনী দু তিন জন থাকতেন, আবির্ভাব হত তাঁদের। প্রত্যেক দিন দুপুরের খাবারে নিয়ে যাবার জন্য উনি পুরনো অভ্যাসবশে মায়ের হাত ধরতেন, মা বলতেন আর একটা হাত আমাকে দিতে, ফলে প্রত্যেক দিন একসঙ্গে ভিড় করে ঘরে ঢোকার সময় এর ওর পায়ে পা বেঁধে যেত। খাবার টেবিলে সম্মানের আসন ছিল মায়ের, কথাবার্তা চলত সুষ্ঠু ধীরস্থিরভাবে, এমন কি গাম্ভীর্যের অভাব ছিল না। আমার আর ওঁর আটপৌরে কথাবার্তায় ভোজন-অধিবেশনের গাম্ভীর্যের ভাবটা কেটে যেত। মাঝে মাঝে আবার মায়ে-ছেলেতে শুরু হত তর্কাতর্কি, হয়ত দুজনে দুজনকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতেন। ওঁদের তর্কাতর্কি, হাসিঠাট্টা শুনতে বেশ লাগত আমার, কেননা দুজনকার গভীর স্নেহ ও অনুরাগ সবচেয়ে ভালো করে তখন ধরা পড়ত তাতে।

ভোজন পর্বের পর ড্রয়িং-রুমে মা জাঁকিয়ে বসতেন একটা বড়ো কেদারায়, তামাক পিষে নস্যি বানাতেন কিম্বা হয়ত নতুন কোনো বই-এর পাতা কাটতেন। আর আমরা হয় পড়ে শোনাতাম নয় পিয়ানো বাজাতে চলে যেতাম হলে। সে সময় দুজনে একসঙ্গে পড়তাম অনেক, তবে আমাদের অবসর যাপনের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে বড়ো উপকরণ ছিল সঙ্গীত। নতুন নানা ঝঙ্কার জাগত দুজনের অন্তরে, মনে হত পরস্পরকে আরো ভালো করে চিনছি। ওঁর প্রিয় গৎগুলো যখন বাজাতাম উনি দূরের সোফাটায় বসে থাকতেন, প্রায় আমার চোখের বাইরে; সঙ্গীতে ওঁর ভাবান্তরটা পাছে দেখে ফেলি এই তাঁর সঙ্কোচ, চেপে যাবার চেষ্টা করতেন সেটা। মাঝে মাঝে, হয়ত উনি টের পাচ্ছেন না, পিয়ানো ছেড়ে যেতাম ওঁর কাছে, দেখতে চাইতাম ওঁর মুখে ভাবাবেগের সেই ছাপ, ওঁর চোখের সেই উজ্জ্বলতর দীপ্তি আর সজলতা, যেটা আমার কাছে গোপন করার বৃথা চেষ্টা উনি করেন।

হলে উঁকি মেরে আমাদের একবারটি দেখা নেবার ইচ্ছে হত মায়ের, কিন্তু হয়ত আমাদের বিব্রত করবার ভয়ে মাঝে মাঝে গম্ভীর উদাসীন একটা ভাব করে ঘর হয়ে চলে যেতেন তিনি, কিন্তু নিজের ঘরে গিয়ে একটুক্ষণ যেতে না যেতে আবার বেরিয়ে আসার যে কোন কারণ নেই সেটা টের পেতাম।

সন্ধ্যেবেলায় ড্রয়িং-রুমে বসে চা ঢালার কাজটা ছিল আমার। বাড়ির সবাই আবার সেখানে জড়ো হত তখন। চকচকে সামোভার ঘিরে গম্ভীর সমাবেশ, কাপ আর গেলাস এগিয়ে দেওয়া, প্রথম প্রথম অনেক দিন বেজায় অস্বস্তি হত। মনে হত এ সম্মানের যোগ্য আমি নই, সামোভারটা এত বড়ো, তার নল ঘোরাচ্ছে কিনা আমার মতো পুঁচকে আর ফচকে একটা মেয়ে, নিকিতার ট্রে-তে গেলাস রেখে বলছে এটা পিওতর ইভানিচের, ওটা মারিয়া মিনিচ্‌নার, তারপর জিজ্ঞেস করছে, 'আরো চিনি লাগবে?' তারপর আয়া এবং চাকরবাকরদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত পদস্থ তাদের জন্য চিনির ডেলা রেখে দিতে হত।

'চমৎকার, চমৎকার!' প্রায় বলতেন উনি। 'একেবারে পাকা গিন্নী!' এতে আরো বিব্রত হয়ে উঠতাম।

চায়ের পর মা 'পেসেন্স' খেলার জন্য তাস সাজাতেন, কিম্বা মারিয়া মিনিচ্‌নাকে দিয়ে নিজের ভাগ্য গণনা করাতেন। তারপর আমাদের দুজনকে চুমু খেয়ে আমাদের উপরে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকার পালা, তখন নিজেদের ঘরে চলে যেতাম আমরা। সাধারণত মাঝ রাত পর্যন্ত জেগে থাকতাম, সারা দিনের মধ্যে সে সময়টা সবচেয়ে ভালো আর মধুর। উনি নিজের আগেকার দিনের কথা বলতেন, দুজনে হয়ত নানা রকম জল্পনাকল্পনা করতাম, কখনো কখনো আবার দার্শনিক আলাপ-আলোচনা চলত, চেষ্টা করতাম আস্তে কথা বলার, যাতে ওপর থেকে শোনা না যায় — তাতিয়ানা সেমিওনভনার আদেশ আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে ক্ষিধের জ্বালায় চুপিচুপি যেতাম ভাঁড়ার ঘরে, নিকিতার পৃষ্ঠপোষকতায় ঠাণ্ডা খাবার নিয়ে আমার ঘরে গিয়ে খেতাম একটি মাত্র মোমবাতির আলোয়।

পুরনো বড়ো বাড়িটায় অতীতের আর তাতিয়ানা সেমিওনভনার প্রভাবের কড়া আধিপত্য, সেখানে আমাদের দুজনের জীবনযাত্রা ছিল বিদেশীর মতো। শুধু তাতিয়ানা সেমিওনভনা নয়, পুরনো চাকরবাকর, আসবাবপত্র, এমন কি ছবিগুলো পর্যন্ত দেখে আমার ভয় ভক্তি হত — মনে হত এটা ঠিক আমাদের থাকার জায়গা নয়, এখানে থাকার সময়ে আমাদের খুব সাবধানে, অবহিতভাবে চলা উচিত। এখন সে সব দিনের কথা ভাবলে মনে হয় বাড়িটার অনেক কিছু — সবাইকে সংযত করে রাখা সেই অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলা, অলস কৌতূহলী সেই চাকরবাকরের বাহিনী — অনেক কিছু ছিল অসুবিধের, হাঁফ ধরিয়ে দেবার মতো। কিন্তু তখনকার সেই সংযমই আরো গভীর করেছিল আমাদের প্রেমকে।

কিছু ভালো লাগে না সেটা কখনো দেখাতেন না উনি, আমিও না। বরং যা কিছু অপ্রীতিকর সেটা লক্ষ্য না করার চেষ্টা ছিল ওঁর। মায়ের চাকর দ্‌মিত্রি সিদরভের বেজায় আসক্তি ছিল ধূমপানে, প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা হলে গেলে ও যেত আমার স্বামীর পড়ার ঘরে, দেরাজ থেকে নিত তামাক। পা টিপে, চোখ ঠেরে, আঙুল উঁচিয়ে আতঙ্কের ভান করে যে ভাবে সের্গেই মিখাইলিচ আমার কাছে এসে দ্‌মিত্রি সিদরভকে দেখিয়ে দিতেন তাতে বেজায় মজা লাগত। দ্‌মিত্রি

সিদর্ভের অবশ্য কখনো হুঁশ হত না যে তার কার্যকলাপ আমাদের দৃষ্টিগোচর। আমাদের খেয়াল না করে, সবকিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে গিয়েছে এই আনন্দে ও চলে গেলে আমার স্বামী বলতেন চমৎকার মেয়ে আমি, চুমো খেতেন আমাকে, চুমো খাওয়াটার বিশেষ কোন সুযোগ উনি ছাড়তেন না।

মাঝে মাঝে সবকিছুতে ওঁর নির্বিকার সহিষ্ণু উদাসীন ভাবটা খারাপ লাগত আমার। সেটা ওঁর দুর্বলতা বলে ধরে নিতাম, একবারও মনে হত না উনি যেমনটি আমিও ঠিক তাই। ভাবতাম, "নিজের ইচ্ছাশক্তি দেখাবার সাহস ওঁর নেই, একেবারে ছেলেমানুষ।"

একবার ওঁকে বলেছিলাম ওঁর দুর্বলতায় আমার অবাক লাগে। উনি জবাব দিলেন, 'তাই বুঝি? কিন্তু আমার এত সুখ, চটার মতো কিছু একটা থাকে কী করে? অন্যদের ওপর জোর করার চেয়ে মেনে নেওয়া ভালো, অনেক দিন ধরে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস। এমন কোনো অবস্থা নেই যেখানে সুখী হওয়া অসম্ভব। আর আমরা দুজনে কত সুখী! চটতে আমি পারি না বাপু; কোন কিছু এখন খারাপ ঠেকে না আমার, শুধু করুণা হয় আর মজা লাগে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, le mieux est l'ennemi du bien.* জানো, ঘণ্টা বেজে উঠল, হয়ত বা চিঠি এল একটা, এমন কি সকালে ঘুম ভেঙে গেল, তখন আমার ভয় করে — ভয় করে এই জন্য যে বাঁচা দরকার, কিছু একটা হয়ত বদলে যাবে, আর এখন যা তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।'

বিশ্বাস হল, কিন্তু বুঝলাম না উনি কী বলছেন। সুখী আমি, মনে হল সবকিছু যথোচিত, সবায়ের যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি সবকিছু; তবু কোথাও যেন আর একটা সুখ আছে, এর চেয়ে বড়ো না হতে পারে, তবে আলাদা ধরনের।

দু মাস কেটে গেল এভাবে, শীতকাল এল, এল ঠাণ্ডা আর তুষার-ঝড়; আর স্বামীর সাহচর্য সত্ত্বেও নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগতে শুরু করল। মনে হতে লাগল জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, নতুন কিছু নেই ওঁর আর

---

* যা শ্রেষ্ঠ — তা ভালোর শত্রু। (ফরাসী ভাষায়)

আমার মধ্যে, আমরা শুধু ফিরে যাচ্ছি পুরনো দিনে। আমাকে বাদ দিয়ে আগের চেয়ে বেশী করে নিজের কাজকর্মে মন দিলেন উনি, আবার মনে হল ওঁর মধ্যে আছে বিশেষ একটা জগৎ, সেখানে আমি ঢুকি উনি চান না। ওঁর সেই সদা ধীরস্থির ভাব জ্বালা ধরিয়ে দিল আমার মনে। আগের চেয়ে ওঁকে কম ভালোবাসি তা নয়, ওঁর ভালোবাসায় আমার সুখ আগেকার মতনই, কিন্তু ভালোবাসাটা থমকে দাঁড়িয়েছে, বাড়ছে না আর; প্রেম ছাড়া নতুন একটা অস্থিরতা গোপনে এল আমার অন্তরে। ওঁকে ভালোবাসার তীব্র সুখের পর শুধু ভালোবেসে যাওয়াটা যথেষ্ট নয়। জীবনের প্রশান্ত প্রবাহ চাই না, আরো বেশী গতি চাই। আমার চাই বিপদ আর উত্তেজনা, নিজের প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ করতে চাই আমি। আমার অতিরিক্ত উদ্যম শক্তির স্থান নেই আমাদের এই শান্ত জীবনে। মাঝে মাঝে বিষণ্ণতার আক্ষেপ আচ্ছন্ন করত আমাকে, চেষ্টা করতাম যাতে উনি সেটা টের না পান, জিনিসটা যেন খারাপ; মাঝে মাঝে আমার অসংযত স্নেহ আর আনন্দের উচ্ছ্বাসে ঘাবড়ে যেতেন উনি।

আমার আগেই আমার অবস্থাটা লক্ষ্য করে উনি বলেছিলেন সহরে যাওয়া যাক, কিন্তু আমি বলেছিলাম, না, আমাদের জীবনযাত্রার ধরন বদলাবার দরকার নেই, দরকার নেই আমাদের সুখের ব্যাঘাত করার। আর সত্যি সত্যি সুখী ছিলাম আমি, শুধু একটা জিনিস যন্ত্রণা দিত আমাকে — আমার সুখটা মাগনা, তার জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করতে হয় না; কাজের আর ত্যাগের বাসনা যন্ত্রণা দিত আমাকে। ওঁকে ভালোবাসতাম, জানতাম আমি ওঁর চোখের মণি, কিন্তু আমি চাইতাম আমাদের ভালোবাসা সবাই দেখুক; বাধা দিক আমার ভালোবাসায়, তবু ভালোবেসে যাব ওঁকে। আমার মন আর আমার অনুরাগ ভরাট, তবু ছিল একটা নতুন অনুভূতি — যৌবনের একটা অনুভূতি, উত্তেজনার একটা চাহিদা, আমাদের শান্ত জীবনযাত্রায় সে চাহিদা অতৃপ্ত রয়ে গেল।

চাইলে যখন খুশি সহরে যেতে পারি, কথাটা কেন বলেছিলেন উনি? সেটা না বললে হয়ত বুঝতে পারতাম আমার যন্ত্রণাকর অনুভূতিটা দোষের, সেটা ক্ষতিকর। বুঝতে পারতাম ত্যাগের সুযোগের জন্য আমার উতলা অনুভূতিটা দমন করতে পারাটাই ত্যাগ। বার বার মনে হতে লাগল

সহরে গেলেই বিরক্তির হাত থেকে রেহাই মিলবে, তবু শুধু নিজের স্বার্থে যা কিছু ওঁর প্রিয় তা থেকে ওঁকে ছিনিয়ে নিতে দুঃখ পেতাম, হত লজ্জা।

দিন কাটতে লাগল; বাড়ির চারদিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে জমল বরফের স্তূপ; আমরা দুজনে সর্বদা একসঙ্গে থাকি, চোখের আড়াল হই না কখনো। আর কোথায় যেন আলোর ছটায় আর সোরগোলে অনেক অনেক লোক স্বাদ পাচ্ছে উত্তেজনার, দুঃখের, আনন্দের; আমাদের কথা নিয়ে, আমাদের একঘেয়ে অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। সবচেয়ে কষ্ট হত এই ভেবে যে আমাদের সব অভ্যেস প্রতিদিন বাঁধা ছকে ফেলছে আমাদের জীবনযাত্রাকে; আমাদের প্রেম স্বাধীন নয়, কালের যাত্রার নির্বিকার নিরাসক্ত স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে। সকালে আমরা হাসিখুশি, দুপুরের খাবারের সময় সমীহ করে চলি, সন্ধ্যেবেলায় আমরা স্নেহে কোমল।

নিজেকে বলতাম, "অন্যের ভালো করো!.. অন্যের ভালো করা, সৎভাবে থাকা চমৎকার জিনিস, উনি তো তাই বলেন। সেটা করার সময় তো আছে। কিন্তু এমন সব জিনিস আছে যেগুলো করার শক্তি শুধু এখনি আছে আমার।" অন্যের ভালো করা চাইতাম না আমি, চাইতাম সংগ্রাম। চাইতাম অনুভূতি আর আবেগ আমাদের জীবনকে চালাক, জীবন আমাদের আবেগকে নয়। গভীর খাদের ঠিক ওপরে ওঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলার ইচ্ছে হত, "আর এক পা, ব্যস, তারপর খাদ; আর একটি মুহূর্ত শুধু, তারপর আমি নেই," তখন মৃত্যু পাণ্ডুর মুখে বলিষ্ঠ হাতে আমাকে তুলে মুহূর্তকাল খাদের ওপরে ধরবেন উনি, হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে আমার, তারপর সেখান থেকে নিয়ে যাবেন আমাকে কোথাও যেন।

মনের এই অবস্থার ফলে স্বাস্থ্য খারাপ হল, এল স্নায়বিক অস্থিরতা। একদিন সকালে অন্য দিনের চেয়ে খারাপ লাগছিল, উনিও অফিস থেকে ফিরলেন খারাপ মেজাজে, সেটা হত কদাচিৎ। তক্ষুণি টের পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে, কিন্তু কিছু জানালেন না উনি, বললেন বলার মতো কিছু নয়। পরে কানে এল জেলার দারোগা আমাদের কয়েকটি চাষীকে তলব করে নানা বেআইনী দাবী করেছে, শাসিয়েছে

ওদের। দারোগাটি আমার স্বামীর ওপর চটা ছিল। ব্যাপারটা তখনো হাস্যকর বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেননি বলে ওঁর মেজাজটা বিগড়েছে, সে জন্য কথা বলতে চাননি আমার সঙ্গে। কিন্তু আমার মনে হল আমাকে নেহাৎ বাচ্ছা ভাবেন উনি, ভাবেন ওঁর ভাবনাচিন্তা বোঝার শক্তি আমার নেই, তাই কিছু বলেননি। মুখ ফিরিয়ে নিলাম, কোনো কথা বললাম না। মারিয়া মিনিচ্‌না আমাদের অতিথি ছিলেন, তাঁকে চায়ে ডাকতে বললাম।

চা-পর্ব বেশ তাড়াতাড়ি শেষ করে মারিয়া মিনিচ্‌নাকে হলে নিয়ে গিয়ে জোর গলায় তুচ্ছ কী একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম; ব্যাপারটায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না আমার। উনি পায়চারি করতে লাগলেন, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর তাকানোতে আরো বেশী কথা বলার ইচ্ছে হল, এমন কি মনে হল হেসে উঠি। যা কিছু বললাম, মারিয়া মিনিচনা যা বললেন — সব মনে হল মজার। শেষ পর্যন্ত উনি একটিও কথা না বলে পড়ার ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার ফূর্তি উবে গেল, এত চট করে যে অবাক হয়ে মারিয়া মিনিচনা শুধালেন কী হয়েছে আমার। জবাব না দিয়ে সোফায় বসে পড়লাম, প্রায় কান্না পেয়ে গেল।

"কী নিয়ে উনি মাথা ঘামাচ্ছেন? ছাইপাঁশ কিছু, ওঁর কাছে মনে হচ্ছে ভয়ানক জরুরী ব্যাপার, কিন্তু আমাকে বললে দেখিয়ে দিতাম ব্যাপারটা সামান্য। কিন্তু উনি ভাবেন আমি কিছু বুঝি না, নিজের মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্বের ভারে আমাকে খেলো করেন, আমার সঙ্গে যা করেন সবই যেন ঠিক। কিন্তু আমিও কিছু অন্যায় করি না, যদি একঘেয়ে লাগে, জীবনটা ফাঁকা মনে হয়, বাঁচতে, এগিয়ে যেতে চাই, ঠিক করি। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সময় কেটে যাচ্ছে দেখার সখ আমার নেই। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু আমার চাই, কিন্তু উনি চান এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে, চান ওঁর সঙ্গে আমিও যেন দাঁড়িয়ে থাকি। ওঁর পক্ষে সেটা কত না সহজ! তার জন্য আমাকে সহরে নিয়ে যেতে হবে না, হতে হবে ঠিক আমার মতো — সহজ, অকপট,

বাধাবন্ধনহীন। আমাকে সহজ সরল হতে উনি বলেন, কিন্তু নিজে উনি সহজ সরল না। ব্যাপারটা হল এই!”

মনে হল অশ্রুজলে হাঁফ ধরে গিয়েছে, ওঁর ওপর চটেছি। আর এতে ভয় পেয়ে গেলাম ওঁর কাছে। পড়ার ঘরে বসে উনি লিখছিলেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে নিরাসক্ত শান্তভাবে একবার শুধু তাকালেন, তারপর লিখে চললেন। ওঁর চাউনিটা ভালো লাগল না, তাই কাছে না গিয়ে ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা বই খুলে পাতা ওলটাতে শুরু করলাম। আবার উনি ফিরে তাকালেন আমার দিকে।

'মেজাজটা ঠিক নেই বুঝি, মাশা?' জিজ্ঞেস করলেন।

ঠাণ্ডা চোখে একবার তাকালাম, ভাবটা যেন, “জিজ্ঞেস করে কী লাভ? এত ভদ্রতা কেন?” মাথা নাড়লেন উনি, মুখে এল লাজুক, স্নিগ্ধ হাসি। আর এই প্রথম ওঁর হাসিতে হেসে সাড়া আমি দিলাম না।

'কী হয়েছিল আজ?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আমাকে বললে না কেন শুনি?'

'এমন কিছু নয়। অল্প অপ্রীতিকর একটা ব্যাপার,' জবাবে উনি বললেন, 'কিন্তু এখন তোমাকে বলতে পারি। আমাদের দুজন চাষী সহরে গিয়েছিল ...'

কথাটা শেষ করতে দিলাম না।

'চায়ের সময় যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন বললে না কেন?'

'হয়ত বোকার মতো কিছু বলে বসতাম। তখনো খুব রেগে ছিলাম।'

'তখনি জানা দরকার ছিল আমার।'

'কেন?'

'তোমার কোনো কাজে আমি কখনো লাগবো না, কেন ভাবো এটা?'

'তাই ভাবি বুঝি?' কলমটা ফেলে দিয়ে বললেন উনি। 'আমি ভাবি যে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। তুমি সবকিছুতে আমাকে সাহায্য কর, সব কিছুতে। শুধু সাহায্য কর না, সবকিছু তুমি করে দাও। কী বোকা তুমি!' হেসে উঠলেন উনি। 'তুমি আমার

সর্বস্ব। তুমি এখানে আছো বলে, তোমাকে আমার দরকার বলে সবকিছু ভালো লাগে আমার।'

'তা জানি — আমি আদুরে খুকী তো, আমাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে শান্ত করা দরকার,' যে সুরে কথাটা বললাম তাতে উনি অবাক হয়ে তাকালেন, যেন এই প্রথম আমাকে দেখছেন। 'শান্ত হতে আমি চাই না। তুমি নিজে যথেষ্ট শান্ত। বড্ডো বেশী শান্ত,' যোগ করলাম।

'শোনো, ব্যাপারটা হয়েছিল কি,' বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি শুরু করলেন উনি, আমাকে শেষ করতে দিতে ওঁর ভয়, সেটা স্পষ্ট। 'তুমি হলে ব্যাপারটার মীমাংসা কী ভাবে করতে?'

'এখন আর শুনতে চাই না,' বললাম। শুনতে অবশ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু ওঁর ধীরস্থির ভাবের ব্যাঘাত করতে বেশ লাগছিল। 'আমি বাঁচার অভিনয় চাই না — আমি বাঁচতে চাই, ঠিক তোমার মতো।'

ব্যথার, প্রখর মনোযোগের একটা ভাব এল ওঁর মুখে। সে মুখে সবকিছুর ছাপ পড়ত তাড়াতাড়ি, স্পষ্টভাবে।

'আমি চাই তোমার সমান হয়ে থাকতে, তোমার সমান হয়ে...'

ওঁর মুখে এল বিষণ্ণ ভাব, এত গভীর বিষণ্ণ ভাব যে কথাটা শেষ করতে পারলাম না। মুহূর্তকাল চুপ করে রইলেন উনি।

'আমার সমান নয় কী ব্যাপারে বলো তো?' জিজ্ঞেস করলেন। 'দারোগা আর মাতাল চাষীদের নিয়ে কারবার আমাকে করতে হয়, তোমাকে নয়, সে জন্যে বুঝি?'

'না, শুধু তা নয়।'

'দোহাই তোমার, আমাকে বোঝার চেষ্টা করো লক্ষ্মীটি,' বলে চললেন উনি। 'উৎকণ্ঠা সব সময়েই কষ্টের ব্যাপার। অনেক দিন বেঁচেছি বলে সেটা জানি। তোমাকে ভালোবাসি বলে উৎকণ্ঠার হাত থেকে যাতে রেহাই পাও তার চেষ্টা না করে পারি না। তোমাকে ভালোবাসি, সেটা আমার জীবনের সর্বস্ব। সে জীবন থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।'

'তোমার ভুল তো কখনো হয় না!' ওঁর দিকে না তাকিয়ে বললাম।

ওঁর হৃদয়ে সবকিছু আবার স্বচ্ছ আর শান্ত, অথচ আমার অন্তরে বিরক্তি আর অনুশোচনার মতো একটা ভাব, তাই বিরক্ত লাগল।

'মাশা! তোমার কী হয়েছে বলো তো?' উনি বললেন। 'কে ঠিক, কে ঠিক নয়, তুমি না আমি, কথাটা তা নয়। কথাটা একেবারে অন্য। আমার ওপর রাগ করেছ কেন? না ভেবেচিন্তে কিছু বোলো না, সব ভেবে নিয়ে আমাকে খুলে বলো। আমাকে নিয়ে তুমি অসন্তুষ্ট, হয়ত তার ন্যায্য কারণ আছে, কিন্তু কোনখানটায় আমার দোষ সেটা জানতে দাও।'

কিন্তু ওঁর কাছে মন খুলে সব কথা বলি কী করে? উনি আমাকে চট করে বুঝেছেন, আবার ওঁর কাছে আমি বাচ্চা মেয়ের মতো, এমন কিছু আমি করতে পারি না যেটা উনি চট করে ধরে ফেলবেন না বা আগে থেকে আঁচ করেননি; এই অবস্থাটা আরো উত্তেজিত করে তুলল আমাকে।

'তোমার ওপর চটিনি,' বললাম আমি। 'আমার শুধু একঘেয়ে লাগছে, আর সেটা আমি চাই না। কিন্তু তোমার মতে ওরকমটাই হওয়া উচিত, আর তোমার কথাটা তো ঠিক না হয়ে যায় না।'

কথাটা বলে ওঁর দিকে তাকালাম। যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে — ওঁর ধীরস্থির ভাব আর নেই; মুখে ব্যথা আর উৎকণ্ঠার ছাপ।

'মাশা,' নিচু, উত্তেজিত গলায় উনি শুরু করলেন। 'এখন আমরা যা করছি সেটা ঠাট্টার জিনিস নয় — আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে তার ওপর। অনুগ্রহ করে জবাব দিও না, যা বলছি শোনো। আমাকে কেন যন্ত্রণা দিতে চাও?'

কিন্তু বাধা দিলাম ওকে।

'তুমি যা বলবে ঠিক না হয়ে যায় না। তোমার কিছু না বললেও চলে, তুমিই ঠিক,' অত্যন্ত কঠিন সুরে জবাব দিলাম, যেন আমি কথা বলছি না, আমাকে কথা বলাচ্ছে কোন অশুভ প্রেতাত্মা।

'কী বলছ সেটা শুধু যদি জানতে!' বলে উঠলেন উনি কম্পিত গলায়।

কেঁদে ফেললাম, তাতে হালকা লাগল। আমার পাশে চুপচাপ বসে রইলেন উনি। দুঃখ হচ্ছিল ওঁর জন্য, যা করেছি তার জন্য লজ্জিত আর বিরক্ত লাগল। ওঁর দিকে তাকালাম না। মনে হল উনি আমার

দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সে দৃষ্টি হয় কঠোর নয় তো হতবুদ্ধি। মুখ তুলে চাইলাম: স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টি আমাতে নিবদ্ধ, সে দৃষ্টি যেন ক্ষমা চাইছে। ওঁর একটা হাত ধরে বললাম:

'কিছু মনে কোরো না। কী যে বলছিলাম নিজেই জানতাম না।'

'আমি কিন্তু বুঝেছি; ঠিকই বলছিলে তুমি।'

'কী?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাদের সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাওয়া দরকার। এখানে আমাদের করবার কিছু নেই।'

'তোমার যা ইচ্ছে,' বললাম।

আমাকে জড়িয়ে চুমো খেলেন উনি।

'আমায় মাফ করো,' উনি বললেন। 'তোমার কাছে আমি অপরাধী।'

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ পিয়ানো বাজিয়ে শোনালাম ওঁকে, ঘরে উনি পায়চারি করতে লাগলেন, আপন মনে ফিসফিস করে কী যেন বলছিলেন। আপন মনে ফিসফিস করাটা ওঁর অভ্যেস, মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম কী বলছেন। জবাব দিতেন — সাধারণত কোনো কবিতা আওড়াচ্ছেন বা ছাইপাঁশ কিছু বলছেন, কিন্তু ছাইপাঁশটা থেকে ওঁর মেজাজটা টের পেতাম।

'আজ ফিসফিস করে কী বলা হচ্ছে?' শুধালাম।

মুহূর্তকাল থামলেন উনি, তারপর হেসে লেরমন্তভ থেকে দু ছত্র আবৃত্তি করলেন:

... বিদ্রোহী সে চায় ঝড়দুর্যোগ,
যেন শান্তি পাবে ঝড়ে!

"উনি মানুষ নন, মানুষের চেয়ে বড়ো, সব জানেন উনি!" মনে মনে ভাবলাম। "ওঁকে না ভালোবেসে কী করে-থাকি?"

দাঁড়িয়ে ওঁর হাত ধরে ওঁর পায়ের সঙ্গে পা ফেলবার চেষ্টা করে পায়চারি করতে লাগলাম।

'সত্যি না?' হেসে আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'সত্যি,' মৃদু কণ্ঠে বললাম। আর একটা ফূর্তির ভাব দুজনকে পেয়ে বসল। আমাদের চোখ হাসিতে উজ্জ্বল, ক্রমশ লম্বা লম্বা পা

ফেলছি দুজনে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটা শুরু হল। সবকটা ঘর হয়ে এভাবে চললাম খাবার ঘরে, গ্রিগরি গেল ভয়ানক চটে, মা একেবারে অবাক, ড্রয়িং-রুমে বসে 'পেসেন্স' খেলছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে দুজনে থামলাম, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম উচ্চ কণ্ঠে।

দু সপ্তাহ পরে, ঠিক ছুটির আগে, পেঁছিলাম সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

৭

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাত্রা, পথে এক সপ্তাহ মস্কোয় — রাস্তাঘাট, নতুন নতুন সহর, ওঁর আর আমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নতুন বাড়িতে গুছিয়ে বসা — সব কেটে গেল স্বপ্নের মতো। সবকিছু এত বিচিত্র, এত নতুন আর আনন্দ-ভরা, ওঁর উপস্থিতি আর প্রেম এত উষ্ণ ও উজ্জ্বল যে গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রাকে মনে হল তুচ্ছ ও সুদূর। ভেবেছিলাম উচ্চ সমাজের লোকদের মধ্যে দেখব গর্ব আর ঔদাসীন্য, কিন্তু অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলাম সবাই, আত্মীয় অনাত্মীয় সবাই আন্তরিক সৌজন্যতায়, সদয়ভাবে ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে, মনে হল ওঁরা সবাই শুধু আমার কথা ভাবছিলেন, পথ চেয়ে বসেছিলেন শুধু আমারি জন্য, আমি এলে সুখী হবেন বলে। সমাজের উ'চু স্তরকে তখন আমার মনে হয়েছিল শ্রেষ্ঠ স্তর — এত জনকে আমার স্বামী চেনেন, আমার কাছে অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার সেটা, এ'দের নাম কখনো তিনি করেননি আমার কাছে। তাঁদের কয়েক জনের তীক্ষ্ণ সমালোচনা মাঝে মাঝে তিনি করতেন, সেটা আমার বিচিত্র ও অপ্রীতিকর ঠেকত, তাঁদের তো অত্যন্ত সদয় বলে আমার মনে হত। কেন যে তাঁদের প্রতি উনি অত উদাসীন, কেন এমন অনেককে উনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন যাঁদের সঙ্গে আলাপ করাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার, আমার মাথায় ঢুকত না। আমার মনে হত যত বেশী ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় ততই ভালো, আর ওঁরা সবাই তো সহৃদয় লোক।

গ্রাম ছাড়ার আগে উনি বলেছিলেন, 'কী ভাবে চলতে হবে বলি। এখানে বুঝলে আমরা ছোটখাটো বাদশা গোছের লোক, কিন্তু সহরে আমাদের ধনী বলা মোটেই চলবে না, তাই ইস্টার পর্যন্ত শুধু থাকতে

পারবো সেখানে; উঁচু সমাজে বেশী ঘোরাফেরা করা চলবে না, সেটা করলে ধার হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমি চাই না যে তোমার ...'

'উঁচু সমাজে ঘুরবো কেন?' জবাব দিয়েছিলাম। 'আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শুধু দেখা করবো, থিয়েটারে যাবো আর ভালো গানবাজনা শুনবো। তারপর ইস্টারের আগে গ্রামে ফিরে আসবো।'

কিন্তু পিটার্সবুর্গে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব সংকল্প উবে গেল। হঠাৎ গিয়ে পড়লাম একটা নতুন সুখের জগতে, আনন্দের বন্যায় ভেসে গেলাম, নতুন নানা ঝোঁক দেখা দিল; সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারে, আমার অতীতকে আর অতীতের সমস্ত পরিকল্পনাকে দিলাম বাতিল করে।

'ও সব কিছু নয় — কিছু শুরু হয়নি তখনো — এটাই হল আসল জীবন। আর সামনে কত কী না পড়ে রয়েছে!' আমি ভাবলাম। গ্রামে আমার সেই অস্থির অবসাদের ভাব ইন্দ্রজালের মতো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বামীর প্রতি অনুরাগ অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে এল; আমাকে উনি আগের চেয়ে কম ভালোবাসেন কিনা, তা নিয়ে একেবারে ভাবিনি। ওঁর প্রেমে সন্দেহ করি কী করে, আমার সমস্ত চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে উনি বুঝে ফেলেন, আমার সব অনুভূতির সোদর উনি, আমার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেন। ওঁর সেই ধীরস্থির ভাব হয় চলে গিয়েছিল নয় তাতে আমি আর বিরক্ত হতাম না। তারপর মনে হল আমার প্রতি ওঁর পুরনো অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নতুন একটা প্রশংসার ভাব। হয়ত কারো বাড়িতে গিয়েছি, আলাপ হয়েছে নতুন কারো সঙ্গে, কিম্বা হয়ত বাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় নেমন্তন্ন করা হয়েছে লোকজনকে, গৃহিণীর কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়েছে আমাকে, বুকের ভেতর কাঁপুনি যদি কোনো ভুল করে ফেলি, উনি বলতেন, 'মেয়ে বটে! চমৎকার! ঘাবড়িও না। ঠিক করেছ, চমৎকার!' শুনে খুব ভালো লাগত।

পিটার্সবুর্গে পৌঁছবার কিছুদিন পরে মাকে একটা চিঠি লিখে আমাকে কিছু যোগ করতে বললেন, ওঁর ইচ্ছে ছিল না ওঁর লেখা অংশটা আমি পড়ি, আমি জেদ করে কিন্তু চিঠিটা পড়ি।

উনি লিখেছিলেন, "মাশাকে আপনি চিনতেন না। আমি নিজেও

চিনি না। কোত্থেকে ও এ রকম মধুর সুন্দর আত্মবিশ্বাস, এ রকম লাবণ্য, এমন সামাজিক রসবোধ আর কমনীয়তা পেল! আর এ সবকিছু কত সরল, কত অনুরাগের, কত ভব্য। সবাই ওকে নিয়ে মুগ্ধ, আমিও। এখনকার চেয়ে ওকে বেশী ভালোবাসা যদি সম্ভব হত তাহলে তাই ভালোবাসতাম।"

"তাহলে আমি মানুষটা এ রকম!" ভাবলাম, ভেবে এত সুখী লাগল, এত আনন্দ হল! মনে হল ওঁর ওপর আমার ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছে। চেনাশোনা লোকেদের মধ্যে আমার সাফল্য আমার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। সব জায়গায় শুনি লোকে আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। একটা বাড়িতে আমাদের একজন কাকা বিশেষ খুশি আমাকে নিয়ে; অন্য বাড়িতে একটি কাকিমা তো আমাকে নিয়ে পাগল; একজন ভদ্রলোক বললেন সারা পিটার্সবুর্গে আমার জুড়ি মেলা ভার; একটি ভদ্রমহিলা বললেন ইচ্ছে করলেই সমাজের সবচেয়ে শালীন মহিলা হতে পারি। বিশেষ করে আমার স্বামীর খুড়তুতো বোন, কায়দাদুরস্তা প্রবীণা প্রিন্সেস 'দ' আমার প্রেমে পড়ে গেলেন হঠাৎ, সবায়ের চেয়ে বেশী আমার গুণগান তিনি করতেন, এত বেশী করতেন যে আমার মাথাটা ঘুরে গেল একেবারে। একটা বল-নাচে যাবার জন্য প্রথম বার আমাকে নেমন্তন্ন করে তিনি আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর কোন আপত্তি আছে কিনা। উনি আমার দিকে তাকালেন, মুখের ধূর্ত হাসিটা চাপা পড়েনি, জিজ্ঞেস করলেন আমি যেতে চাই কিনা। যেতে চাই জানিয়ে মাথা নাড়লাম, বুঝতে পারলাম লাল হয়ে উঠেছি।

ভালোভাবে হেসে উনি বললেন, 'যেতে চাও সেটা মুখ ফুটে বলাটা যেন মহা পাপ!'

হেসে, অনুরোধ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু তুমি তো বলেছিলে উঁচু সমাজে যাওয়া আমাদের চলবে না। তাছাড়া ও সব তো তোমার ভালো লাগে না।'

'যাবার এত ইচ্ছে যখন তোমার, যাবো,' উনি বললেন।

'কিন্তু না গেলেই ভালো বোধ হয়।'

'যেতে খুব ইচ্ছে করছে?' আবার শুধালেন উনি।

উত্তর দিলাম না।

'উ'চু সমাজ জিনিসটা খারাপ নয়, কিন্তু উ'চু সমাজের অতৃপ্ত বাসনা খারাপ, কুৎসিৎ। আমরা যাবো, নিশ্চয় যাবো,' দৃঢ় কণ্ঠে উনি বললেন।

স্বীকার করলাম, 'সত্যি বলতে, এই বল-নাচে যেতে যেমন চেয়েছি পৃথিবীতে আর কিছু তেমন চাইনি।'

গেলাম সেখানে, আমার আহ্লাদ প্রত্যাশার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল! বলে আগের আগের চেয়ে অনেক বেশী করে মনে হল আমাকে কেন্দ্র করে সবকিছু ঘুরছে — প্রকাণ্ড হলটা আলোয় আলো করা হয়েছে আমার খাতিরে, গানবাজনা চলেছে, এত লোক একত্র হয়েছে, সব আমারি জন্য। কেশকার আর অনুচারিকা থেকে শুরু করে হলে ঘুরে-বেড়ানো যুবকরা পর্যন্ত আমাকে যেন বলল কিম্বা বুঝিয়ে দিল যে তারা আমাকে ভালোবাসে। আমার সম্বন্ধে বলে-আসা লোকেদের সাধারণ মতটা আমাকে জানিয়েছিলেন স্বামীর খুড়তুতো বোন, মতটা হল যে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই, আমার অসাধারণ কিছু একটা আছে, গ্রাম্য, সহজ সরল, মোহিনী কিছু একটা। সাফল্যে এত আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম যে স্বামীকে খোলাখুলি বললাম যে সে বছরে আরো দু তিনটে বলে যেতে চাই আমি। 'গিয়ে অরুচি হয়ে যায় যাতে,' যোগ করলাম, মনের ভাব চেপে রেখে।

সাগ্রহে রাজী হলেন উনি। প্রথম প্রথম বাহ্যত বেশ খুশি হয়ে আমার সঙ্গে যেতেন, আমার খুশিতে ওঁর আনন্দ, আগে যা বলেছিলেন তা যেন মনে নেই একেবারে, কিম্বা ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

পরে ওঁর একঘেয়ে লাগত, আমাদের জীবনযাত্রায় ক্লান্ত লাগতে শুরু করল ওঁর। কিন্তু সেটা আমার কাছে কিছু না: ওঁর গম্ভীর, চিন্তাকুল দৃষ্টি জিজ্ঞাসুভাবে আমার মুখে নিবদ্ধ, মাঝে মাঝে সেটা চোখে পড়ত বটে, কিন্তু চাউনিটার অর্থ বুঝতাম না। আমাকে নিয়ে অচেনা লোকজনের সাড়া, যেটা অনুরাগ বলে ঠেকত আমার কাছে, এই মার্জিত রুচি, প্রীতি ও বৈচিত্র্যের আবহাওয়ায় আমি এত চমৎকৃত যে এই প্রথম যেন বাঁচলাম সহজভাবে; ওঁর নৈতিক প্রভাবের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেলাম হঠাৎ, এরা সবাই আমাকে ওঁর শুধু সমকক্ষ নয়, শ্রেষ্ঠ বলে

ভাবে তাতে আমি এত প্রীত যে ওঁকে আমার প্রেম স্বেচ্ছায়, আরো মুক্ত হস্তে উজাড় করে দেওয়া সম্ভব হল: উচ্চ সমাজের জীবনে আমার পক্ষে অপ্রীতিকর কী উনি দেখেন বুঝতে পারলাম না। বল-ঘরে ঢুকলে সবাই তাকাত আমার দিকে, আর আমি যে ওঁর সেটা জানাতে যেন লজ্জা পেয়ে উনি তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে ইভনিং-জ্যাকেট-পরা লোকের ভিড়ে মিলিয়ে যেতেন, তাতে গর্ব আর আত্মপ্রসাদের নতুন একটা অনুভূতি আমার হত।

হলের এক প্রান্তে উনি হয়ত একলা দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ পাত্তা দিচ্ছে না ওঁকে, মাঝে মাঝে ওঁর চেহারায় একঘেয়েমির ছাপ — ওঁকে দেখে ভাবতাম, "আর একটু সবুর করো, বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সবুর করো, তখন বুঝতে পারবে — কার জন্য সুন্দর আর চোখ-ধাঁধানো হবার আমার এই চেষ্টা, আজকের সন্ধ্যায় আমার চারিদিকে ভিড়-করা লোকজনকে নয়, কাকে সবায়ের চেয়ে বেশী ভালোবাসি।" আর সত্যি মনে হত ওঁরি খাতিরে নিজের সাফল্যে আমি এত আনন্দ পাই, সে সাফল্য ওঁর পায়ে উজাড় করে দিতে পারবো বলে। ভাবতাম, উচ্চ সমাজে শুধু একটা জিনিস আমার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে — সেটা হল যদি সেখানকার কারোর প্রতি আমার টান হয়, তাহলে আমার স্বামী হিংসেয় ভুগবেন। কিন্তু আমাতে ওঁর এত বিশ্বাস, ওঁকে এত ধীরস্থির ও নির্বিকার মনে হয়; ওঁর তুলনায় তরুণদের সবাইকে এত অকিঞ্চিৎকর ঠেকে যে উচ্চ সমাজের এই একমাত্র বিপদটায় আমার কোন ভয় হল না। অবশ্য সমাজের এত লোকের মনোযোগের বস্তু আমি, বেশ খুশি লাগত, আত্মগর্বে সাড়া জাগাত, মনে হল স্বামীকে যে ভালোবাসি সেটা কিছুটা গুণের কথা বলতে হবে; ওঁর প্রতি আমার হাবভাবে এল একটা আত্মপ্রত্যয়ের অনবহিত ভাব।

বল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদিন রাত্রে ওঁর দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বললাম, 'তুমি তো "ন. ন."র সঙ্গে খাসা কথা চালিয়েছিলে দেখলাম।' যে মহিলাটির উল্লেখ করলাম তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে সুপরিচিতা, আর সেদিন সন্ধ্যায় উনি সত্যিই কথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে। কথাটা তুললাম

ওঁকে চটাবার জন্য, অন্যান্য দিনের তুলনায় উনি আরো চুপচাপ ছিলেন, আরো একঘেয়েমির ছাপ ওঁর মুখে ছিল বলে।

'কী বলছ! তোমার মুখে এ কথা, মাশা?' উনি বললেন, দাঁত চেপে, শারীরিক ব্যথায় যেন ভ্রূ কুঞ্চিত হল। 'কথাটা তোমাকে বা আমাকে মোটেই মানায় না। এ সব বলুক অন্য লোকে। এ ধরনের কৃত্রিমতায় আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আর আমার এখনো আশা আছে সে সম্পর্কটা ফিরে আসবে।'

লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলাম।

'সম্পর্কটা ফিরে আসবে আবার, কী বলো মাশা? কী মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'সম্পর্কটা নষ্ট হয়নি কখনো, নষ্ট হবে না কখনো,' বললাম। সে সময় সত্যি তাই মনে হয়েছিল।

'ভগবান তাই করুন,' উনি বললেন। 'এবার গ্রামে ফেরার সময় হয়েছে।'

একবারই শুধু আমার সঙ্গে এ রকম ভাবে কথা বলেছিলেন উনি। বাকি সময়টা মনে হত উনি আমারি মতো সুখী। আর আমি কত না উচ্ছল আর সুখী ছিলাম! মাঝে মাঝে ওঁর একঘেয়ে লাগে হয়ত, নিজেকে বোঝাতাম যে ওঁর খাতিরে গ্রামে তো আমি একঘেয়েমি সহ্য করেছি; আমাদের দুজনের সম্পর্ক হয়ত একটু বদলেছে, কিন্তু নিকলস্কয়েতে তাতিয়ানা সেমিওনভনার কাছে গ্রীষ্মকালে ফিরে গেলেই সবকিছু আবার আগেকার মতো হয়ে যাবে।

এভাবে শীতকালটা আমার অলক্ষিতে কেটে গেল। আগেকার পরিকল্পনা গেল চুলোয়, এমন কি ইস্টার কাটল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। সেণ্ট টিমোথি সপ্তাহের শুরুতে আমরা বিদায়ের জন্য প্রস্তুত, সব গোছগাছ হয়ে গেছে, বাড়ির জন্য উপহার কিনেছেন আমার স্বামী, গ্রামের জীবন আরো পরিপাটি করার জন্য নানা জিনিস ও ফুল কেনা হয়েছে, ওঁর মেজাজটা বিশেষ করে প্রসন্ন ও কোমল, হঠাৎ ওঁর খুড়তুতো বোন এসে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন যেন আমরা শনিবার পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখি। কাউণ্টেস 'র'এর ওখানে একটা বড়ো পার্টিতে তাহলে যাওয়া যাবে। ভদ্রমহিলা

বললেন কাউণ্টেস 'র'এর বিশেষ ইচ্ছে আমি যাই — প্রিন্স 'ম' তখন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, শেষ বলের পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাই পার্টিতে যাবেন; তাঁর মতে সারা রাশিয়ায় আমার মতো রূপসী আর নেই। গোটা সহরটা জড়ো হবে পার্টিতে — এক কথায়, আমার না গেলে চলবে না।

ড্রয়িং-রুমের অন্য দিকে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন আমার স্বামী।

'তাহলে আপনি আসছেন তো, মারি?' ওঁর খুড়তুতো বোন জিজ্ঞেস করলেন।

অনিশ্চিতভাবে স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'পরশুদিন আমাদের গ্রামে রওনা হবার ইচ্ছে।' দুজনের চোখোচোখি হল, তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালেন উনি।

'ওকে থাকতে আমি রাজী করাবো,' ভদ্রমহিলা বললেন, 'আর শনিবার ওখানে গিয়ে সবায়ের মাথা ঘুরিয়ে দেবো একেবারে। তাই ঠিক তো?'

'আমাদের সব প্ল্যান তাহলে উলটে যাবে, আমরা তো গোছগাছ করে বসে আছি,' জবাবে বললাম, তখনি কিন্তু দোমনা ভাব এসে গেছে।

'আজ রাত্তিরে তাহলে ও গিয়ে প্রিন্সকে সেলাম জানিয়ে আসুক, সেই ভালো,' হলের অন্য প্রান্ত থেকে বললেন আমার স্বামী, চাপা বিরক্তির সে সুর ওঁর গলায় তার আগে শুনিনি কখনো।

'হে ভগবান? হিংসে হয়েছে, দেখছি। আগে তো কখনো দেখিনি,' হেসে উঠলেন ওঁর খুড়তুতো বোন। 'কিন্তু শুধু প্রিন্সের জন্যে নয়, আমাদের সবায়ের জন্যে ওকে থেকে যেতে বলছি, সের্গেই মিখাইলভিচ। কাউণ্টেস "র" ওকে বিশেষ করে আসতে বলেছেন।'

'ওর মর্জি,' কঠিন সুরে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন উনি।

দেখলাম উনি অন্যান্য বারের চেয়ে বিচলিত, দেখে ব্যথা পেলাম, কোনো কথা দিলাম না ওঁর খুড়তুতো বোনকে। ভদ্রমহিলা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম ওঁর কাছে। চিন্তান্বিত মুখে উনি পায়চারি করছিলেন, আমার পা টিপে আসার শব্দ কানে গেল না।

ওঁকে দেখে দেখে ভাবলাম, "ওঁর মন এরি মধ্যে চলে গেছে

নিকলস্কয়েতে আমাদের পুরনো প্রিয় বাড়িটাতে; আলো হাওয়ায় দীপ্ত বৈঠকখানায় বসে সকালে সেই কফি খাওয়া, ওঁর সেই ক্ষেত আর চাষী, ড্রয়িং-রুমে সন্ধ্যা কাটানো আর মাঝ রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়া।”

ভাবলাম, “না, ওঁর আনন্দ বিহ্বলতা ও মধুর সব সখের জিনিসের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত বল-নাচ ছেড়ে দেবো, গুচ্ছির প্রিন্সের তোষামোদে কাজ নেই।” পার্টিতে যাবো না, যেতে চাই না ওঁকে বলি ভাবলাম; ঠিক সে সময়ে হঠাৎ উনি মুখ তুললেন, দেখতে পেলেন আমাকে।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল, চলে গেল মুখের সেই কোমল বিষণ্ণ ভাবটা। চাউনিটা অন্তর্ভেদী, বিজ্ঞ, তাতে একটা মুরুব্বী গোছের ধীরস্থির ছাপ। আমার কাছে সহজ সরল মানুষ হতে চান না উনি, হতে চান দেবতা-বিশেষ — চান একটা বেদীর ওপর খাড়া হয়ে থাকতে।

শান্তভাবে আমার দিকে ঘুরে অবহেলা ভরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী হয়েছে লক্ষ্মী বলো তো?’

চুপ করে রইলাম। নিজেকে গোপন রাখছেন, যেমনটা ওঁকে দেখতে ভালোবাসি তেমনভাবে ধরা দিতে চান না — বিরক্ত লাগল।

‘শনিবার পার্টিতে যেতে চাও?’ জিজ্ঞেস করলেন।

‘চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার ও সব ভালো লাগে না; আর তাছাড়া গোছগাছ হয়ে গেছে,’ বললাম।

‘মঙ্গলবার পর্যন্ত থেকে যাবো; ওদের বলবো জিনিসপত্র খুলে ফেলতে, ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পারো। তোমার মর্জি। আমি যাবো না।’ আমার দিকে তাকালেন, এত কঠিনভাবে কখনো তাকাননি, এত কঠিন সুরে আমার সঙ্গে কথা বলেননি কখনো আগে।

উত্তেজিত হলে বরাবর যেমন, তাড়াতাড়ি পায়চারি করতে শুরু করলেন, আমার দিকে আর তাকালেন না।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে নড়লাম না, ওঁকে দেখতে দেখতে বললাম, ‘তোমাকে সত্যি আমার বোঝা দায়। মুখে তো বল তোমার কখনো অস্থির লাগে না,’ (কথাটা কখনো বলেননি উনি) ‘তবে আমার সঙ্গে এমন অদ্ভুতভাবে কথা বলছ কেন? তোমার জন্যে পার্টিতে

যাবার সুখটা ত্যাগ করতে আমি রাজী, আর তুমি কিনা আমাকে যেতে জোর করছ — বিদ্রূপের সুরে বলছ, আমার সঙ্গে কখনো এমনভাবে কথা তুমি বলোনি।'

'বটে! তুমি ... তুমি তো আত্মত্যাগ করছ (কথাটায় বেশ জোর দিলেন) ... আমিও তাই করছি। এর চেয়ে মধুর আর কী হতে পারে? দিলদরাজ হওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা। আহা কী সুখের সংসার আমাদের, তাই না!'

এরকম তিক্ত বিদ্রূপ এই প্রথম ওঁর মুখে শুনলাম। বিদ্রূপে আমার লজ্জা হল না — অপমানিত লাগল, ওঁর তিক্ততায় ভয় পেলাম না, সে তিক্ততা সঞ্চারিত হল আমার মধ্যে। এই মানুষটি কি সত্যি উনি? আমাদের দুজনের সম্পর্কে যাতে কোনো রকম কৃত্রিমতা না আসে তা নিয়ে এত ভাবিত ছিলেন যিনি, যিনি সর্বদাই এত সহজ সরল ও আন্তরিক, সেই তিনি কি এটা বলছেন? আর বলছেন কেন? ওঁর খাতিরে আমার এই সুখটা সত্যি ত্যাগ করতে চাই বলে? সে সুখে কোনো ক্ষতি তো দেখছি না। এক মিনিট আগে এত ভালো করে ওঁকে বুঝতে পেরেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম এত তীব্রভাবে, সেজন্য? দুজনের ভূমিকা বদলে গিয়েছে — এখন উনি সরাসরি সহজ কথা বলতে চান না, বলতে চাইছি আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'কত বদলে গিয়েছ তুমি। তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি? পার্টিটা আসল ব্যাপার নয় — আমার বিরুদ্ধে তোমার মনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো অভিযোগ আছে। কপটতা করে কী হবে? আগে তো সেটাকে তুমি ডরাতে। আমার বিরুদ্ধে তোমার যা বলার আছে খুলে বলো।' ভাবলাম, "এবার একটা কিছু বলতে হবে ওঁকে।" উনি বকতে পারেন এমন কিছু করিনি সারা শীতকাল, ভেবে আমার আত্মপ্রসাদ হল।

ঘরের মাঝখানে গেলাম, যাতে পায়চারির সময় কাছ ঘেঁষে যেতে হয় ওঁকে, তাকালাম ওঁর দিকে। মনে হল কাছে এসে উনি আমাকে জড়িয়ে ধরবেন, ব্যস, তাহলে সব মিটমাট হয়ে যাবে; উনি কত ভুল করেছেন

দেখিয়ে দেবার সুযোগ হারাবো ভেবে এমন কি দুঃখ হল। কিন্তু উনি ঘরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু বোঝোনি?'

'না।'

'তাহলে খুলে বলি। জীবনে এই প্রথম আমার একটা বোধ হচ্ছে, বোধটা জানি ঘৃণাকর, কিন্তু বোধ না করে পারছি না ...' থামলেন উনি, নিজের কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় স্পষ্টত ভয় পেয়েছেন নিজে।

'তার মানে?' শুধালাম, রাগে চোখে জল এসে গিয়েছে।

'প্রিন্স তোমাকে খাসা চেহারার মেয়ে ভাবেন সেটা ঘৃণাকর, আর সেটা ভাবেন বলে তুমি উতলা হয়ে দৌড়চ্ছ তাঁর কাছে, স্বামীর কথা, নিজের কথা, নারী হিসেবে নিজের মর্যাদা কিছু তোমার মনে নেই, সেটা ঘৃণাকর; তোমার আত্মমর্যাদা না থাকলে তোমাকে নিয়ে স্বামীর মনের অবস্থাটা বোঝো না, সেটা ঘৃণাকর। বোঝা দূরের কথা, তুমি এসে আমাকে বললে কিনা ত্যাগ স্বীকার করছ, অর্থাৎ "হুজুরকে নিজের রূপটা দেখাতে পারলে বেজায় খুশি হতাম, কিন্তু তোমার খাতিরে সে সুখটা ত্যাগ করছি।"'

যত বলছেন তত নিজের কণ্ঠস্বরে বাড়ছে ওঁর ক্রোধ, আর সে কণ্ঠস্বর বিষাক্ত নিষ্ঠুর কর্কশ। এ রকম অবস্থায় আগে কখনো দেখিনি ওঁকে, দেখবার প্রত্যাশা কখনো করিনি। আমার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। ভয় পেলাম বটে, কিন্তু অন্যায় অবমাননা ও লাঞ্ছিত গর্বের একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করল আমাকে, শোধ তুলতে চাইলাম ওঁর ওপর।

'এ রকমটা হবে অনেকদিন জানতাম,' বললাম। 'বলো, বলে যাও।'

'তুমি কী জানতে আমি জানি না,' উনি বলে চললেন। 'এই নির্বোধ সমাজের যত নোংরামি, আলস্য আর বিলাসের মধ্যে তোমাকে দিনের পর দিন দেখে সবচেয়ে খারাপটা ঘটবে আমার ধরে নেওয়া উচিত ছিল, আর এখন সেটা ঘটেছে। এতদিন কোনো বাধা দিইনি, কিন্তু আজকের মতো অপমানিত ও আহত আর কখনো বোধ করিনি; আহত হয়েছিলাম তখন যখন তোমার বান্ধবী ইতরভাবে ঈর্ষার কথা বলতে শুরু করলেন — আমার ঈর্ষার কথা — আর সেটা কাকে নিয়ে? এমন একটা লোককে নিয়ে

যাকে আমি চিনি না, তুমি চেনো না। আর তুমি ইচ্ছে করে আমাকে বোঝো না, আমার জন্যে আত্মত্যাগ করতে চাও তুমি — আর কী করে?.. তোমার জন্যে লজ্জা হয়, যে ভাবে নিজেকে খেলো করছ তাতে লজ্জা হয়। আত্মত্যাগ বটে!' কথাটার পুনরুক্তি করলেন উনি।

"স্বামীর অধিকার তাহলে এই!" আমি ভাবলাম। "যে মেয়ে কোনো দোষ করেনি তাকে অপমান করা, তাকে খেলো করা! এই হল স্বামীর অধিকার। কিন্তু আমি সইব না সেটা!"

বললাম, 'না, তোমার জন্যে কিছু ত্যাগ করবো না।' নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল অস্বাভাবিকভাবে, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'শনিবার পার্টিতে যাবো — যাবোই যাবো।'

'প্রাণ খুলে উপভোগ করে নিও, কিন্তু তোমার আমার মধ্যে এই শেষ,' ক্রোধের অসংযত আবেগে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি! 'তুমি আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারবে না। আমি নির্বোধের মতো কাজ করেছি এতদিন ...' আবার বলতে শুরু করলেন, কিন্তু ওঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা শেষ করলেন না, নিজেকে স্পষ্টত অনেক চেষ্টা করে সামলালেন।

সে মুহূর্তটিতে ওঁকে ভয় পেলাম, ঘৃণা করলাম। ওঁর নানা অপমানের শোধ তোলার জন্য অনেক কিছু বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মুখ খুললে কেঁদে ফেলতাম, তাতে ওঁর চোখে হেয় হয়ে যেতাম। কোনো কথা না বলে ঘর থেকে চলে গেলাম। কিন্তু যেই ওঁর পদধ্বনি আর কানে এল না, আমাদের মধ্যে যা ঘটেছে তার জন্য ভয়ার্ত লাগল। আমার সমস্ত সুখের ডোর যদি চিরকালের জন্য ছিন্ন হয়ে যায়, ভেবে ভীষণ শঙ্কিত হলাম। মনে হল ফিরে যাই ওঁর কাছে।

"কিন্তু ওঁর কাছে গিয়ে নিঃশব্দে যদি হাত বাড়িয়ে দিই, চোখে চোখ রাখি, তাহলে উনি কি শান্ত হয়ে গিয়ে আমাকে বুঝবেন? বুঝতে পারবেন আমার উদারতা? আমার দুঃখকে ভণ্ডামি যদি বলেন? কিম্বা উনি নিজে ঠিক, এই বিশ্বাসে আমার অনুশোচনাকে গ্রহণ করেন, যেন অনুগ্রহ করছেন এমন গর্বিতভাবে আমাকে মাপ করেন? যাঁকে এত

ভালোবাসি সেই মানুষ কী করে এমন নিষ্ঠুর অপমান আমাকে করতে পারল ?..”

ওঁর কাছে গেলাম না। নিজের ঘরে গিয়ে একলা অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হয়েছে তার প্রতিটি শব্দ আবার মনে করলাম গভীর বিভীষিকায়, সে-সব কথার বদলে বসালাম, যোগ করলাম অন্যান্য শব্দ, ভালো সব কথা — আবার যা ঘটেছিল তা বিভীষিকায়, অপমানে মনে ফিরে এল। সেদিন সন্ধ্যায় ঘর ছেড়ে যখন চা খেতে গেলাম তখন ‘স’এর উপস্থিতিতে স্বামীর সঙ্গে দেখা হল, ‘স.’ আমাদের কাছে এসেছিলেন; মনে হল আজ থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্যবধান এসেছে। কবে যাচ্ছি ‘স.’ জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

‘মঙ্গলবার,’ আমাকে উত্তর দেবার সময় না দিয়ে বলে উঠলেন আমার স্বামী। ‘আমরা কাউণ্টেস “র”এর পার্টিতে যাচ্ছি। তুমি যাচ্ছ তো?’ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন।

ওঁর বলার ধরনটা এত নিরাসক্ত যে ভয় পেয়ে ওঁর দিকে ভীরু দৃষ্টিতে তাকালাম। ওঁর দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ, চাউনিটা ক্রুদ্ধ, বিদ্রূপে ভরা, গলাটা অবিচলিত, কঠিন।

‘হ্যাঁ,’ বললাম জবাবে।

সন্ধ্যেবেলায় আমরা দুজন যখন একলা, উনি আমার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

‘তোমাকে যা বলেছি তা ভুলে যেও,’ বললেন অস্ফুটকণ্ঠে।

হাতটা হাতে নিলাম। ঠোঁটে এল থরথর মৃদু হাসি, চোখ ছাপিয়ে জল আসছে, কিন্তু হাতটা টেনে নিলেন উনি, যেন ভাবের আতিশয্যে ওঁর আতঙ্ক; বেশ দূরের একটা কেদারায় বসে পড়লেন। তাহলে উনি যা করেছেন এখনো ঠিক বলে ভাবেন? পার্টি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা, ওখানে না যাবার অনুরোধটা মুখে এসেছিল, সেটা আর বলা হল না।

‘যাওয়া পিছিয়ে দিয়েছি মাকে লিখতে হবে, না হলে উনি উদ্বিগ্ন বোধ করবেন,’ উনি বললেন।

‘কবে যাবো ভাবছ?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘মঙ্গলবার, পার্টির পর।’

'সেটা আশা করি আমার খাতিরে করছ না,' ওঁর চোখে চোখ রেখে বললাম, কিন্তু উনি শুধু তাকালেন, সে চোখে কোনো জবাব নেই, যেন একটা পর্যায় ঢাকা পড়েছে ওঁর চোখ। হঠাৎ ওঁর মুখটা বুড়োটে, অপ্রীতিকর মনে হল।

পার্টিতে গেলাম দুজন, দুজনের সম্পর্কটা আবার যেন হৃদ্য, কিন্তু আগেকার থেকে একেবারে আলাদা।

পার্টিতে দুজন মহিলার মাঝখানটায় বসে আছি, প্রিন্স এলেন, তাই কথা বলার জন্য দাঁড়াতে হল। দাঁড়িয়ে কিছু না ভেবেই আমার স্বামীর দিকে চোখ গেল, দেখলাম হলের অন্য প্রান্ত থেকে আমার দিকে একবার তাকিয়ে উনি ঘুরে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ভীষণ লজ্জা আর ব্যথা পেলাম, ভয়ানক বিব্রত লাগল, প্রিন্সের চোখের সামনে আমার মুখ আর গলা আরক্ত হয়ে উঠল। মাথায় লম্বা প্রিন্স, সে জন্য দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনতে হল। কথাবার্তা বেশীক্ষণ হয়নি অবশ্য; আমার পাশে বসার জায়গা ছিল না, তাছাড়া তাঁর সান্নিধ্যে আমার অস্বস্তিটা হয়ত তিনি টের পেয়েছিলেন। কথা হল আগের বলের সম্বন্ধে, গ্রীষ্মকালে আমি কোথায় থাকি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে উনি জানালেন যে আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে চান, দেখলাম হলের ওদিকে দুজনের দেখা হল, দুজনে কথা বলছেন। আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু বলে থাকবেন প্রিন্স, কেননা কথাবার্তার মধ্যে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে একবার হাসলেন তিনি।

হঠাৎ আমার স্বামী লাল হয়ে উঠলেন, নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে প্রিন্সের কাছ থেকে চলে গেলেন। আমারো মুখ লাল হয়ে উঠল; আমার বিষয়ে, বিশেষ করে আমার স্বামীর বিষয়ে কী ধারণা হল প্রিন্সের ভেবে লজ্জা হল। মনে হল প্রিন্সের সঙ্গে আলাপের সময় আমার অস্বস্তি আর লজ্জা-লজ্জা ভাবটা, আর আমার স্বামীর বিচিত্র ব্যবহার সবাই লক্ষ্য করেছে। ভগবান জানেন, কারণটা কী করে বুঝবে ওরা। স্বামীর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছিল ওরা কি জানে?

ওঁর খুড়তুতো বোন বাড়ি পেঁাছিয়ে দিলেন আমাকে, পথে ওঁর বিষয়ে দুজনের মধ্যে কথা হল। পারলাম না নিজেকে আর চেপে রাখতে, এই

অলক্ষুণে পার্টিটা নিয়ে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, সব বলে দিলাম। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন মনোমালিন্যটা অতি সাধারণ একটা ব্যাপার, কোন চিহ্ন রেখে যাবে না। আমার স্বামীর স্বভাব তিনি যেমনটা বুঝেছিলেন তেমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মতে, উনি ভয়ানক দাম্ভিক আর অমিশুক হয়ে উঠেছেন। আমিও সায় দিলাম, মনে হল ওঁকে আরো ভালো করে, নিরাসক্তভাবে নিজে বুঝতে শুরু করেছি।

কিন্তু যখন শুধু উনি আর আমি, আর কেউ নেই, তখন ওঁর বিষয়ে আমার এই বিচার বিবেকে পাপের বোঝার মতো হয়ে রইল, অনুভব করলাম দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান আরো বেড়ে গিয়েছে।

৮

সেদিন থেকে আমাদের জীবনে, আমাদের দুজনের সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। পরস্পরের সান্নিধ্যে আগেকার সে প্রীতি আর নেই। অনেক বিষয়ে কথা এড়িয়ে চলতাম দুজনে, তৃতীয় কেউ থাকলে কথাবার্তাটা সহজতর হত, দুজনে থাকলে নয়। গ্রামের জীবন বা বলের বিষয়ে কথা উঠলেই মনে হত ক্ষুদে ক্ষুদে শয়তান উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে, চোখে চোখ পড়াটা তখন অস্বস্তিকর। দুজনের মধ্যেকার ব্যবধানটা কোথায় জানতে দুজনের যেন বাকি নেই, সেটার কাছে আসতে ভয়। উনি যে দাম্ভিক, রগ-চটা তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, যাতে না চটেন সাবধানে থাকতে হবে। আর উনি নিঃসন্দেহ যে উঁচু সমাজ বাদ দিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, গ্রামের জীবনে আমার অরুচি, তাই আমার নিচু রুচি মানিয়ে চলতে হবে ওঁকে। তাই এ সব বিষয় দুজনে এড়িয়ে চলতাম, পরস্পরকে মিথ্যা বিচার চলত। পৃথিবীতে আমাদের মতো নিখুঁত লোক আর নেই, বহুদিনই সে ভাবটা কেটে গেছে। অন্যদের সঙ্গে পরস্পরের তুলনা করি, গোপনে বিচার করি পরস্পরকে।

পিটার্সবুর্গ ছাড়ার আগে অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি; নিকলস্কয়েতে না গিয়ে সহরের বাইরে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। সেখান থেকে আমার স্বামী একা মায়ের কাছে চলে গেলেন। যখন গেলেন তখন ওঁর

সঙ্গে যাবার মতো শরীর ভালো হয়েছিল, কিন্তু উনি আমাকে বলে কয়ে রেখে গেলেন, যেন আমার শরীর নিয়ে উনি চিন্তিত। মনে হল আমার শরীর নিয়ে চিন্তাটা নয়, উনি ভেবেছিলেন গ্রামে আমাদের ঠিক সুবিধে হবে না; বেশী জোর করলাম না, রয়ে গেলাম।

উনি নেই, একলা লাগত, জীবনটা ফাঁকা-ফাঁকা, কিন্তু উনি যখন ফিরে এলেন অবাক হয়ে দেখলাম ফিরে-আসাটায় আমার জীবনে আগেকার মতো কোনো পরিবর্তন এল না। তখনকার দিনগুলিতে কোন ভাব বা ধারণায় ওঁকে ভাগ না দিলে মন-মরা হয়ে যেতাম, যেন অপরাধ করেছি; ওঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা মনে হত সমগ্র সুন্দর, চোখে চোখ রাখলে হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত দুজনার, সেই সব দিন আর নেই। আমাদের সম্পর্কটা এত অলক্ষিতে বদলে গেল যে তার অন্তর্ধানটা কেউ টের পেলাম না। আমাদের দুজনের আলাদা আলাদা আগ্রহ আর ঝোঁক দেখা দিল, বিনিময়ের চেষ্টা আর নেই। দুজনের পৃথিবী একেবারে আলাদা, সম্পর্করহিত, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালাম না। অবস্থাটা গা-সওয়া হয়ে গেল, বছরখানেকের মধ্যে বিনা কুণ্ঠায় তাকাতে পারতাম পরস্পরের দিকে। আমার সান্নিধ্যে ওঁর সেই উচ্ছল ফূর্তি আর রইল না, রইল না সেই ছেলেমানুষি, সবকিছু মেনে নেবার সেই মনোভাব, সেই ঔদাসীন্য যেটা এককালে আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকত। আমাকে বিব্রত ও খুশি করা ওঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষেপ আর নেই। দুজনে একসঙ্গে প্রার্থনা আর করি না, বুনো উচ্ছ্বাসের সে আক্ষেপ আর নেই; দুজনের দেখা হত খুব কম, কাজে প্রায় চলে যেতেন উনি, আমাকে একলা রেখে যেতে ওঁর কোনো দুঃখ বা ভয় নেই। আমি উচ্চ সমাজে বারবার যেতাম, সেখানে ওঁকে আমার দরকার নেই।

দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মনোমালিন্য আর হয় না। ওঁকে খুশি করার চেষ্টা করতাম, আমার সব ইচ্ছে পূরণ করতেন উনি; মনে হত দুজনে দুজনকে ভালোবাসি।

দুজনে যখন একলা, তেমনটা ঘটত কম, তখন আনন্দ, বিক্ষোভ বা বিভ্রমের কোনো অনুভূতি আমার হত না; যেন আমি নিজে শুধু আছি, উনি নেই। উনি যে আমার স্বামী, অচেনা লোক নন, উনি যে ভালো

লোক, উনি আমার স্বামী, নিজের মতো করে চিনি ওঁকে, সেটা বিলক্ষণ জানতাম। উনি কী করবেন বা বলবেন, কী করে আমার দিকে চাইবেন, সব আমার জানা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। যদি অন্য কিছু একটা করতেন, অন্যভাবে তাকাতেন আমার দিকে, আমি যেভাবে ভেবেছিলাম তেমন করে নয়, মনে হত উনি একটা ভুল করেছেন। ওঁর কাছ থেকে কিছুই আশা করতাম না। এক কথায়, উনি আমার স্বামী, আর কিছু নন। ভাবতাম এ রকমটা হওয়াই তো উচিত, স্বামীস্ত্রীরা সর্বদাই এ রকম, আমাদের দুজনের সম্পর্ক বরাবর এ রকমটাই ছিল।

উনি চলে গেলে বিশেষ করে প্রথমে নিঃসঙ্গ লাগত, ভয় পেতাম, তখন ওঁর সাহায্যের দরকারটা বেশী করে বোধ করতাম। ফিরে এলে মহাখুশি হয়ে জড়িয়ে ধরতাম ওঁকে, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক বাদে খুশির কথাটা মনে থাকত না একেবারে, ওঁর সঙ্গে কথা বলার মতো কিছু থাকত না। শুধু অনুরাগের শান্ত সংযত মুহূর্তগুলিতে মনে হত কী যেন বেঠিক হয়ে গিয়েছে; বুকটা ভারি হয়ে উঠত, মনে হত ওঁর দৃষ্টি একই কথা বলছে। জানতাম আমাদের অনুরাগের একটা সীমা আছে, সেটা উনি ছাড়িয়ে যেতে চান না, আর আমি পারি না। মাঝে মাঝে সে জন্য মনটা মুষড়ে যেত, কিন্তু ও নিয়ে ভাবার সময় কোথায়; পরিবর্তন যে ঘটেছে সেই উপলব্ধির বিষণ্নতা ভুলে যেতে চেষ্টা করতাম আমোদপ্রমোদে, আমোদপ্রমোদের দুয়ার তো অবারিত।

উচ্চ সমাজের চাকচিক্য আর তোষামোদ প্রথমে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, বেশীদিন যেতে না যেতে সে সমাজ আচ্ছন্ন করে দিল আমাকে, আভ্যাসিক হয়ে দাঁড়াল। দৃঢ় নিগড়ে আমাকে বাঁধল সে সমাজ, জুড়ে বসল আমার অন্তরে, যে অন্তর আবেগের জন্য উন্মুখ ছিল এককালে। একা নিজে কখনো থাকতাম না, নিজের অবস্থার কথা ভাবতে সাহস হত না। সকালে দেরী করে উঠে অনেক রাত্তির পর্যন্ত সর্বক্ষণ ব্যস্ত, সে সময় আমার নিজের নয়, বাড়ির বাইরে না গেলেও তাই। এ সবে না পেতাম মজা, না লাগত একঘেয়ে। ধরে নিয়েছিলাম এই ঠিক, সারা জীবন এভাবে কাটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তিন বছর কেটে গেল, আমাদের সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন এল না। যেন ছাঁচে বাঁধা, জমে গিয়েছে, সে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে না, ভালো হতে পারে না। এই তিন বছরের মধ্যে আমাদের সংসারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, কিন্তু তাতে আমার জীবনে কোনো অদলবদল এল না। ঘটনা দুটি হল আমার প্রথম সন্তানের জন্ম ও তাতিয়ানা সেমিওনভনার মৃত্যু। মায়ের ভালোবাসা প্রথমে আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসল, আনল এমন অপ্রত্যাশিত আনন্দের উচ্ছ্বাস যে ভাবলাম নতুন জীবন শুরু হবে। দু মাসের মধ্যে আবার উচ্চ সমাজে যাতায়াত শুরু হল, তখন অনুভূতিটা ফিকে হয়ে এল, শেষে দাঁড়াল অভ্যাসে, নিছক কর্তব্য সম্পাদনে। আমার ছেলে হবার পর স্বামী কিন্তু আগেকার মতো শান্ত, তৃপ্ত ঘরকুনো হয়ে পড়লেন, ওঁর আগেকার স্নেহ আর আনন্দের লক্ষ্যবস্তু হল বাচ্ছাটি। বল-গাউন গায়ে বাচ্ছার ঘরে গিয়েছি ক্রুশ-চিহ্ন করার জন্য, প্রায় দেখতাম আমার স্বামী সেখানে বসে আছেন, যেভাবে তাকাতেন আমার দিকে মনে হত তাতে ভর্ৎসনার, কঠিন জিজ্ঞাসার একটা ছাপ, আর লজ্জা হত। ছেলের প্রতি আমার উদাসীনতায় হঠাৎ বিবেকটা মুচড়ে উঠত, শুধাতাম নিজেকে, "আমি তাহলে সত্যি সত্যি অন্য মেয়েদের চেয়ে খারাপ? কিন্তু কী আর করা যায়? ছেলেকে ভালোবাসি কিন্তু তা বলে তো সারাদিন ওর পাশে বসে কাটাতে পারি না — একঘেয়ে লাগবে। তাছাড়া, ভান আমি করবো না, কিছুতেই করবো না।"

মায়ের মৃত্যুতে উনি ভয়নক শোক পেয়েছিলেন। বললেন মা নেই, নিকলস্কয়েতে থাকা ওঁর পক্ষে এখন কঠিন। আমার কিন্তু মা নেই বলে গ্রামের জীবনযাত্রা আরো প্রীতিকর, আরো শান্তিপূর্ণ মনে হল, অবশ্য তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ হয়েছিল, স্বামীর শোকে মায়া হত। সেই তিন বছরের বেশীর ভাগ সময়টা সহরে কাটল। একবার দু মাসের জন্য দেশে গিয়েছিলাম, তৃতীয় বছরে গেলাম বিদেশে।

গ্রীষ্ম কাটল একটা স্পা-তে।

আমার বয়স তখন একুশ। মনে হল আমাদের অবস্থা অত্যন্ত চমৎকার। পারিবারিক জীবন থেকে যতটা পাই তার বেশী আমার চাই না। মনে হল আমার চেনা-পরিচিতরা সবাই আমাকে ভালোবাসে; শরীরস্বাস্থ্য ঠিক;

স্পাতে আমার চেয়ে ভালো সাজ কারুর নেই; নিজের চেহারাটা ভালো জানি; চারিদিকে সৌন্দর্য আর সৌষ্ঠবের আমেজ; নিজেকে খুব উপভোগ করছিলাম। নিকলস্কয়েতে এককালে আমার মনে যেমন আনন্দ ছিল তেমনটি আর নেই; তখন নিজে যা শুধু তাই হতে পেরে সুখী লাগত, মনে হত সুখে আমার অধিকার, সুখ যতখানি হোক না কেন, আরো বেশী হওয়া উচিত; সুখ, আরো সুখের জন্য উতলা ছিলাম তখন। তখন ছিল অন্য রকম, কিন্তু এখনও বেশ। কিছু চাই না আমার, প্রত্যাশা করি না কিছুর, ভয় নেই কোনো, জীবনটা মনে হল ভরাট, বিবেকে শান্তি।

সে মরশুমটায় নবীনদের ভিড়ে বিশেষ করে চোখে পড়তে পারে এমন কাউকে দেখলাম না, এমন কি আমার প্রণয়াকাঙ্খী আমাদের রাষ্ট্রদূত সেই প্রবীণ প্রিন্স 'ক'ও নয়। কারুর বয়স কম, কারুর বা বেশী; একজন সোনালি-চুল ইংরেজ, আর একজন ফরাসী, ছোট্ট দাড়ি তাঁর। তাঁরা সবাই আমার কাছে সমান আর সবাইকে আমার দরকার। সবায়ের এক ধরনের নির্বিকার ভাব, আমার জীবনযাত্রায় আনন্দের উপাদান জোগাত তারা। শুধু একজন আমাকে অন্যদের তুলনায় বেশী আকর্ষণ করতেন, অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে আমার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করতেন বলে। তিনি হলেন মার্কিস 'দ', ইতালীয়। নাচছি বা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছি, হয়ত বা কাসিনোয় গিয়েছি, তিনি আমার সঙ্গ পাবার আর আমার চেহারাটা যে কত ভালো জানাবার কোনো সুযোগ হারাতেন না।

জানলা থেকে কয়েকবার দেখেছি আমাদের বাড়ির সামনেটায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, চকচকে চোখের অপ্রীতিকর একাগ্র চাউনিটায় রক্তিম হয়ে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিতাম। ভদ্রলোকের বয়স কম, চেহারাটা ভালো, বেশ সুষ্ঠু লোক, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো জিনিস হল, তাঁর হাসি আর কপাল আমার স্বামীর কথা মনে করিয়ে দিত। তাঁর চেয়ে সুন্দর বটে, তবু সাদৃশ্যটা অবাক করে দিয়েছিল আমাকে, যদিও আমার স্বামীর সহৃদয় ধীরস্থির মধুর মুখভাবের জায়গায় ভদ্রলোকের চেহারায় ঠোঁট, চাউনি, লম্বাটে চিবুক, সব মিলিয়ে স্থূল ও পাশবিক কিছু একটা ছিল। তখন বিশ্বাস হয়েছিল তিনি আমাকে গভীর আবেগে ভালোবাসেন,

সেটা টের পেয়ে জাঁক আর অনুকম্পার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভাবতাম তাঁর কথা। সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়েসুঝিয়ে আধা-বন্ধুত্বের একটা সংযত মনোভাবের অবস্থায় তাঁকে আনতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু যতবার সে চেষ্টা করেছি ততবার আমাকে ব্যাহত করে নিজের অব্যক্ত আবেগে বিশ্রীভাবে বিব্রত করে দিতেন, — সে কামনা যে কোন মুহূর্তে তাঁর মুখ ফুটে বেরিয়ে আসার জন্য উদগ্রীব। মনে মনে ভয় করতাম মানুষটিকে, অবশ্য সেটা নিজের কাছে মানতাম না, তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায়ই ভাবতাম তাঁর কথা। তাঁর সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় ছিল, চেনা-পরিচিতদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ওঁর ব্যবহারটা ছিল বিশেষ করে উদাসীন ও উদ্ধত; চেনা-পরিচিতরা অবশ্য ওঁকে দেখত শুধু আমার স্বামী হিসেবে।

মরশুমের শেষের দিকে আমার অসুখ হল, বাড়িতে বন্দী রইলাম দু সপ্তাহ। সেরে ওঠার পর সন্ধ্যায় প্রথম বার একটি সঙ্গীতের আসরে গিয়েছি, শুনলাম লেডি 'স' এসেছেন; এই নামজাদা সুন্দরীটির আসার অপেক্ষায় সবাই ছিল বহুদিন। আমাকে অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল, কিন্তু আরো বড়ো একটি দলের কেন্দ্র হলেন নতুন রূপসীটি, আশেপাশের সবায়ের মুখে তাঁর রূপের কথা ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁকে দেখিয়ে দিল আমাকে, দেখলাম সত্যি সত্যি তিনি মোহিনী, কিন্তু তাঁর আত্ম-প্রসাদের ভাবটা আমার অপ্রীতিকর মনে হল, বললামও তাই। সেদিন সন্ধ্যায় সবকিছু একঘেয়ে ঠেকল, যে সবকিছু আগে ছিল ফূর্তিতে ভরা।

পরদিন দুর্গ-প্রাসাদে যাবার আয়োজন করলেন লেডি 'স', আমি যেতে রাজী হলাম না। বলতে গেলে কেউ-ই আমার সঙ্গে থেকে গেল না, আমার চোখে সবকিছুর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। সবকিছু, সবাইকে মনে হল বোকা-বোকা, বিরক্তিকর। মনে হল কাঁদি, চিকিৎসা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেশে ফিরে যাই। অন্তরে একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি, অবশ্য নিজের কাছে সেটা তখনো স্বীকার করলাম না। দুর্বল শরীরের দোহাই দিয়ে উচ্চ সমাজে যাওয়া ছেড়ে দিলাম; শুধু সকালে মাঝে মাঝে যেতাম খনিজ জল খেতে কিম্বা হয়ত আমার পরিচিত একটি রুশী মহিলা, 'ল. ম.'র সাথে গাড়ি চেপে আশেপাশের গ্রামে বেড়াতাম।

আমার স্বামী তখন হাইদেলবের্গে গিয়েছেন কয়েক দিনের জন্য; আমার চিকিৎসার শেষে রাশিয়ায় ফিরে যাবার অপেক্ষায় ছিলেন। উনি মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসতেন।

একদিন লেডি 'স' সবাইকে নিয়ে গেলেন শিকারে, দুপুরের খাবারের পর 'ল. ম.' আর আমি গাড়ি চেপে গেলাম দুর্গ-প্রাসাদে। আস্তে আস্তে গাড়ি চলেছে। সড়কটা প্রাচীন চেস্টনাট গাছের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে, অস্তরবির আলোয় দীপ্ত, বাদেনের আশেপাশের সুন্দর মাঠঘাটের আভাস গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে। দুজনের মধ্যে সিরিয়াস কথাবার্তা শুরু হল, এ রকম কথাবার্তা আগে তাঁর সঙ্গে কখনো হয়নি। 'ল. ম.'র সঙ্গে আমার আলাপ অনেক দিনের, কিন্তু এই প্রথম বুঝলাম যে তিনি এত সদয় ও বুদ্ধিমতী, মনের কথা খুলে বলা যায় তাঁকে, বন্ধু হিসেবে তাঁকে পাওয়াটা প্রীতিকর।

পরিবার, ছেলেপুলে আর এখানকার অর্বাচীন জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প হল। দুজনের ইচ্ছে রাশিয়ায় ফিরে গেলে হয়, ফিরে গেলে হয় সেখানকার গ্রামে; এল মধুর বিষণ্ণ একটা ভাব, দুর্গ-প্রাসাদে যখন ঢুকলাম তখনো সে ভাবটা যায়নি।

ভেতরটা ঠাণ্ডা, ছায়াঘন; ওপরে যেখানে ধ্বংসাবশেষে রোদের খেলা সেখান থেকে আসছে কাদের যেন পায়ের আর গলার আওয়াজ। দরজায় যেন ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে বাদেনের প্রাকৃতিক দৃশ্য — দেখতে সুন্দর, তবে আমাদের কাছে, রুশীর পক্ষে ঠাণ্ডা। জিরোতে বসলাম দুজনে, নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম অস্তরবির দিকে।

গলার আওয়াজ আরো স্পষ্ট হয়ে এল, মনে হল কে যেন আমার নাম উচ্চারণ করছে। কান পেতে শুনলাম, প্রতিটি কথা কানে এল। লোকগুলির গলা আমার চেনা: মার্কিস 'দ' ও তাঁর একটি ফরাসী বন্ধু, তাঁকে আমিও চিনি। আমার ও লেডি 'স'র বিষয়ে আলাপ চলেছে। ফরাসীটি আমাদের দুজনের তুলনা চালিয়েছেন, কোন ধাঁচের রূপ আমাদের তার বিশ্লেষণ চলেছে। খারাপ কিছু তিনি বললেন না, কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। আমার ও লেডি 'স'র চেহারার নানা গুণের বিচার খুঁটিয়ে ফরাসীটি করলেন: আমার

বাচ্চা আছে, কিন্তু লেডি ‘স’র বয়স মাত্র ঊনিশ; আমার খোঁপা তাঁর তুলনায় ভালো, কিন্তু লেডি ‘স’র গঠন আরো লাবণ্যময়; লেডি ‘স’র খানদানি আছে আর “আপনার বন্ধু এই একরকম — অনেক ক্ষুদে রুশী প্রিন্সেস এখানে প্রায়ই আসতে শুরু করেছেন, তাঁদের একজন”, লেডি ‘স’র সঙ্গে তাল ঠোকার চেষ্টা না করে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি, বাদেনে আমার বারোটা বেজে গেছে, এই বলে ফরাসীটি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

‘ওর জন্যে দুঃখ হয়।’ কঠোর ও ফূর্তির হাসি হেসে ফরাসীটি যোগ করলেন, ‘শুধু আপনার কাছেই সান্ত্বনা যদি খুঁজত ও!’

‘ও এখান থেকে চলে গেলে পিছু পিছু আমি যাবো,’ ইতালীয় উচ্চারণ ভঙ্গীতে অমার্জিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

‘সুখী মানুষ বটে! এখনো প্রেমের ক্ষমতা ধরেন!’ হেসে বললেন ফরাসী ভদ্রলোকটি।

‘প্রেম!’ বলে থেমে গেল সেই কণ্ঠস্বর।

‘ভালো না বেসে পারি না। জীবনের উদ্দেশ্য তো তাই: জীবনকে রোমান্সে পরিণত করার মতো ভালো কাজ আর কী আছে। আর আমার রোমান্স মাঝ পথে কখনো থেমে যায় না। হালের রোমান্সটির জের শেষ পর্যন্ত টানবো।’

‘Bonne chance, mon ami,’* বললেন ফরাসী ভদ্রলোকটি।

আর কিছু শোনা গেল না, কোণ ঘুরে ওঁরা চলে গেলেন, অন্যদিক থেকে এল ওঁদের পায়ের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মিনিট কয়েকের মধ্যে পাশের একটা দরজা হয়ে বেরিয়ে এলেন, আমাদের দেখে অত্যন্ত অবাক। মার্কিস ‘দ’ আমার কাছে আসাতে আরক্ত হয়ে উঠলাম, দুর্গ-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আমার হাত ধরাতে অত্যন্ত খারাপ লাগল। কিন্তু না বলতে পারলাম না, মার্কিসের বন্ধু ও ‘ল. ম.’র পিছন পিছন দুজনে চললাম গাড়ির দিকে। ফরাসীটির কথায় খুব চটেছিলাম, যদিও মনে মনে নিজে যা অনুভব করতাম সেটাই বলেছিলেন উনি। কিন্তু আমাকে অবাক আর ক্রুদ্ধ করেছিল মার্কিসের অমার্জিত বলার ধরনটা। ওঁর কথা শুনে

* ভাগ্য প্রসন্ন হোক আপনার, বন্ধুবর! (ফরাসী ভাষায়)

ফেলেছি তবু মার্কসের কোনো ভয় নেই, এটা ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল। আমার এত কাছে তিনি থাকাতে ঘৃণায় মনটা ভরে গেল। তাকালাম না তাঁর দিকে, কথার জবাব দিলাম না, হাতটা এমনভাবে ধরলাম যাতে চাপ না পড়ে, তাড়াতাড়ি চললাম 'ল. ম.' আর ফরাসীর পিছন পিছন। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য, আমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাঁর অপ্রত্যাশিত আনন্দ, এ ধরনের কী সব বলছিলেন মার্কস, কিন্তু তাতে কান দিলাম না। মনে হচ্ছিল স্বামীর কথা, ছেলের কথা, রাশিয়ার কথা। নিজেকে নিয়ে আমার লজ্জা, কীসের অনুশোচনা, কী যেন আমার চাই, তাড়াতাড়ি Hôtel de Bade'এ আমার ছোট্ট ঘরে ফিরে একলা বসে অব্যাহতভাবে মনের কথা সবকিছু ভেবেচিন্তে দেখার তাড়া আমার। কিন্তু 'ল. ম.' হাঁটছেন আস্তে আস্তে, গাড়ি তখনো বেশ দূরে, আর আমার সঙ্গী মনে হল ইচ্ছে করে আস্তে চলেছেন, যেন আমাকে আটকিয়ে রাখতে চান। "তা হতে পারে না!" এই ভেবে আরো দ্রুত চললাম। কিন্তু তিনি সত্যি সত্যি আমাকে বাধা দিলেন, এমন কি আমার হাতে চাপ দিলেন পর্যন্ত। 'ল. ম.' রাস্তার একটা বাঁক ঘোরাতে আমরা দুজনে একলা হয়ে পড়লাম। ভয় পেলাম আমি।

'মাপ করবেন,' কঠিন গলায় বলে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আস্তিনের লেসটা আটকে গেল তাঁর জ্যাকেটের বোতামে। তিনি আমার বুকের কাছ ঘেঁষে ঝুঁকে পড়ে লেসটা ছাড়াতে লাগলেন, তাঁর দস্তানাহীন আঙুল লাগল আমার হাতে। নতুন একটা অনুভূতিতে — অনুভূতিটা হয়ত বিভীষিকার, হয়ত বা প্রীতির — আমার শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। চাইলাম তাঁর দিকে, তাঁর প্রতি আমার সমস্ত অবজ্ঞা আনতে চাইলাম সে কঠোর দৃষ্টিতে, কিন্তু তার বদলে আমার চাউনিতে প্রকাশ পেল ভয় আর বিক্ষোভ। তাঁর আর্দ্র, জ্বলন্ত চোখ একেবারে আমার মুখ ঘেঁষে, আকাঙ্খায় চেয়ে আছে আমার গ্রীবায় আমার বুকে; দুটো হাতে আদর করছেন আমার বাহুদেশে, ঠোঁট খুলে অস্ফুটভাবে কী যেন বললেন — বললেন আমাকে ভালোবাসেন, আমি তাঁর সর্বস্ব। ঠোঁটদুটো আরো কাছে এল, তপ্ত হাতে আরো জোরে চেপে ধরলেন আমার হাত; আমার সমস্ত শরীরে আগুনের স্রোত, সবকিছু অন্ধকার

হয়ে গেল; থরথর করে কেঁপে উঠলাম, বাধা দেবার চেষ্টা করে কী বলতে গেলাম, কিন্তু কথাগুলো গলায় আটকে গেল।

হঠাৎ গালে লাগল তাঁর ঠোঁট, কম্পিত কঠিন দেহে দাঁড়িয়ে তাকালাম তাঁর দিকে। নড়াচড়ার কথা বলার ক্ষমতা নেই — গভীর বিভীষিকায় কী একটার প্রতীক্ষায় আছি, কী যেন চাইছি। মুহূর্তকাল কাটল এভাবে, ভয়ঙ্কর সে মুহূর্তটি। সে মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে দেখলাম তাঁকে; তাঁর মুখটা আমার এত চেনা — খড়ের টুপির কিনারের নিচে সেই নিচু কপাল, আমার স্বামীর সঙ্গে যার এত মিল; সুন্দর খাড়া নাক, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র; মোম-দেওয়া দীর্ঘ গোঁফ, আর নুর, কামানো মসৃণ গাল, রোদে তামাটে গলা। ঘৃণা হল তাঁর প্রতি, ভয় হল, আমার কাছে তিনি অত্যন্ত বিজাতীয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি না বিক্ষোভ আর বাসনা আমার মধ্যে জাগিয়েছে এই বিজাতীয়, ঘৃণ্য লোকটি! তাঁর স্থূল সুন্দর ঠোঁটের চুম্বনে, আংটি-পরা, নীলচে সূক্ষ্ম শিরাকীর্ণ হাতের আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করার কী অদম্য বাসনা হল! আমার সামনে হঠাৎ খুলে-যাওয়া, আমাকে হাতছানি দেওয়া নিষিদ্ধ আনন্দের নর্দমায় ঝাঁপিয়ে পড়ার কী না কামনা!

ভাবলাম, "আমি তো হতভাগিনী; আরো দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়লে কী এসে যায়।"

এক হাতে আমাকে জড়িয়ে মুখ নিচু করলেন মার্কিস। ভাবলাম, "আমার মাথায় আরো লজ্জা, আরো পাপ যদি ভেঙে পড়ে পড়ুক গে।"

'Je vous aime,'* ফিসফিস করে তিনি বললেন, গলাটা প্রায় অবিকল আমার স্বামীর মতো। স্বামীর আর সন্তানের কথা মনে পড়ল বহুকাল আগে চেনা প্রিয় জনের মতো, তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে যেন। হঠাৎ শুনলাম রাস্তার বাঁক থেকে 'ল. ম.' আমায় ডাকছেন। আত্মস্থ হয়ে হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে তাঁর কাছে প্রায় ছুটে চলে গেলাম, মার্কিসের দিকে তাকালাম না।

---

* আপনাকে আমি ভালোবাসি। (ফরাসী ভাষায়)

গাড়িতে ঢুকলাম আর তখনি শুধু একবার চাইলাম তাঁর দিকে। টুপি খুলে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে হাসি, কী যেন বলছেন। সে মুহূর্তে তাঁর প্রতি কী অসহ্য বিতৃষ্ণা বোধ করলাম সেটা তাঁর জানার কথা নয়।

নিজের জীবনটা অত্যন্ত অসুখী মনে হল, আমার ভবিষ্যৎ আশাহীন, আর আমার অতীতে কী তমসা! 'ল. ম.' কথা বলছিলেন, কী বলছেন মাথায় ঢুকল না। মনে হল আমার প্রতি করুণা বোধ করছেন, আমার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা গোপন করার জন্য শুধু কথা বলছেন। প্রতিটি কথায়, প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে তাঁর সে অবজ্ঞা আর অপমানকর করুণা বোধ করলাম। গালের যেখানটায় মার্কিস চুমো খেয়েছিলেন সেখানটা জ্বলছে লজ্জায়, স্বামী ও সন্তানের চিন্তাটা অসহ্য।

ভেবেছিলাম ঘরে একলা বসে নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখবো, কিন্তু ভয় হল একলা থাকতে। চা দিয়েছিল, সেটা শেষ না করেই, কেন তা না ভেবে ভীষণ তাড়ায় বাঁধাছাঁদা শুরু করলাম সন্ধ্যার ট্রেনে হাইদেলবের্গে স্বামীর কাছে যাবার জন্য।

পরিচারিকার সঙ্গে ফাঁকা কামরায় ঢুকলাম, ট্রেন ছাড়ল, জানলা থেকে তাজা হাওয়ার ঝলক; তখন নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আগের চেয়ে স্পষ্টভাবে ভাবতে পারলাম। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আসার পর থেকে আমাদের দাম্পত্য জীবনটা নতুন আলোয় ধরা পড়ল আমার কাছে, বিবেকদংশন বোধ করলাম। ঠিক বিয়ের পর গ্রামে আমাদের জীবনযাত্রা, সে সময়কার আমাদের সব পরিকল্পনা এই প্রথম মনে ফিরে এল স্পষ্টভাবে, আর এই প্রথম নিজেকে শুধালাম, এতদিন কী সুখটা উনি পেয়েছিলেন? ওঁর কাছে অপরাধী ঠেকল নিজেকে। "কিন্তু উনি আমাকে রুখলেন না কেন?" জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে। "কেন আমার সঙ্গে ভণ্ডামী করলেন? আমাকে বোঝাবার চেষ্টা এড়িয়ে গেলেন কেন? কেন হেয় করলেন আমাকে? আমার ওপর ওঁর ভালোবাসার ক্ষমতা কেন জারি করলেন না? হয়ত আমাকে উনি ভালোবাসেন না?" কিন্তু যত দোষ উনি করে থাকুন না, অন্য মানুষটির চুম্বনের দাগ আমার কপোলে, সে দাগ এখনো বোধ করছি। হাইদেলবের্গ যত এগিয়ে আসছে তত স্পষ্টভাবে স্বামীকে মনে পড়ছে, ওঁর সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের কথায় তত আতঙ্ক।

ভাবলাম, "সবকিছু ওঁকে বলবো, আমার অনুশোচনার অশ্রুতে উনি ক্ষমা করবেন আমাকে," কিন্তু 'সবকিছুটা' কী বলব ওঁকে আমার নিজের জানা নেই; তাছাড়া উনি যে ক্ষমা করবেন সেটাও বিশ্বাস হল না।

ঘরে ঢুকে ওঁর শান্ত অথচ বিস্মিত মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে ওঁকে বলার, ওঁর কাছে স্বীকার করার, ওঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই আমার। আমার অব্যক্ত বিষাদ ও অনুতাপ বুকে বইতে হবে আমাকে।

'কী করে টের পেলে বলো তো?' উনি বললেন। 'ভাবছিলাম কাল তোমার কাছে যাবো,' তারপর আমাকে আরো ভালো করে দেখে যেন ভয় পেলেন। 'কী হয়েছে? কিছু ঘটেছে নাকি?' জিজ্ঞেস্ করলেন।

'কিছু হয়নি,' বললাম, কোনোক্রমে চোখের জল চেপে। 'আমি একেবারে চলে এলাম। কালই রওনা দিতে রাজী, ঘরে ফেরা যাক।'

দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে চুপ করে রইলেন উনি, গভীর মনোযোগে আমাকে দেখলেন।

'কিন্তু কী হয়েছে বলো তো,' আর একবার বললেন।

আপনা থেকে আরক্ত হয়ে উঠে চোখ নামিয়ে নিলাম। ওঁর চোখে নিমেষের জন্য এল ক্রোধ ও অপমানের একটা ঝলক। উনি মনে মনে কী ভাবছেন কল্পনা করে দারুণ ভয় হল, ছলনা করে বললাম, ছলনার এত ক্ষমতা যে আমার আছে কখনো জানিনি...

'হবে আবার কী — শুধু একঘেয়ে আর খারাপ লাগছিল, আমাদের জীবনের কথা, তোমার কথা অনেক ভেবেছি। তোমার কাছে অনেক দিন অপরাধী! যে সব জায়গায় তুমি নিজে যেতে চাও না, সেখানে আমাকে নিয়ে যাও কেন? সত্যি, তোমার কাছে অনেক দিন অপরাধী,' আবার বললাম, আবার চোখে জল এল। 'চলো গ্রামে ফিরে যাই বরাবরের মতো।'

'সেণ্টিমেণ্টাল হবার দরকার নেই,' কঠিন গলায় উনি বললেন। 'টাকাকড়ি বেশী নেই, তাই গ্রামে ফিরে যেতে চাও বলে আমি খুশি, কিন্তু ওখানে বরাবর থাকা, সেটা শুধু স্বপ্ন। আমি জানি, ওখানে তুমি

টিকে থাকতে পারবে না। চা খাওয়া যাক এখন — সেটাই সবচেয়ে ভালো,' চাকরকে ডাকার জন্য উনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমার সম্বন্ধে কী ভাবতে পারেন কল্পনা করলাম। ইতস্তত এবং একটু লজ্জিতভাবে আমার দিকে ওঁর তাকানো দেখে কী না ভীষণ সব ধারণা ওঁতে আরোপ করেছিলাম! অত্যন্ত অপমানিত লাগল। না, উনি আমাকে বোঝেন না, বুঝতে চান না। খোকাকে দেখে আসি বলে চলে এলাম ওঁর কাছ থেকে। একলা থাকতে চাই, কাঁদতে চাই, শুধু কাঁদতে ...

৯

নিকলস্কয়ের ফাঁকা, বহুদিন তাপবিহীন সেই বাড়িটায় জীবন ফিরে এল আবার, কিন্তু এককালে যা ওখানে প্রাণবন্ত ছিল তার জীবন আর ফিরে এল না। মা তো অনেক দিনই নেই, আমরা দুজনে একলা, মুখোমুখি দুজনে; কিন্তু নিভৃত বাসের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই এখন, নৈঃসঙ্গের গুরুভার আমাদের ওপর। শীত কাটল খারাপভাবে: আমার অসুখ হল, শরীর সারল শুধু দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর। স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহরে যেমন তেমন নিরাসক্ত হৃদ্যতার, কিন্তু এখানে, গ্রামে, বাড়ির মেঝের সব কটি তক্তা, সমস্ত দেয়াল, প্রত্যেকটি ডিভান মনে করিয়ে দিত উনি এককালে আমার কী ছিলেন আর কী হারিয়েছি আমি। যেন দুজনের মধ্যে অন্যায়ের একটা ব্যবধান, সে অন্যায়ের মার্জনা মেলেনি — যেন কিছু একটার জন্য আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন উনি আর ভান করছেন সে বিষয়ে কিছু জানেন না। ওঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার মতো কিছু ছিল না, ছিল না করুণা ভিক্ষা করার কোনো কারণ: আমাকে ওঁর সমস্ত সত্তা, সমস্ত অন্তর আগেকার মতো আর দেন না, এই হল আমার শাস্তি। কিন্তু ওঁর অন্তর তো উনি কাউকে, কোনো কিছুতে দেন না — যেন সেটার অস্তিত্ব নেই আর। মাঝে মাঝে মনে হত শুধু আমাকে কষ্ট দেবার জন্য উনি ভান করে যাচ্ছেন, পুরোনো সে অনুভূতি এখনো ওঁর মধ্যে জাগ্রত, চেষ্টা করতাম সে অনুভূতিকে জাগিয়ে দিতে। কিন্তু উনি মন-খুলে কথা এড়িয়ে চলতেন,

মনে হত ওঁর সন্দেহ যে আমি ভান করছি, আর ভাবাবেগের প্রকাশকে হাস্যকর কিছু একটা বলে ডরাতেন। ওঁর দৃষ্টি, ওঁর কথা বলার ধরন জানাত: সবকিছু, সমস্ত কিছু আমার জানা আছে, বলার দরকার নেই, তুমি যা বলতে চাও এমন কি সেটা পর্যন্ত জানি। জানি তুমি মুখে এক আর কাজে অন্য। আমার সঙ্গে মন-খুলে কথা বলতে ভয় পান বলে প্রথম প্রথম রাগ হত, কিন্তু পরে এটা ধরে নেওয়া আমার অভ্যেস হয়ে গেল যে ভয় নয়, মন-খুলে কথা বলার তাগিদ নেই ওঁর। আমি নিজেও তো চট করে বলতে পারবো না তোমাকে ভালোবাসি, একসঙ্গে প্রার্থনা করতে বলতে পারি না, বলতে পারি না আমার বাজনা শোনো। আমাদের দুজনের পারস্পরিক ব্যবহার শিষ্টাচারের কয়েকটি নিয়মে বাঁধা। দুজনের জীবন আলাদা। ওঁর নিজের কাজকর্ম ছিল, তাতে যোগদান করার কোন দরকার নেই আমার, করবার ইচ্ছেও ছিল না। আমি সময় কাটাতাম আলস্যে, তাতে উনি আর চটতেন না, বিষণ্ণ বোধ করতেন না। ছেলেদুটির বয়স এত কম যে আমাদের দুজনকে এক করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বসন্ত এল, গ্রীষ্ম কাটাবার জন্য সনিয়া ও কাতিয়া এসে পড়ল। নিকলস্কয়ের বাড়িতে মেরামত চলেছে, আমরা গেলাম পক্রভস্কয়ে। আগেকার সেই পুরনো বাড়ি, সেই বারান্দা, আলো-ভরা ড্রয়িং-রুমে লম্বা টেবিল আর পিয়ানো, জানলায় শাদা পর্দা লাগানো আমার পুরনো ঘর, সেখানে আমার সব কিশোরী স্বপ্ন, যেন ভুলে ফেলে রেখে এসেছি। দুটো ছোট্ট খাট সে ঘরে — একটা আমার পুরনো খাট, ককোশা গোলগাল হাত ছড়িয়ে শুয়ে থাকত সেখানে আর আমি তার ওপরে ক্রুশ-চিহ্ন করতাম সন্ধ্যেবেলায়; আর একটা ক্ষুদে খাটে কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে ভানিয়ার ছোট্ট মুখ উঁকি মারত। ওদের ওপরে ক্রুশ-চিহ্ন করে শব্দহীন ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতাম, যৌবনের ভুলে-যাওয়া পুরনো সব স্বপ্ন হঠাৎ যেন ভিড় করে ফিরে আসত ঘরের কোণ, দেয়াল আর পর্দা থেকে। শুনতে পেতাম কৈশোরের পুরনো সব গান। আমার স্বপ্নগুলি কোথায় গেল? কী হল প্রিয়, মধুর গানগুলির? যে সবের আশা পর্যন্ত করতে ভয় হত সে সব রূপ নিয়েছে। আমার ভাসা-ভাসা, চঞ্চল স্বপ্নগুলি

পরিণত হয়েছে বাস্তবে, বাস্তব রূপ নিয়েছে কঠোর, কঠিন, নিরানন্দ জীবনে। আর সবকিছু থেকে গিয়েছে আগেকার মতো — জানলা দিয়ে চোখে পড়ে সেই বাগান, সেই লন, সেই পথ, খাদের ধারে সেই বেঞ্চ, পুকুরের ধারে গান-গাওয়া সেই নাইটিংগেল, ফোটা লাইলাকের সেই বাহার আর বাড়ির ওপরে সেই চাঁদ। আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু কী ভীষণ, কী অসম্ভব বদলে গিয়েছে! সবকিছু এত নিকট আর প্রিয় হতে পারত, কিন্তু সবকিছু কত না নিরাসক্ত!

আগেকার দিনের মতো কাতিয়ার সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে ওঁর কথা চলে মৃদু কণ্ঠে। কিন্তু কাতিয়ার মুখ রেখাকীর্ণ, পীতাভ, চোখে আর আনন্দ ও আশার দীপ্তি নেই, তাতে বরং বিষণ্ণ মমতা ও অনুতাপের ছাপ। আগেকার মতো ওঁকে নিয়ে আমরা আর উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখাই না; ওঁর বিচার করি আমরা। কেন আমরা এত সুখী সে নিয়ে আর ভেবে আকুল হই না, যা ভাবি সারা জগতকে জানিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই আর আগেকার মতো। দুজনে ফিসফিস করে কথা চলে, যেন চক্রান্তকারী, বারবার পরস্পরকে বারবার শুধাই, সবকিছু এমন করুণভাবে বদলে গেল কেন? আর উনি তো ঠিক আগেকার মতন, শুধু কপালের রেখা আরো গভীর, রগের ওপরের চুলে আরো পাক ধরেছে, আর ওঁর গভীর, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সর্বদা আমার কাছে ঝাপসা মেঘের আড়ালে। আমিও তো ঠিক আগেকার মতো, কিন্তু হৃদয়ে ভালোবাসা নেই, নেই ভালোবাসার বাসনা। কাজের কোনো দরকার নেই আমার, নিজেকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই। আমার সেই পুরনো ধর্মপ্রবণ উচ্ছ্বাস, ওঁর প্রতি আমার পুরনো অনুরাগ, আমার জীবনের সেই আগেকার পরিপূর্ণতা কত না দূর আর অসম্ভব মনে হয়! এককালে যেটা এত স্পষ্ট আর সত্য মনে হয়েছিল — অপরের জন্য বাঁচার সুখ — সেটা আর বুঝবো না এখন। নিজের জন্য পর্যন্ত বাঁচতে চাই না, অপরের জন্য আবার বাঁচা!

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাবার পর গানবাজনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু পুরনো পিয়ানোটা, পুরনো সঙ্গীত আবার আমাকে টানতে লাগল।

শরীর ভালো ছিল না বলে একদিন বাড়িতে একলা রয়েছি। কাতিয়া ও সনিয়া বাড়ি মেরামত কেমন চলেছে দেখার জন্য ওঁর সঙ্গে গিয়েছে নিকলস্কয়ে। টেবিলে চা রাখা হল। নিচে গিয়ে ওদের অপেক্ষা করছি, পিয়ানোর পাশে বসলাম। বীঠোফেনের 'quasi una fantasia' সোনাটাটা খুলে বাজাতে শুরু করলাম। দেখার বা শোনার কেউ নেই, বাগানের দিকের জানলাগুলো খোলা, পরিচিত বিষণ্ণ গম্ভীর শব্দে ঘর ভরে গেল। প্রথম পালা শেষ হল, কিছু না ভেবে শুধু অভ্যাস বশে তাকালাম ঘরের কোণে, ওখানটায় বসে উনি আমার বাজনা শুনতেন। ওখানে উনি নেই। চেয়ারটা তখনো সেখানে, বহুদিন নড়াচড়া করা হয়নি সেটিকে; জানলা দিয়ে চোখে পড়ল সূর্যাস্তের আলোয় স্পষ্ট লাইলাকের একটা ছোট ঝোপ, খোলা জানলা দিয়ে এল সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া। পিয়ানোতে কনুই রাখলাম, হাতে মুখ ঢেকে ভাবতে লাগলাম। অনেকক্ষণ কাটল সেখানে, যে অতীত আর কখনো ফিরবে না তার কথা যন্ত্রণায় ভাবলাম, ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাবলাম ভীরুভাবে। সামনে যেন এরি মধ্যে কিছু নেই। মনে হল আমার কিছু বাসনা নেই, কোন আশা নেই। "আমার জীবন তাহলে ফুরিয়ে গিয়েছে?" ভাবলাম, ভয়ে মাথা তুলে আবার বাজালাম, ভুলে যেতে চাই, ভাবতে চাই না আমি, কিন্তু আবার সেই পুরনো মন্থর সুর। মনে মনে বললাম, "হে ভগবান, দোষ যদি করে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, আমার অন্তরের সেই সব সুন্দর বোধ ফিরিয়ে দাও আমায়; না হলে কী করতে হবে, কী ভাবে বাঁচতে হবে জানিয়ে দাও।"

কানে এল ঘাসে গাড়ির চাকার আওয়াজ, গাড়ি-বারান্দায়, তারপর বারান্দায় পরিচিত সতর্ক পায়ের শব্দ, তারপর সব থেমে গেল। কিন্তু পরিচিত পদধ্বনি আগেকার সেই অনুভূতি আর জাগাল না। বাজনা শেষ হল, পিছনে শুনলাম পায়ের শব্দ, কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল।

'কী সুন্দর বাজালে সোনাটাটা,' উনি বললেন।

জবাব দিলাম না।

'চা খাওনি?'

মাথা নাড়লাম ওঁর দিকে না চেয়ে, যাতে আমার মুখে আবেগের ছাপ ধরা না পড়ে ওঁর কাছে।

'ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে, ঘোড়াটা এত ছটফট করছিল যে গাড়ি ছেড়ে ওরা সোজা পথ ধরে আসছে,' উনি বললেন।

'ওদের জন্যে তাহলে অপেক্ষা করি,' বলে বারান্দায় গেলাম, আশা ছিল উনি অনুসরণ করবেন; কিন্তু উনি শুধু বাচ্চাদের কথা জিজ্ঞেস করে তাদের কাছে গেলেন। ওঁর উপস্থিতি, ওঁর সদয়, অবিচলিত কণ্ঠস্বর আমাকে জানিয়ে দিল যে কিছু হারিয়েছি ভাবাটা আমার ভুল। আর কী চাইতে পারি আমি? উনি সদয় ও নম্র, স্বামী হিসেবে ভালো, পিতা হিসেবে যোগ্য — আর কী চাই আমার? নিজেই জানি না। বারান্দায় গিয়ে চাঁদোয়ার নিচে বেঞ্চে বসলাম, এই বেঞ্চে বসে প্রথম আমাদের প্রেমের বোঝাপড়া হয়েছিল। সূর্য ডুবে গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসছে। বাড়ি আর বাগানের ওপরে বসন্তের কালো মেঘ, শুধু গাছগুলোর ওপারে সূর্যাস্তের মুমূর্ষু আলোয় উদ্ভাসিত, সবেমাত্র ওঠা শুকতারায় খচিত আকাশের একটি পরিষ্কার ফালি। হালকা মেঘের ছায়া সবকিছুর ওপরে, সবকিছু এক পশলা বাসন্তী বৃষ্টির প্রতীক্ষায়। হাওয়া পড়ে গেল, গাছের পাতা, ঘাসের শীষ নড়ছে না একটিও; লাইলাক আর বার্ড-চেরির গন্ধ এত জোরালো যে মনে হয় হাওয়ায় মুকুল ধরেছে; কখনো পাতলা, কখনো জোরালো ঢেউ-এর পর ঢেউ-এ আসা গন্ধে বাগান আর বারান্দা ভরে গেল। ইচ্ছে হয় চোখ বুজে ফেলি, কিছু না দেখে, কিছু না শুনে বুক ভরে গন্ধ নিই শুধু। তখনো না-ফোটা ডালিয়া আর গোলাপগুলো কালো কেয়ারিতে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে যেন চাঁচ বেড়া হয়ে আস্তে আস্তে উঠছে। খাদে ব্যাঙের তীব্র কর্কশ ডাক, যেন এই শেষ ডাকছে, বৃষ্টিতে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে জলে। সমস্ত সোরগোল ছাপিয়ে উঠছে একটি তীক্ষ্ণ, পাতলা স্বর। এ জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যেতে যেতে নাইটিংগেলগুলো পরস্পরকে ডাকছে উৎকণ্ঠায়। এ বসন্তে আবার একটি নাইটিংগেল, ভেবেছিল জানলার নিচে ঝোপে বাসা বাঁধবে, বাইরে গিয়ে শুনলাম বাগান-পথের ওখানে

সরে গিয়ে পাখিটা ডাকছে; কাঁপা গলায় একবার ডেকে চুপ করে গেল, ও-ও প্রতীক্ষা করছে।

বৃথায় নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম: আমিও কিছুর প্রতীক্ষায় আছি, অনুশোচনায় বুক ভরে গিয়েছে।

নিচে নেমে এসে উনি আমার পাশটায় বসলেন।

'মেয়েগুলো ভিজে সপসপে হবে মনে হচ্ছে,' বললেন।

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বললাম। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম দুজনে।

হাওয়া নেই, ক্রমশ নিচুতে নেমে এল মেঘগুলো; সবকিছু আরো স্তব্ধ, আরো গন্ধে-ভরা। হঠাৎ ক্যানভাসের চাঁদোয়ায় এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে যেন ছিটকে চলে গেল। আর একটি ফোঁটা পথের কাঁকরে। কাঁটা ঝোপের চওড়া পাতায় কয়েকটি ফোঁটার ছপাৎ শব্দ, তারপর শুরু হল ঝরঝরে বৃষ্টি, ক্রমশ ছাঁট বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল নাইটিংগেল আর ব্যাঙের ডাক; শুধু সেই উচ্চ পাতলা স্বরটি আকাশে তখনো উঠছে, বৃষ্টির জন্য মনে হল আরো দূর থেকে, আর বারান্দার কাছে শুকনো পাতার আড়ালে একটা পাখির নিয়মিত, একঘেয়ে দুটো পর্দায় ডাক। উনি উঠে পড়লেন, ভেতরে যাবার জন্য।

'কোথায় যাচ্ছ?' বাধা দিয়ে বললাম। 'এখানটা তো বেশ সুন্দর।'

'ওদের ছাতা আর গালোশ পাঠিয়ে দিতে হবে,' উনি জবাব দিলেন।

'দরকার হবে না, এক্ষুণি বৃষ্টি থেকে যাবে।'

কথাটা মেনে নিলেন উনি, বারান্দার রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে।

ভিজে পেছল রেলিং-এ হাতের ভর দিয়ে ক্যানভাসের নিচে থেকে মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম। চুলে, গলায় ঝরঝরে বৃষ্টির অস্থির ছিটে। ওপরের কালো মেঘটা নিজের ভার মোচন করে ক্রমশ পাতলা আর লঘু হয়ে এল, বৃষ্টির নিয়মিত ঝমঝম শব্দের বদলে এল আকাশ আর পাতা থেকে ঝরা বিরল ফোঁটার টপটপ আওয়াজ। আবার নিচে ব্যাঙের ডাক; আবার ভিজে ঝোপে নাইটিংগেলগুলো ভরসায় বুক বেঁধে ডাকতে শুরু করল পরস্পরকে। চারিদিক পরিষ্কার হয়ে এল।

'কী চমৎকার!' রেলিং-এ বসে, আমার ভিজে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উনি বললেন।

সহজ আদরটা আমার কাছে তিরস্কারের মতো, কান্না পেল আমার।

'মানুষের আর কী চাই?' উনি বললেন। 'আমার পরিতৃপ্তির সীমা নেই এখন — আর কিছু চাই না আমি। আমি সম্পূর্ণ সুখী।'

মনে মনে ভাবলাম, "সুখের বিষয়ে এ কথাটা আগে তো বলতে না তুমি। বলতে, সুখ যত হোক না কেন, আরো কী যেন চাই। আর এখন তুমি শান্ত, পরিতৃপ্ত, অথচ আমার হৃদয়ে অব্যক্ত হতাশা আর রুদ্ধ কান্না।" বললাম:

'আমিও ভালো আছি, কিন্তু সবকিছু এত ভালো বলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমার ভেতরটায় সবকিছু এত গোলমেলে, এত অসম্পূর্ণ; এখানকার সবকিছু এত সুন্দর, এত স্থির, তবু সব সময়ে আমার কিছু একটা চাই। প্রকৃতির আবেশ তোমার অন্তরে বিষণ্ণ প্রীতির মতো কিছু একটা জাগায় না, যেন অসম্ভব কিছু একটা চাইছ, কী একটা হারিয়ে গিয়েছে বলে তোমার মন খারাপ হয় না?'

আমার মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন উনি।

যেন কিছু মনে পড়েছে এমনভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, ও রকমটা হত এককালে, বিশেষ করে বসন্তের সময়ে। রাত্তিরে ঘুম আসত না আমারো, কিসের আশায় আর প্রতীক্ষায় থাকতাম — সুন্দর ছিল সে সব রাত্রি!.. কিন্তু তখন সবকিছু আমার সামনে ছিল, আর এখন সবকিছু পেছনে ফেলে এসেছি; এখন যা আছে তাই নিয়ে আমি সন্তুষ্ট, আমি বেশ তৃপ্ত।'

এত বিশ্বাসে, এত হালকাভাবে শেষ করলেন উনি যে কথাটায় ব্যথা পেলেও মনে হল সত্যি বলছেন।

'তাহলে তোমার আর কিছু চাই না?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অসম্ভব কিছু চাই না,' আমার মনোভাবটা ধরতে পেরে উত্তর দিলেন।

'মাথাটা ভিজে যাচ্ছে,' আরো বললেন, শিশুকে যেমন আদর করে তেমন ভাবে আবার চুলে একবার হাত বোলালেন। 'গাছের পাতা আর ঘাস বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে বলে ওদের ওপর তোমার হিংসে — তোমার ইচ্ছে পাতা আর ঘাস আর বৃষ্টির মতো হওয়া। কিন্তু ওদের শুধু দেখে আমি সন্তুষ্ট, যা কিছু নবীন, সুন্দর আর সুখী তা দেখে আমি খুশি।'

'অতীতের কোন কিছুর জন্যে তোমার অনুশোচনা হয় না?' জিজ্ঞেস করলাম, মনে হল বুকটা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে।

আবার চুপ করে উনি ভাবতে লাগলেন। বুঝলাম উনি চান একেবারে অকপটভাবে উত্তর দিতে।

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব এল।

'কথাটা সত্যি নয়, সত্যি নয় কথাটা!' বলে, ফিরে ওঁর চোখে চোখ রাখলাম। 'অতীতের জন্যে তোমার দুঃখ হয় না?'

'না!' আবার বললেন উনি। 'অতীতের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, দুঃখিত নই।'

'কিন্তু সেদিন আবার ফিরে আসুক ইচ্ছে হয় না তোমার?' শুধালাম।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাগানের দিকে উনি চেয়ে রইলেন।

'তার ইচ্ছে নেই, যেমন পাখা গজাবার ইচ্ছে নেই।' উনি বললেন। 'ওটা হয় না।'

'অতীত সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিযোগ নেই? নিজেকে বা আমাকে কখনো দোষ দাও না?'

'কখনো না! যা হয়েছে সবকিছু ভালোর জন্যে হয়েছে।'

'শোনো,' ওঁর হাত ছুঁয়ে বললাম, যাতে উনি আমার দিকে তাকান। 'তুমি — যেমনটা উচিত মনে করো তেমনভাবে আমি থাকি তুমি চাও, কখনো আমাকে সেটা বলোনি কেন? কেন আমাকে স্বাধীনতা দিলে? সে স্বাধীনতা কী করে কাজে লাগাতে হয় আমার অজানা ছিল। কেন আমাকে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করলে? যদি তুমি চাইতে — যদি আমাকে

পথ দেখাতে, তাহলে কিছু ঘটত না, কিছু ঘটত না।' কঠিন বিরক্তি আর ভর্ৎসনায় মুখর আমার কণ্ঠস্বর, পুরনো অনুরাগে নয়।

'কী ঘটত না?' অবাক হয়ে, আমার দিকে ফিরে উনি জিজ্ঞেস করলেন। 'কিছু তো ঘটেনি। সমস্ত কিছু ভালো, খুব ভালো,' হেসে যোগ করলেন।

ভাবলাম, আমাকে বোঝেন না উনি, তাই কি? কিম্বা যেটা আরো খারাপ, হয়ত বুঝতে চান না? চোখে জল এসে গেল।

'তাহলে বিনা অপরাধে এই যে তোমার উদাসীনতা আর এমন কি অবজ্ঞার শাস্তি আমাকে যে বইতে হয়, সেটা হত না,' বলে উঠলাম। 'আমি নির্দোষ, তবু যা কিছু আমার প্রিয় আমার কাছ থেকে যে তুমি নিয়ে নিয়েছ, সেটা হত না।'

'কী বলছ তুমি, মণি?' যেন আমাকে বোঝেননি এমনভাবে উনি জিজ্ঞেস করলেন।

'বাধা দিও না, বলতে দাও আমাকে ... আমার ওপর তোমার বিশ্বাস, তোমার ভালোবাসা, এমন কি তোমার শ্রদ্ধা পর্যন্ত সরিয়ে নিয়েছ, যা ঘটেছে তারপর আমি বিশ্বাস করি না তুমি আমাকে ভালোবাস। দাঁড়াও, আমাকে এতদিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছে যে সর্বকিছু সব তোমাকে খুলে বলতে হবে এখখুনি,' উনি আবার বলার চেষ্টা করাতে বাধা দিলাম। 'জীবন কী আমার জানা ছিল না, তা জানার জন্যে একলা আমাকে ছেড়ে দিলে, সেটা কি আমার দোষ?.. এখন কী দরকার সেটা বুঝি, প্রায় একবছর ধরে তোমার কাছে ফিরে আসার সব রকম চেষ্টা করছি আর তুমি আমাকে হটিয়ে দিচ্ছ, যেন আমি কী চাই তুমি বোঝো না, সেটা কি আমার দোষ? আর সেটা এমনভাবে করো যে তোমাকে তিরস্কার করা চলে না, একমাত্র আমি দোষী আর অসুখী থেকে যাই। হ্যাঁ, তুমি আমাকে এমন একটা জীবনে আবার ঠেলে ফেলে দিতে চাও যাতে দুজনের অমঙ্গল হতে পারে।'

'কী থেকে এটা তোমার মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি অবাক আর শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন উনি।

'তুমিই না কাল বললে যে এখানে আমি কখনো টিঁকে থাকতে পারবো

না? বার বার বলো যে শীতকালে আমাদের সেন্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে যেতে হবে, যে সেন্ট পিটার্সবুর্গে আমার ঘেন্না। সাহায্য করা দূরের কথা, তুমি মন-খুলে আমাকে কখনো কিছু বলো না, তোমার মুখে কখনো অন্তরঙ্গ কোমল কথা শুনি না। আর পরে যখন আমি গোল্লায় যাবো তখন তুমি আমাকে দোষ দেবে, গোল্লায় গিয়েছি বলে খুশি হবে।'

'দাঁড়াও,' কঠিন, কঠোর সুরে উনি বললেন। 'যা বলছ এখন, সেটা ভালো কথা নয়। এতে শুধু প্রমাণ হয় যে আমার প্রতি তোমার মনোভাব বিরূপ, আর তুমি ...'

'তোমাকে ভালোবাসি না? বলো, বলো!' কথাটা শেষ করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বেঞ্চে বসে রুমালে মুখ ঢাকলাম।

ফোঁপানিতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, চাপার চেষ্টা করতে করতে ভাবলাম, তাহলে উনি আমাকে এইভাবে বোঝেন? "আমাদের সেই ভালোবাসা শেষ, আর নেই", কথাটা কে যেন বারবার বলতে লাগল আমাকে। উনি আমার কাছে এলেন না, সান্ত্বনা দিলেন না। আমার কথায় উনি চটেছেন। ওঁর কণ্ঠস্বর শান্ত কঠিন।

'জানি না কীসের জন্যে তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ,' শুরু করলেন। 'আগেকার মতো তোমাকে ভালোবাসি না, এইজন্য হয়তো।'

'আগেকার মতো!' রুমালে মুখ ঢেকে অস্ফুট কণ্ঠে আমি বললাম, তিক্ত অশ্রু আরো ছাপিয়ে এল।

'তাহলে দোষ দিতে হয় সময়কে, আর নিজেদের। আলাদা আলাদা সময়ে প্রেমের চেহারা আলাদা হয় ...' একটু থামলেন উনি। 'সত্যি কথাটা তাহলে খুলে বলবো? খোলাখুলি কথায় যদি তোমার একান্ত ইচ্ছে ... যে বছরে প্রথম তোমাকে চিনলাম সে বছরে তোমার কথা ভেবে, তোমার ভালোবাসার স্বপ্নে অনেক রাত্তির ঘুমোইনি। নিজে নিজের ভালোবাসা সৃষ্টি করেছি আর আমার বুকে ক্রমশ সে ভালোবাসা বেড়েছে। আর ঠিক তেমনভাবে সেন্ট পিটার্সবুর্গে আর বিদেশে, যে ভালোবাসা আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে তাকে ভেঙেচুরে শেষ করে অনেক ভয়াবহ বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি। ভালোবাসা শেষ হয়নি, শুধু যেটা আমাকে

যন্ত্রণা দিচ্ছিল তার অবসান ঘটিয়েছি; শান্তি পেলাম, আর এখনো তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসাটা অন্য ধরনের।'

'সেটাকে তুমি ভালোবাসা বলতে পারো, কিন্তু আসলে সেটা যন্ত্রণা,' অস্ফুটকণ্ঠে বললাম। 'উচ্চ সমাজকে যদি এতই খারাপ মনে করতে যে তার জন্যে আমাকে ভালোবাসা ছেড়ে দিলে, তাহলে সে সমাজে আমাকে থাকতে দিলে কেন?'

'উচ্চ সমাজের জন্যে নয়,' উনি জবাব দিলেন।

'তুমি কেন আমার ওপর জোর করলে না?' বলে চললাম। 'কেন আমাকে বেঁধে মেরে ফেললে না? আমার সমস্ত সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার চেয়ে সেটা ভালো হত। তাহলে আমার মনে তৃপ্তি থাকত, লজ্জার কারণ থাকত না।'

মুখ ঢেকে আবার কাঁদতে লাগলাম।

ঠিক সে মুহূর্তে বারান্দায় এল কাতিয়া আর সনিয়া, বৃষ্টিতে ভিজে বেজায় খুশি, হাসি আর জোর কথা চলেছে, কিন্তু আমাদের দেখামাত্র কোনো কথা না বলে ওরা চলে গেল।

ওরা যাবার পর আমরা দুজন নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কেঁদে কেঁদে মনটা হালকা হয়ে এল। ওঁর দিকে তাকালাম, দুহাতে মাথা ধরে উনি বসেছিলেন, আমার দৃষ্টিতে সাড়া দিয়ে কী একটা বলতে গেলেন, কিন্তু গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতে আবার মুখ রাখলেন।

ওঁর কাছে গিয়ে হাতটা সরিয়ে দিলাম। আমার দিকে উনি তাকালেন চিন্তিত দৃষ্টিতে।

'হ্যাঁ,' উনি বললেন, যেন চিন্তার সূত্র ধরে বলছেন, 'সত্যিকার জীবনে ফিরে আসার জন্যে আমাদের সবাইকে, বিশেষ করে মেয়েদের, জীবনের তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অন্যকে বিশ্বাস করা চলে না। তখনো মন-ভোলানো তুচ্ছতায় বাঁচার অভিজ্ঞতা তোমার ছিল না বিশেষ, সে জন্যে ভালো লাগত তোমাকে; তোমাকে ছেড়ে দিলাম তার মধ্যে, মনে হল তোমাকে আটকাবার কোনো অধিকার নেই আমার; যদিও সে ভাবে থাকার সময় আমার নিজের বহুদিন পেরিয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসতে যদি তাহলে কেন একসঙ্গে থেকে সে সবের মধ্য দিয়ে আবার গেলে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেননা; চাইলেও তুমি আমার কথাটা মেনে নিতে পারতে না। নিজের চোখে দেখা দরকার ছিল তোমার, আর সেটা দেখেছ।'

'তুমি বড্ডো ওজন মেপে চলেছিলে, ভালোবেসেছিলে অত্যন্ত কম,' বললাম।

আবার দুজনে চুপচাপ রইলাম।

'এইমাত্র যেটা বললে সেটা নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি,' বলে হঠাৎ উনি দাঁড়িয়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। 'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি, আমারি দোষ,' আমার সামনে থেমে যোগ করলেন। 'উচিত ছিল হয় তোমাকে না ভালোবাসা নয় সহজভাবে ভালোবাসা।'

'সবকিছু ভুলে যাবো,' ভীরু কণ্ঠে বললাম।

'না, যা হয়ে গিয়েছে তা আর ঠিক করা যায় না, কখনো ঠিক করা যায় না,' বলতে বলতে ওঁর গলাটা কোমল হয়ে এল।

'সব ঠিক হয়ে গিয়েছে,' ওঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম।

হাতটা ধরে চাপ দিলেন উনি।

'অতীত নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই, কথাটা সত্যি বলিনি। অনুশোচনা হয়, আগেকার সেই ভালোবাসা, যাকে আর কখনো বাঁচানো যাবে না, তাকে নিয়ে দুঃখ হয়। কার দোষে এটা হল? জানি না। ভালোবাসা আছে, কিন্তু আগেকার সে ভালোবাসা নয়। ভালোবাসার স্থান এখনো আছে, কিন্তু সে ভালোবাসা রুগ্ন — শক্তি বা সরসতা আর নেই। আছে নানা স্মৃতি আর কৃতজ্ঞতা, কিন্তু ...'

'এমন কথা বোলো না,' বাধা দিলাম আমি। 'সবকিছু আগেকার মতো আবার হবে ... হতে পারে, নয় কি?' ওঁর চোখে চোখ রেখে শুধালাম। কিন্তু ওঁর চোখ পরিষ্কার প্রশান্ত, গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন না আমাকে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যা চাইছি, যা ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম অসম্ভব সেটা।

উনি শান্ত সদয়ভাবে হাসলেন, মনে হল সেটা বৃদ্ধের হাসি।

'তোমার বয়স এত কম, আমার বয়স হয়েছে অনেক!' উনি বললেন। 'তুমি যা চাও সেটা আমার ভেতরে আর নেই — নিজেকে ঠকিয়ে কী লাভ?' বলে চললেন, মুখে তখনো স্মিত হাসি।

কোনো কথা না বলে ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, মনটা আগের চেয়ে শান্ত হয়ে এসেছে।

উনি বলে চললেন, 'যা গিয়েছে তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আমরা করবো না। নিজেদের কাছে মিথ্যের বালাই রাখবো না। যদি আগেকার সেই উৎকণ্ঠা, সেই উত্তেজনা না থাকে, ভগবানকে ধন্যবাদ! চাইবার মতো, উত্তেজিত হবার মতো আমাদের কিছু নেই। আমরা সুখের ভাগ বড়ো কম পাইনি। এখন সরে দাঁড়িয়ে ওর জন্য পথ ছাড়ার সময় হয়েছে,' দোরগোড়ায় ভানিয়াকে কোলে নিয়ে আয়া এল, ভানিয়াকে দেখিয়ে উনি বললেন। 'ঠিক তাই, ওগো,' বলে ঝুঁকে চুমো খেলেন আমার মাথায়। চুম্বনটা প্রেমিকের নয়, পুরাতন বন্ধুর।

আর বাগান থেকে আরো প্রখর মধুর ভাবে উঠল শিরশিরে রাত্রির গন্ধ, আরো গাম্ভীর্য এল শব্দে আর নিস্তব্ধতায়, তারার আলো হল আরো দীপ্ত। ওঁর দিকে চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে মনটা হালকা হয়ে গেল, যেন দবদবে ব্যথাময় কোনো শিরা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট করে, শান্ত ভাবে বুঝলাম সে সময়কার অনুভূতি চলে গিয়েছে একেবারে, তাকে আবার বাঁচানো শুধু যে অসম্ভব তা নয়, বাঁচানোর চেষ্টা করাটা হবে যন্ত্রণাকর, বাধাগ্রস্ত। আর সত্যি কি সে সব দিন এত অপরূপ ছিল — সেই সব দিন যেগুলি আমার কাছে আনন্দের চরম বলে ঠেকত? কত দূরে, বহুদূরে সরে গেছে সে সময়টা!

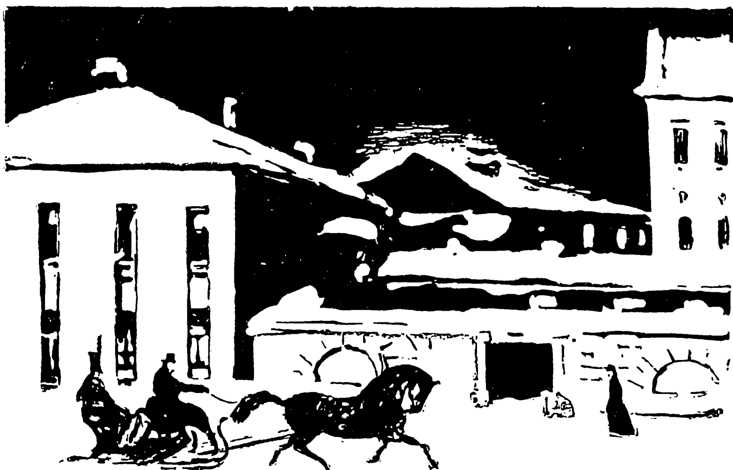
'চায়ের কথাটা ভুলে যাচ্ছি,' উনি বললেন। আমরা দুজনে বৈঠকখানায় গেলাম। দোরগোড়ায় আবার দেখা হল ভানিয়া কোলে আয়ার সঙ্গে। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ওর খালি লালচে পা ঢেকে দিয়ে বুকে চেপে চুমো খেলাম খুব আলতোভাবে। যেন ঘুমের মধ্যে নিজের ছোট কোঁচকানো আঙুল খুলে দিল ও, ঝাপসা চোখ মেলে চাইল, যেন কিছু একটা খুঁজছে বা মনে করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ চোখজোড়া নিবদ্ধ হল আমার মুখে, আর চেনার একটা ঝিলিক খেলে গেল তাতে। ভরা

ঠোঁট জুড়ে হাসিতে খুলে গেল। ও আমার, সম্পূর্ণ আমার! ভেবে সমস্ত শরীরে একটা সুখের টান এল, বুকে চেপে ধরলাম ওকে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালাম যাতে ওর না লাগে। চুমো খেলাম ওর ঠান্ডা ছোট্ট পায়ে, ওর পেটে আর হাতে, পশমে ঢাকা ওর ছোট্ট মাথায়। আমার কাছে এলেন স্বামী, বাচ্চার মুখটা চট করে ঢেকে দিয়ে আবার খুলে দিলাম।

'ইভান সের্গেইচ!' বলে উনি ওর চিবুকের নিচে আঙুল দিয়ে ছুঁলেন। কিন্তু ইভান সের্গেইচকে আবার তাড়াতাড়ি ঢেকে দিলাম আমি। আমি ছাড়া আর কেউ ওর দিকে বেশীক্ষণ তাকালে চলবে না। স্বামীর দিকে চাইলাম, আমার দিকে তাকিয়ে ওঁর চোখে হাসি, আর অনেকদিন পরে এই প্রথম ওঁর চোখে চোখ রেখে মনটা হালকা আর খুশি লাগল।

সেদিন থেকে স্বামীর সঙ্গে আমার রোমান্সের শেষ; যা ফিরে কখনো আসবে না তার প্রিয় স্মৃতির মতো আমার পুরনো ভালোবাসা রয়ে গেল, কিন্তু ছেলেদের এবং ছেলেদের বাপের প্রতি ভালোবাসার নতুন একটি অনুভূতি সূচনা করল অন্য একটি জীবনের; সে সুখী জীবন কিন্তু একেবারে আলাদা ধরনের, সে জীবন আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি ...

১৮৫৯



পক্ষিরাজ

(একটি ঘোড়ার গল্প)

ম. আ. স্তাখোভিচের স্মৃতিতে

১

ক্রমশ আকাশ খুলে যেতে লাগল। পূর্বরবির ছটা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে, আরো চিকচিক করছে অস্বচ্ছ রূপালী শিশিরবিন্দু, ক্ষীণতর হয়ে এল চাঁদের কাস্তে, বনে জাগল সাড়া, লোকজন উঠে পড়ছে; জমিদার বাড়ির আস্তাবলে ঘোড়ার নাকের আওয়াজ আর খড়ে পায়ের খসখস আরো স্পষ্ট কানে আসছে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ

হ্রেষাধ্বনি, কী একটা নিয়ে খেয়োখেয়ি লেগে গিয়েছে ভিড়-করা ঘোড়াগুলোর মধ্যে।

'হয়েছে, হয়েছে! তাড়া কীসের! এরি মধ্যে ভুখ লেগেছে দেখছি!' ক্যাঁচকেঁচে ফটকটা খুলতে খুলতে বলল বুড়ো ঘোড়াপালক। 'কোথায় যাচ্ছিস!' একটা ঘুড়ী ফটকের দিকে লাফিয়ে আসাতে হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল।

ঘোড়াপালক নেস্তেরের গায়ে কসাক জ্যাকেট চামড়ার বেল্ট দিয়ে আটকানো; বেল্টে ঝোলানো নানা টুকিটাকি সরঞ্জাম; চাবুকটা কাঁধে ফেলা, তোয়ালেতে মোড়া রুটি বেল্টে গোঁজা। হাতে জিন ও লাগাম।

ঘোড়াপালকের বিদ্রুপের সুরে ঘোড়াগুলো ভয় পেল না, চটলও না, পরোয়া করে না এমন ভান দেখিয়ে ধীরেসুস্থে ফটকের কাছ থেকে সরে গেল সবাই — শুধু একটা ঝাঁকড়া চুলো খয়েরি রঙের বুড়ী ঘোড়া কান মুড়ে এক ঝটকায় তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। এ ব্যাপারে পিছনের একটা জোয়ান ঘুড়ীর মাথা না ঘামালেও চলত কিন্তু সে চিঁহি ডাক ছেড়ে কাছাকাছি দাঁড়ানো ঘোড়াটাকে পাছা দিয়ে ঝটকা দিল একটা।

'হেই, হেই!' আস্তাবলের একটা কোণে সরে যেতে যেতে আরো জোরে, আরো শাসিয়ে চেঁচাল ঘোড়াপালক।

আস্তাবলের আঙিনার সব কটা ঘোড়ার মধ্যে (গুনতিতে প্রায় একশ) সবচেয়ে কম অধৈর্যপনা দেখাল একটা ডোরাদার আক্তা ঘোড়া; চালের নীচে একলা দাঁড়িয়ে আধ-বোজা চোখে আস্তাবলের একটা ওক-কাঠের খুঁটি চাটছিল সে। খুঁটিটার স্বাদ ঠিক কেমন বলা মুস্কিল, কিন্তু চাটবার সময় ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটার ভাব গম্ভীর আর চিন্তান্বিত।

'আবার দুষ্টুমি?' কাছে এসে নাদার ওপর জিন আর ঘামে চকচকে জিনের কাপড় রাখতে রাখতে আগেকার মতো গলায় বলল ঘোড়াপালক।

লেহন স্থগিত রেখে আক্তা ঘোড়াটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নেস্তেরের দিকে, একটিও পেশী তার নড়ল না। হাসল না ঘোড়াটা, ভুরু কোঁচকাল না, চটে উঠল না, শুধু পেটটা কেঁপে উঠল থরথর করে, কয়েক মুহূর্ত পরে গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্য দিকে ফিরল। তার গলায় হাত গলিয়ে লাগাম বসাল ঘোড়াপালক।

'দীর্ঘনিঃশ্বেস আবার কেন রে?' শুধাল নেস্তের।

ঝট করে লেজ নাড়াল শুধু আক্তা ঘোড়াটা, যেন বলতে চায় — "ও কিছু নয়, নেস্তের।" ঘোড়াপালক জিন আর জিনের কাপড় পিঠে বসিয়ে দেওয়াতে অপছন্দ বোঝাবার জন্য আক্তা ঘোড়াটা কান ওলটাল কিন্তু তাতে নেস্তের শুধু বোকা বলে গালি দিল তাকে। পেটের দড়া শক্ত করে টানার সময়ে ঘোড়াটা পেট ফুলিয়ে চেষ্টা করল বাধা দিতে, কিন্তু মুখে একটা ঘুঁষি আর পেটে হাঁটুর গুঁতো, ব্যস্, দম বেরিয়ে গেল তার। তবু দাঁত দিয়ে নেস্তের দড়াটা টানার সময়ে আবার কান মুড়ল সে, এমন কি ফিরে তাকাল। জানত এতে কোনো লাভ নেই, কিন্তু তার ইচ্ছে নেস্তেরকে জানিয়ে দেওয়া এটা তার ভালো লাগছে না, এবং ভালো না লাগাটা বরাবর জানিয়ে দেবে। জিন বসানোর পর ফুলে-ওঠা ডান পাটা একটু আলগা করে খলীন চিবোতে শুরু করল সে, যদিও এতদিনে তার জানা উচিত ছিল যে খলীনে কোন স্বাদ থাকা সম্ভব নয়।

খাটো রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে নেস্তের চাবুকটা খুলে নিয়ে হাঁটুর নীচ থেকে কোটটা বের করে জিনে সেই বিশেষ কায়দায় বসল যেটা কোচওয়ান, শিকারী আর ঘোড়াপালকদের নিজস্ব, তারপর লাগামে টান দিল। যে চুলোয় বল যেতে তৈয়ার, এ রকম একটা ভাবে মাথা তুলল বটে ঘোড়াটি কিন্তু নড়ল না। তার জানা ছিল যে রওনা হবার আগে সওয়ারী গলা ফাটিয়ে অনেক হুকুম জারি করবে অন্য ঘোড়াপালক ভাস্কাকে আর ঘোড়াগুলোকে। আর সত্যি, হাঁক ডাক শুরু করল নেস্তের।

'ভাস্কা,' হাঁকল সে। 'এই, ভাস্কা! ঘুড়ীগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিস? কোথায় গেলি তুই, বদমাস? ঘুমোচ্ছিস নাকি? ফটক খোল! ঘুড়ীগুলোকে যেতে দে আগে!' ইত্যাদি হুকুম চলল।

ফটকের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। বিরক্ত নিদ্রালু ভাস্কা দরজার খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে অন্যগুলোকে যেতে দিল। একটার পর একটা ঘোড়া বেরিয়ে গেল, খড় শুঁকে, তার ওপর সাবধানে পা ফেলে: জোয়ান ঘুড়ী, এক বছর বয়সের পালের ঘোড়া, দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা আর পেটে বাচ্চা নিয়ে ঘুড়ী; তারা নিজেদের বিরাট পেটের দায়ে

সাবধানে একে একে পার হচ্ছে ফটক। কমবয়সী ঘুড়ীগুলো দুয়ে দুয়ে তিনে তিনে এ ওর পিঠের ওপর মাথা বাড়িয়ে ঠেলাঠেলি করে চলেছে, তাড়াহুড়োয় হোঁচট খাচ্ছে বলে খিস্তি করছে ঘোড়াপালকরা। দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে অচেনা ঘুড়ীদের পায়ের ফাঁকে তড়বড় করে ঢুকছে, বড়োদের হ্রেষাধ্বনিতে সাড়া দিয়ে ডাকছে তীক্ষ্ন চিঁহিঁ সুরে।

একটা বাচাল জোয়ান ঘুড়ী ফটক পার হয়েই মাথা বেঁকিয়ে পাছা ঝটকা দিয়ে অল্পস্বল্প চেঁচাতে শুরু করল, কিন্তু ছিটছিট দাগের বুড়ী জুলদিবাকে ছাড়িয়ে যাবার সাহস হল না তার। জুলদিবা অন্য দিনকার মতোই চলেছে সব ঘোড়ার আগেভাগে মন্থর ভারি ও ভারিক্কি চালে, বিরাট পেট দুলিয়ে।

এই এত হৈচৈ আর ভিড় ছিল খোঁয়াড়টায়, কয়েক মিনিট পরে কিন্তু সব ফাঁকা। চালের খুঁটিগুলোকে দেখাচ্ছে মনমরা পরিত্যক্ত, পায়ে দলা, নাদায় ভরা খড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটার এ দৃশ্য দেখা অভ্যেস হয়ে গেছে বটে, তবু মনে হল তার মুখে বিমর্ষ একটা ভাব ফুটে উঠেছে। যেন কাউকে সেলাম জানাচ্ছে এমন ভাবে আস্তে আস্তে মাথা তুলে আর নামিয়ে, দড়ার চাপে যতটা সম্ভব ততটা দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে, আড়ষ্ট বেঁকা পা টেনে টেনে চলল পালের পেছনে। হাড় বের করা পিঠে বসে আছে বয়স্ক নেস্তের।

মনে মনে ভাবল, "রাস্তায় গিয়ে পড়লেই লোকটা চকমকি জ্বালিয়ে পেতলের কাজ করা চেন লাগানো পাইপটা নির্ঘাৎ টানবে। তবু সেটা বেশ লাগে। ভোরবেলায় ঘাসে শিশির জমে আছে, তখন পাইপের গন্ধটা খাসা; গন্ধটায় অনেক কিছু সুখের জিনিস মনে পড়ে যায়। আমার আপত্তি শুধু এই, দাঁতের ফাঁকে পাইপ বসানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চাল বেড়ে যায়, নিজেকে কেষ্টবিষ্টু ভেবে একপাশে সরে বসে, আর হামেশা বসে ঠিক সে পাশটায় যেখানটায় ব্যথা। যাকগে, গোল্লায় যাক। অন্যদের সুখের জন্যে যন্ত্রণা পাওয়াটা সয়ে গেছে। ঘোড়া বলে তাতে এমন কি একটু সন্তোষ বোধ করতে শুরু করেছি। চাল মারুক গে বেচারী, যখন একলা থাকে, অন্য কেউ দেখে না ওকে, শুধু তখনি

তো চাল মারে। পাশে সরে বসে যদি আনন্দ পায়, বসুক গে," নড়বড়ে পা সাবধানে ফেলে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে ভাবল দামড়া ঘোড়াটা।

২

নদী পারে ঘোড়া চরার জায়গায় পালটাকে তাড়িয়ে এনে নেস্তের নেমে জিন তুলে নিল। নদীর বঙ্কিম বাহু আর মাটি থেকে ওঠা কুয়াশায় ঝাপসা ও শিশিরসিক্ত সদ্য জোলো মাঠের দিকে ইতিমধ্যে মন্থর গতিতে চলেছে ঘোড়াগুলো।

লাগাম খুলে নেবার পরেই নেস্তের দামড়াটার গলার নীচে চুলকে দিল, আর খুশি ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য চোখ বুজল জানোয়ারটা। 'আহা, খুব ভালো লাগে দেখছি এটা বুড়ো কুত্তাটার,' বিড়বিড় করে বলল নেস্তের। কিন্তু আঁক্তাটার মোটে ভালো লাগত না এটা; শুধু ভব্যতার খাতিরে ভালো লাগার ভান করে মাথা নেড়ে মেনে নিত। কিন্তু হঠাৎ, আগে কোনো আভাস না দিয়ে বিনা কারণে, কিম্বা হয়ত নেস্তেরের মনে হয়েছিল বেশী আদিখ্যেতা দেখালে ঘোড়াটার রোয়াব বেড়ে যাবে, ঘোড়াটার মাথা ধাক্কায় সরিয়ে লাগাম চালিয়ে বকলসটা দিয়ে বুড়ো তার শুকিয়ে-যাওয়া পায়ে লাগাল কষে এক ঘা, তারপর বাক্যব্যয় না করে হেঁটে চলে গেল ঢিবির সেই গাছের গুঁড়িটাতে যেখানটায় সে সচরাচর বসে।

এ রকম ব্যবহারে ঘোড়াটা না চটে পারে না, কিন্তু চটার কোনো আভাস সে দিল না। শুধু ফিরে চলল নদীর দিকে খড়খড়ে লেজ আস্তে আস্তে দুলিয়ে, শুঁকে শুঁকে উদাসভাবে ঘাস খেতে খেতে। জোয়ান ঘুড়ী, বছর খানেকের বাচ্চা আর দুগ্ধপোষ্যগুলোর বেজায় ফুর্তি সুন্দর সকালটাতে, চারিদিকে তারা নাচানাচি ঝাপাঝাপি চালিয়েছে, কিন্তু ও সবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই দামড়াটার। সে জানে যে স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হল, বিশেষ করে তার বয়সে, খালি পেটে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে তারপর সকালের খানা খাওয়া; তাই নদী তীরের সবচেয়ে ঢালু আর চওড়া একটা জায়গা বেছে নিয়ে খুর আর পায়ের পেছনের

লোম জলে ভিজিয়ে নিল, তারপর জলে মুখ ঢুকিয়ে কাটা ঠোঁটে শুষতে শুরু করল পাঁজর ফুলিয়ে, লেজ নাড়িয়ে; লেজটা ডোরাকাটা, সরু, গোড়ার দিকে নেড়া।

দুষ্টু খয়েরী রঙের যে ঘুড়ীটা হামেশা আক্তা ঘোড়াটার পেছনে লেগে তাকে জ্বালাত, সে জল ঠেলে এল তার কাছে কাজের ছলে, আসল মতলবটা যেখানে ও খাচ্ছে সেখানকার জলটা ঘুলিয়ে দেওয়া। কিন্তু ঘোড়াটার এরি মধ্যে পেট ভরে জল খাওয়া হয়ে গেছে, ঘুড়ীটির বদ মতবল খেয়াল করেনি এমন ভাবে সে ধীরেসুস্থে কাদা থেকে একটার পর একটা পা তুলে নিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে ছোকরাদের দল থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে শুরু করল সকালের খানা। মাথা বলতে গেলে প্রায় না তুলে, যাতে ঘাস খুব কম পায়ে চাপা পড়ে তার জন্য বিচিত্র ভঙ্গিতে পা রেখে এক নাগাড়ে ঘণ্টা তিনেক সে খেয়ে চলল। এত বেশী খেল যে খোঁচা খোঁচা পাঁজর থেকে পেটটা ঝুলতে লাগল বোঝাই করা বস্তার মতো, রুগ্ন চার পায়ে ভর দিয়ে এমন ভাবে দাঁড়াল যাতে কষ্ট বিশেষ না হয়, বিশেষ করে সবচেয়ে দুর্বল সামনের ডান পাটায়, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

বার্ধক্যের রূপ মাঝে মাঝে হয় উদাত্ত, মাঝে মাঝে বিশ্রী, আর মাঝে মাঝে করুণ। আবার কখনো-সখনো হয় একাধারে উদাত্ত ও বিশ্রী। ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটার বার্ধক্য ছিল সে রকম।

মাথায় বেজায় বড়ো সে — কম করে সাড়ে পাঁচ ফিট। কালো শরীরটার মধ্যে শুধু কয়েকটি হলদে-শাদা ছোপ। মানে, সে রকম রঙ ছিল এক কালে, এখন সেটা নোংরা তামাটে। সব সুদ্ধ তার গায়ে ডোরাদার রঙের তিনটে ছোপ: একটা নাকের একপাশ থেকে তেরছা ভাবে উঠে মাথা আর গলার অর্ধেকটা ভরে দিয়েছে। পোকায় জট-পাকানো দীর্ঘ কেশর জায়গায় জায়গায় শাদা আর তামাটে। দ্বিতীয় ছোপটা ডান দিকের পাঁজর বেয়ে ছড়িয়ে ঢেকেছে পেটের অর্ধেক। তৃতীয়টি পাছায় শুরু হয়ে ছড়িয়েছে লেজের ওপর দিকটায় আর রাঙের অর্ধেকটায়। লেজের বাকিটা ডোরা-কাটা, শাদাটে। চক্ষুকোটরের চারধার বসে গেছে অনেকটা, নীচের ঠোঁটটা কালো, একবার কী একটা দাঙ্গার

ফলে কেটে ঝুলে পড়েছে; হাড় বের করা প্রকাণ্ড মাথাটা এমনভাবে বসানো যে লম্বা হাড়গিলে ঘাড়টায় সেটাকে কাঠের মনে হয়। নীচের ঠোঁটটার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে আভাস পাওয়া যায় কষে ঝুলন্ত কালচে জিভের আর ক্ষয়ে-যাওয়া হলদে দাঁতের টুকরোর। কানের একটাতে কাটার দাগ, বেশীর ভাগ সময় কানদুটো ঝাপটায় সে, কিন্তু মাঝে মাঝে নাছোড়বান্দা মাছি তাড়াবার জন্য আলস্য ভরে কাঁপায় তাদের। একটা কানের পেছনে সামনের ঝুঁটির ক্ষীণ আভাস; নেড়া কপাল বসা, শিরালা কাটা, গলকম্বল ঝুলে পড়েছে শূন্য থলির মতো। মাছি বসা মাত্র মাথা আর ঘাড়ের গাঁট-গাঁট শিরগুলো থর থর করে কাঁপতে থাকে। মুখের ভাবটা কঠোর সহিষ্ণু, গভীর, অনেক দিনের ক্লেশে ভরা। সামনের পাদুটো হাঁটুর কাছে বেঁকে গেছে, খুরদুটো ফোলা, আর ছোপ-লাগা ডান পায়ে হাঁটুর কাছে হাতের মুঠোর মতো বড়ো একটা দলা। পেছনের পাদুটোর চেহারা তবু ভালো, কিন্তু রাঙের চামড়া একবার যে ঘষে উঠে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। চর্মসার শরীরের জন্য পাগুলোকে বেজায় লম্বা দেখায়। পাঁজরার হাড়ের গঠন ভালো, কিন্তু এত ঠেলে বেরিয়ে আসা যে মনে হয় হাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে চামড়া এঁটে বসেছে। কণ্ঠার ওপর দিকটায় আর পিঠে অনেক মারের দাগ, আর পাছায় একটা সদ্য, পচধরা ফোলা ঘা। মেরুদণ্ডে উদ্যত লেজের কালো গোড়ার দিকটা বেশ খানিকটা উঁচিয়ে আছে, বলতে গেলে লোম নেই একেবারে। লেজের কাছে বাদামি পাছায় হাতের তালুর সমান কামড়ের মতো ঘা, তাতে শাদা লোম গজিয়েছে, ঘাড়ের হাড়ে আর একটা ঘায়ের দাগ দেখা যায়। দাবনা আর লেজ ক্রমাগত পেট খারাপ হওয়াতে ময়লা। গায়ের লোম খাটো হলেও খাড়া। কিন্তু আক্তাটার বীভৎস বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে দেখে না ভেবে পারা যায় না যে যৌবনে চমৎকার ঘোড়া ছিল সে, অভিজ্ঞরা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা বলত।

বাস্তবিক, অভিজ্ঞ হলে বলত যে সারা রাশিয়ায় মাত্র একটা জাতের ঘোড়ারই হয় এ রকম চওড়া হাড়, হাঁটুর প্রশস্ত মালাইচাকি, এত সুন্দর খুর, সুঠাম পা, গ্রীবার রূপ আর যেটা হল সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো কালো দীপ্ত চোখ, মুখে ও ঘাড়ে খানদানি শিরের গ্রন্থি এবং ছিমছাম চামড়া

আর কেশর নিয়ে এত সুন্দর মাথা। সত্যি, ঘোড়াটার বীভৎস অথর্বতা — ডোরার জন্য যেটা আরো বেশী মনে হয় — আর চেহারা ও ভাবভঙ্গির প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসের নিদারুণ সংমিশ্রণে রাজকীয় কী একটা আছে, সেটা তাদেরি বিশেষত্ব যারা নিজেদের শক্তি ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন।

শিশিরে-ভেজা মাঠে একলা দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা জীবন্ত ধ্বংসস্তূপের মতো, আর কিছু দূরেই শোনা যাচ্ছে ছত্রভঙ্গ পালের পা ঠোকা, নাসিকাধ্বনি, হ্রেষারব ও দামাল চিঁহি ডাক।

৩

এরিমধ্যে বনের মাথায় উঠে ঘাস আর নদীর বাঁকে ঝকঝকে আলো ফেলেছে সূর্য। শুকিয়ে যেতে যেতে বিন্দু বিন্দু জমেছে শিশির; জলাভূমি আর বনের ওপর এদিকে সেদিকে কেটে যেতে যেতে সকালের শেষ কুয়াশা ভাসছে পাতলা ধোঁয়ার মতো। মেঘ উঠছে তরঙ্গে, কিন্তু হাওয়া নেই। নদী পারের মাঠে রাইশস্য খাটো সবুজ নলের মতো খোঁচায় খোঁচায় দাঁড়িয়ে, হাওয়ায় উদ্ভিদ আর ফুলের মদির গন্ধ। বন থেকে ভাঙা গলায় ডাকছে একটা কোকিল আর চিৎ হয়ে শুয়ে নেস্তের ভাবছে জীবনের আর কটা দিন বাকি। রাই-ক্ষেত ও জোলো মাঠের ওপর উড়ছে লার্ক পাখি। একটা পিছু-পড়া খরগোস ঘোড়ার পালের মধ্যে এসে পড়ে দূরে একটা ঝোপের তলায় দৌড়ে গিয়ে কান খাড়া করে বসে রইল। ঘাসে মাথা ডুবিয়ে ঢুলছে ভাস্কা; তাকে বড়ো বড়ো চক্কর দিয়ে জোয়ান ঘুড়ীগুলো ঢালু জায়গাটার নীচের দিকটায় ছড়িয়ে পড়েছে। বয়স্ক যারা তারা নাক দিয়ে শব্দ করে কেউ বিরক্ত করতে পারবে না এমন চরার জায়গা খুঁজে নিয়ে শুধু রসালো ঘাস চিবোতে লাগল, পেছনে শিশিরে রেখে গেল পায়ে চলার ঝকঝকে একটা ছাপ। কিছু না ভেবে গোটা পালটা চলল এক দিকে। আর আবার সেই জুলদিবা আগে আগে ভারিক্কি চালে পা ফেলে আরো দূরে যাবার পথ দেখাল সবাইকে। জোয়ান কালো মুশকার এই প্রথম বাচ্চা হয়েছে,

লেজ তুলে চিঁহি ডেকে বারবার তার পাশে ঘেঁষে-আসা, হাঁটু থরথর-করে-কাঁপা, বেগুনি রঙের বাচ্চাটার দিকে নাসিকাধ্বনি করছে সে। সাটিনের মতো চকচকে মসৃণ গা যার সেই সোয়ালো নামের বাদামি ঘুড়ীটার এখনো বাচ্চা হয়নি। ঘাস নিয়ে খেলা-করা তার মাথাটা এত নামানো যে রেশমের মতো মসৃণ কালো সামনের ঝুঁটিতে ঢাকা পড়ে গেছে কপাল আর চোখ; ঘাসের কুচি দাঁতে ছিঁড়ে শিশিরে-ভেজা লোমওয়ালা পা দিয়ে ছুঁড়ে মারছে। ওদের মধ্যে একটি বড়োসড়ো বাচ্চা, বিশেষ একটা খেলা ভেবে নিশ্চয়, খাটো ঝাকড়া লেজ তুলে এরি মধ্যে ছাব্বিশ বার চক্কর দিয়েছে মাকে, আর মা'টি ধীরেসুস্থে ঘাস খেয়ে চলেছে, ছেলের রকমসকম এতদিনে তার চেনা হয়ে গেছে, শুধু এক একবার বড়ো কালো চোখ মেলে তাকাচ্ছে তার দিকে। কালো রঙের বড়ো মাথাওয়ালা একেবারে পুঁচকে একটা ঘোড়া কান খাড়া করে খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে দেখছে খেলুড়েটিকে, দৃষ্টিটা ঈর্ষার বা নিন্দের বলা কঠিন। তার সামনের ঝুঁটিটা তাজ্জব ভাবে খাড়া হয়ে উঠেছে কানদুটোর মধ্যে, লেজটা তখনো মায়ের পেটে থাকার সময়কার মতো একপাশে বেঁকা। কয়েকটা বাচ্চা বাঁটে মুখ দেবার জন্য অধৈর্যভরে মায়েদের পেটে গুঁতোচ্ছে, কয়েকটা আবার মায়েদের ডাকে কর্ণপাত না করে ছুটে চলে যাচ্ছে ঠিক উল্টো দিকে ক্ষিপ্র বেঢপ গতিতে, যেন কী একটা জিনিসের খোঁজে, তারপর অকারণে হঠাৎ থেমে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। অন্যেরা আবার পা ছড়িয়ে হয় শুয়ে আছে ঘাসে নয় ঘাস ছিঁড়তে শিখছে বা পেছনের পা দিয়ে কানের পেছনটা চুলকে নিচ্ছে। দুটো ঘুড়ীর তখনো বাচ্চা হয়নি, অন্যদের কাছ থেকে সরে গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে একসঙ্গে ঘাস খাচ্ছে। তাদের অবস্থা দেখে অন্যেরা সমীহ করে সন্দেহ নেই, কাছে গিয়ে বিরক্ত করার সাহস হচ্ছে না কোনো বাচ্চার। কোন খেলুড়ে সাহস ভরে কাছে গিয়ে পড়লে, কান বা লেজের একটু সঙ্কোচনেই টের পেয়ে যাচ্ছে ব্যবহারটা কত অসমীচীন।

এক বছর বয়সের পালের ঘোড়া আর জোয়ান ঘুড়ীগুলোর ভাবগতিক বড়োদের মতো; তারা লাফাচ্ছে ক্বচিৎ কখনো বা হুল্লোড়ে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। ঘাস চিবোনো চলেছে অতিশয় গাম্ভীর্যে,

রাজহাঁসের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে, ছোট ঝাঁটার মতো লেজ দুলিয়ে, যেন তাদেরো রীতিমত লেজ আছে। বড়োদের মতো কখনো-সখনো শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছে তারা, বা এর ওর পিঠ চুলকে দিচ্ছে। সবচেয়ে ফুর্তি হল দু তিন বছরের ঘুড়ী আর পাল-না-খাওয়া জানোয়ারগুলোর। সোমত্ত বয়স্কাদের একটা আলাদা ফুর্তিবাজ দল পাকিয়ে তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তাদের পা ঠোকাঠুকি, নাকের আওয়াজ, মিহি ও মোটা সুরে হ্রেষারব। কাছাকাছি জড়ো হয়ে এ-ওর ঘাড়ে মাথা রেখে শুঁকছে পরস্পরকে, লাফ মারছে আর মাঝে মাঝে নাক দিয়ে শব্দ করে, লেজের বাহার দেখিয়ে এ-ওর সামনে ছেনালের মতো পুরো আর আধা কদমের মাঝামাঝি একটা চালে নিজেদের জাহির করে হাঁটছে।

কুমারীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর দুষ্টু গোছের হল বাদামি রঙের ঘুড়ীটা। সে যাই করে অন্যেরাও দেখাদেখি তাই করছে। যেখানেই যায়, পিছু পিছু চলেছে সুন্দরী কুমারীদের গোটা দলটা। আজ সকালে বিশেষ করে তার খেলার মেজাজ। খোশ মেজাজটা এসেছে ঠিক যেমন করে মানুষের আসে। নদীতে বুড়ো আক্তা ঘোড়াটার সঙ্গে দুষ্টুমি করার পর জলের ধার হয়ে ছুটেছে পাগলের মতো, কী একটাতে ভয় পাবার ভান করে, নাক দিয়ে একটা আওয়াজ ছেড়ে প্রাণপণ বেগে দৌড়িয়ে চলে গেছে জোলো মাঠে, ফলে তাকে এবং তার পিছু পিছু ছুটে-যাওয়া অন্যদের ধাওয়া করতে হয় ভাস্কাকে ঘোড়া ছুটিয়ে। কিছু খেয়ে নিয়ে ঘুড়ীটা মাটিতে গড়াগড়ি দিল, তারপর বুড়ী ঘুড়ীগুলোর একেবারে নাকের ডগায় তীরবেগে দৌড়িয়ে তাদের বিরক্ত করতে থাকল। তারপর মায়ের কাছ থেকে একটা বাচ্চাকে ভাগিয়ে, যেন তাকে কামড়াতে চায় এমন ভাবে ছুটল পেছনে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে খাওয়া স্থগিত রাখল মা, বাচ্চাটা চেঁচাতে লাগল করুণ সুরে, কিন্তু তাকে ছুঁল না পর্যন্ত বাদামি রঙের ঘুড়ীটা, বান্ধবীদের মনোরঞ্জনের জন্য ওকে একটু ভয় পাইয়া দেওয়া শুধু, ওরা তার দুষ্টুমিটা দেখছিল মহা আনন্দে। নদীর ওদিকে রাই-ক্ষেতে লাঙল নিয়ে ছাই রঙের ঘোড়া চালাচ্ছিল একটি চাষী, এবার তার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার বেজায় সখ হল ঘুড়ীটার। থেমে পড়ে বেশ জাঁকে মাথা খাড়া করে, গা ঝেড়ে নিয়ে নরম মধুর চিঁহি ডাকল

একটানা সুরে। ডাকটা দুষ্টু আর আবেগময়, কিছুটা বিষণ্ণ। বাসনা, প্রেমের প্রতিশ্রুতি, প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা সে ডাকে।

নলখাগড়ার ঝোপে লাফিয়ে লাফিয়ে একটা সারস বান্ধবীকে ডাকছে তীব্র আবেগে, প্রেমের গান গাইছে একটা কোকিল আর একটা ভারুই পাখি, ফুলগুলো হাওয়ায় মিষ্টি মধুর রেণু ছড়াচ্ছে এ-ওর দিকে।

চিঁহি ডাকে ঘুড়ীটা জানাল, "আমি সোমত্ত, সুন্দরী আর জোয়ান, তবু প্রেমের মধুর স্বাদ আমাকে এখনো দেয়নি কেউ; আর বলতে কী, প্রেমপূর্ণ নয়নে কেউ এখন পর্যন্ত তাকায়নি আমার দিকে, কেউ না।"

আর এই অর্থঘন চিঁহি ডাক বিষণ্ণ উচ্ছলতায় ঢালু পেরিয়ে ক্ষেতের ওপর দিয়ে কানে পেঁছিল দূরের ছাই রঙের ঘোড়াটার। কান খাড়া করে সে থেমে গেল। চাষী বাকলের জুতো দিয়ে লাথি মারল তাকে, তবু রূপালী আওয়াজটায় মোহমুগ্ধ হয়ে সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে সাড়া দিয়ে ডাকল। চটে উঠে চাষী রাশ টেনে পেটে মারল আর একটা লাথি, এবার এত জোরে যে ডাক শেষ না করে চলতে শুরু করল ঘোড়াটা। কিন্তু তার মনে এসেছে মধুর একটা বিষণ্ণতা, তার তীব্র কামনার ডাক আর চাষীর ক্রুদ্ধ স্বর দূরের রাই-ক্ষেত থেকে এপারের ঘোড়ার দলটায় শোনা গেল অনেকক্ষণ।

ঘুড়ীটার গলা শোনা মাত্র এত মাথা ঘুরে গিয়েছিল ছাই রঙের ঘোড়াটার যে কাজের কথা ভুলে যায় সে; তাহলে কান খাড়া করে বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে হাওয়া টেনে নিতে নিতে, ঝুঁকে পড়ে নবীন সুন্দর শরীরের প্রতি অঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠে ডাকার সময় তার সমস্ত রূপটা চোখে পড়লে ঘোড়াটার মনের ভাবটা কী হত?

কিন্তু ঘুড়ীটা বেশীক্ষণ আবেগের হাতে নিজেকে ছেড়ে রাখল না। ছাই রঙের ঘোড়ার ডাকটা মিলিয়ে যেতে সে আর একবার ডেকে মাথা নামিয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল, তারপর ছুটল ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটাকে বিরক্ত করে জ্বালিয়ে মারতে। কমবয়সীদের সব ঠাট্টা

ইয়ার্কির ধাক্কাটা সামলাতে হয় তাকে, মানুষের চেয়ে বেশী তারা তাকে জ্বালায়।

অথচ সে কারো কোনো ক্ষতি করেনি, না মানুষের, না ঘোড়ার। মানুষের এখনো তাকে দরকার, কিন্তু জোয়ান ঘোড়াগুলো তাকে জ্বালায় কেন?

৪

ওর বয়স হয়েছে, ওরা এখনো ছোকরা; ও চর্মসার, ওদের চামড়া চকচকে; ও বিষণ্ন, ওরা হাসিখুশি। এক কথায় ও হল পর, বিজাতীয়, একেবারে অন্য ধরনের জীব, তাই করুণার পাত্র হতে পারে না। ঘোড়াদের দুঃখ হয় শুধু নিজেদের নিয়ে, ক্বচিৎ কখনো হয় স্বজাতির তাদেরো প্রতি যাদের ওরা নিজেদের মতো দেখতে ভাবে। কিন্তু আক্তা ঘোড়াটা যে বুড়ো, চর্মসার ও কুৎসিৎ, সেটা কি তার দোষ? তা মনে হত না। কিন্তু অন্য ঘোড়াদের মতে দোষটা তারি, দোষ শুধু তাদেরি নেই যারা কমবয়সী, বলিষ্ঠ ও সুখী, যাদের সামনে পড়ে রয়েছে বিশ্ব জগৎ, সামান্য কারণে যাদের পেশী কেঁপে ওঠে আর লেজ খাড়া হয়ে যায়। হয়ত এটা বুঝত ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটা, আর তাই শান্ত মুহূর্তে মেনে নিত যে বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও বেঁচে থাকার দোষটা তারি, এজন্য সাজা তার প্রাপ্য। তবু সে তো ঘোড়া বটে, তাই জীবন শেষে ওদের সবায়ের কপালে যা ঘটবে তাই নিয়ে শুধু তাকে জ্বালাতন-করা, — ছোকরাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বিষণ্ন, ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ না করে পারত না। ঘোড়াগুলোর হৃদয়হীনতায় খানদানি কী একটা মনোভাব আছে। ওদের প্রত্যেকের জন্ম স্বনামধন্যা স্মেতাঙ্কার বংশে, আক্তা ঘোড়াটার বংশ কেউ জানে না। ও হল একটা কেউ, যাকে ঘোড়ার মেলায় বছর তিনেক আগে কেনা হয় আশি রুবলের কাগজী টাকায়।

যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে এমন ভাবে একেবারে তার নাকের ডগায় গিয়ে একটা ধাক্কা মারল বাদামি রঙের ঘুড়ীটা। এটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। চোখ না খুলে কান নামিয়ে দাঁত বের করে দেখাল সে। তার দিকে পেছন

ফিরে ঘুড়ীটা একটা চাট লাগাবার ভান করাতে চোখ খুলে সে সরে গেল। ঘুম কেটে গেছে, শুরু হল পাতা খাওয়া। আবার মন্থর গতিতে কাছে এল ঘুড়ীটা আর তার সখীরা। দু বছর বয়সের একটা বোকা, কেশরহীন ঘুড়ী সব সময়ে বাদামি রঙের ঘুড়ীটাকে নকল করত, সে তার পাশে পাশে এসে অনুকরণ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলল, নকলকারীরা হামেশা যা করে। বাদামি ঘুড়ীটা সাধারণত এমন ভাবে তার কাছে যেত যেন নিজের কাজে ব্যস্ত, তার দিকে না তাকিয়ে একেবারে নাকের ডগা হয়ে যেত, ফলে ঘোড়াটা ঠিক করে উঠতে পারত না চটা উচিত কি না, আর তার সে অবস্থাটা সত্যিই মজার। এখনো তাই করল ঘুড়ীটা, কিন্তু তার নেড়ী সখীটি ফূর্তির চোটে নিজের বুক দিয়ে প্রাণপণে ধাক্কা দিল ঘোড়াটাকে। আর সে দাঁত বের করে চেঁচিয়ে তাকে ধাওয়া করে কামড় বসাল রাঙে এত ক্ষিপ্রভাবে যে সেটা তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত। পাছা দিয়ে ধাক্কা মারল তাকে নেড়ী ঘুড়ীটা, পাঁজরের শুকনো উদ্‌গত হাড় ঝনঝনিয়ে উঠল। ঘোঁৎ করে ঘুড়ীটার পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সুবুদ্ধি হল ঘোড়াটার, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে গেল অন্য দিকে।

নেড়ীকে আক্রমণের দুঃসাহসের জন্য পালের সব কটা ছোকরা আর ছুকরী শোধ তুলবে বলে দৃঢ়সংকল্প বোঝা গেল, বাকি দিনটা এমন নাছোড়বান্দা ভাবে আক্তা ঘোড়াটার পেছনে তারা লাগল যে খাবার সুযোগ পর্যন্ত তার হল না, মুহূর্তের জন্য শান্তিতে থাকতে দিল না তাকে। কয়েকবার তো ঘোড়াপালক তার কাছ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিল, ওদের কী হয়েছে মাথায় ঢুকল না তার। ঘোড়াটা এত দুঃখিত হয়েছিল যে বাড়ি ফেরার সময় হওয়াতে নিজেই গেল নেস্তেরের কাছে, জিন পরিয়ে নেস্তের পিঠে চাপাতে সে কিছুটা খুশি ও নিশ্চিন্ত বোধ করল।

ভগবান জানেন, বুড়ো ঘোড়াপালককে পিঠে বয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে কী ভাবছিল বুড়ো আক্তা ঘোড়া। হয়ত পিছু-লাগা কমবয়সীদের নিষ্ঠুরতার কথা ভাবছিল সখেদে; কিম্বা হয়ত বুড়োদের স্বভাব মতো অপমানকারীদের মাফ করে দিয়েছিল সে গর্বিত নিঃশব্দ

অবহেলায়। কিন্তু আস্তাবলের আঙিনায় না পেঁছনো পর্যন্ত নিজের চিন্তাভাবনা সে কোনো মতে প্রকাশ করল না।

সে দিন সন্ধ্যেবেলায় কয়েকটি আত্মীয়স্বজন দেখা করতে এল নেস্তেরের সঙ্গে। জমিদার বাড়ির চাকরবাকরদের কুঁড়েঘরের কাছে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে, চোখে পড়ল তার কুঁড়েঘরের অলিন্দে বাঁধা একটা ঘোড়া আর গাড়ি। বাড়ি পেঁছতে এত তাড়া তার যে খোঁয়াড়ে ঘোড়াগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়েই আক্তা ঘোড়াটাকে ছেড়ে চেঁচিয়ে ভাস্কাকে বলল ওর জিনটা খুলে নিতে। তারপর ফটকে তালা দিয়ে গেল দোস্তদের সঙ্গে মিলতে।

স্মেতাঙ্কার দৌহিত্র কন্যাকে বাজারে-কেনা বেজন্মা 'ঘেয়ো ঘোড়াটা' অপমান করাতে হয়ত গোটা পালটার খানদানি মান ক্ষুণ্ণ হয়, হয়ত সওয়ারীবিহীন সুউচ্চ জিনসাজে আক্তা ঘোড়াটার চেহারা অন্যদের অতিশয় তাজ্জব ঠেকাতে সে রাত্রে একটি অসাধারণ বিচিত্র ব্যাপার ঘটল খোঁয়াড়ে। বয়স নির্বিশেষে সমস্ত ঘোড়া দাঁত বের করে তাকে ধাওয়া করে এদিকে ওদিকে তাড়িয়ে, খুর দিয়ে অনেক ঘা বসাল তার ফাঁপা পাঁজরে, যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল সে। আর সহ্য হয় না যখন খোঁয়াড়ের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, মুখে এল অথর্ব বার্ধক্যের অশক্ত ক্রোধ, তারপর হতাশার ভাব। কান ঝুলিয়ে সে হঠাৎ এমন একটা জিনিস করে বসল যে পিছু-ধাওয়া সমস্ত ঘোড়া একেবারে থেমে পড়ল। সবচেয়ে প্রবীণা ভিজাপুরিখা কাছে এসে তাকে শুঁকে নিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিল একটা। গভীর নিঃশ্বাস নিল সেও।

৫

চন্দ্রালোকিত খোঁয়াড়ের মাঝখানে ঘোড়াটার দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি, পিঠে উঁচু জিনসাজ। যেন এইমাত্র তার কাছে শোনা নতুন অভিনব কোনো কথায় তাজ্জব হয়ে তাকে ঘিরে নিস্তব্ধ নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে অন্য ঘোড়াগুলো। আর সত্যি নতুন অপ্রত্যাশিত কিছু একটা তারা জেনেছে।

. . . .

প্রথম রাত্রি

“বাজীবাহাদুর ও বাবা'র সন্তান আমি। কুলজি মতে আমার নাম হল প্রথম মুজিক। কুলজি নাম প্রথম মুজিক বটে, কিন্তু আমাকে বরাবর ডাকত পক্ষিরাজ বলে, নামটা দিয়েছিল লোকে আমার দীর্ঘ ক্ষিপ্র পদক্ষেপের জন্য, যার তুলনা ছিল না সারা রাশিয়ায়। আমার রক্তের চেয়ে কুলীন রক্ত নেই দুনিয়ার কোনো ঘোড়ার; তোমাদের কখনো বলতাম না কথাটা — বলে কী লাভ? তোমরা কখনো চিনতে না আমায়, এই যেমন ভিজাপুরিখা চিনতে পারেনি, ও তো আমার সঙ্গে ছিল খেত্রনভোতে — এইমাত্র আমাকে চিনল। ভিজাপুরিখা সায় না দিলে কথাটা এখনো বিশ্বেস হত না তোমাদের, আর আমি নিজে কখনো তোমাদের জানাতাম না — কয়েকটা ঘোড়ার আহা-উহুতে কোনো প্রয়োজন নেই আমার — কিন্তু তোমরা সেটা চাইলে। হ্যাঁ, আমি হলাম সেই পক্ষিরাজ যার খোঁজে সারা মুলুক তোলপাড় করে পাত্তা পাচ্ছেন না অশ্বকোবিদরা, সেই পক্ষিরাজ যাকে কাউণ্ট নিজে জানতেন, তাঁর পেয়ারের 'রাজহাঁস'কে দৌড়ে টেক্কা দিয়েছিলাম বলে যাকে তিনি তাড়িয়ে দেন পাল থেকে।

. . . .

“জন্মকালে 'ডোরাদার ঘোড়া' কাকে বলে জানতাম না। ভেবেছিলাম আমি শুধু একটা ঘোড়া। মনে আছে আমার রং নিয়ে প্রথম কথা ওঠাতে কী দারুণ বিচলিত হয়েছিলেন মা, আর আমি নিজে। মনে হয় আমি ভূমিষ্ঠ হই রাত্রিবেলায়, সকাল হল, ততক্ষণে মা আমাকে চেটে চেটে সাফ করেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলাম। মনে আছে কী যেন একটা চাইছিলাম, সবকিছু আমার কাছে ঠেকছিল অত্যন্ত আশ্চর্য অথচ অত্যন্ত সহজ। দরজায় গরাদ দেওয়া লম্বা গরম একটা বারান্দায় আমাদের চালা, গরাদের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ত সবকিছু। দুধের বাঁট এগিয়ে দিলেন মা, কিন্তু আমি তখনো এত বোকা যে মুখটা একবার গুঁজছি সামনের পায়ে, একবার বুকে। হঠাৎ দরজায় তাকিয়ে মা পায়ের তলা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিলেন। সেদিনকার সহিসটা গরাদের ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল।

"'এই দেখ, বাবার বাচ্চা হয়েছে,' বলে দরজার খিল খুলে টাটকা খড়ের ওপর পা ফেলে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। 'দেখ দেখ, কী ডোরারে বাবা, একেবারে ছাতারিয়ার মতো।'

"সোঁ করে ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়লাম।

"'এই ক্ষুদে শয়তান!' বলে উঠল সে।

"মা অস্বস্তি বোধ করছিলেন বটে, কিন্তু আমাকে আগলাবার কোনো চেষ্টা করলেন না; কেবল গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এক পাশে সরে গেলেন। আর আর সহিসগুলো এসে আমাকে দেখতে লাগল। একজন গেল অশ্বপালককে ডাকতে। আমার গায়ের রং নিয়ে সবাই হাসিতামাসা করতে লাগল, নানান মজার নাম দেওয়া হল আমাকে। নামগুলোর অর্থ কী না ঢুকল আমার মাথায়, না মায়ের। আমাদের বংশে বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তখন পর্যন্ত কোনো ডোরাদার ঘোড়া জন্মায়নি। রংদার ঘোড়া হওয়াটা যে দোষের আমাদের ধারণা ছিল না। তবু আমার শক্তি আর সুন্দর গড়নের জন্য সবাই বাহবা দিতে কসুর করল না।

"'দেখ দিকি, কী তেজী বাচ্চাটা!' বলল সহিস। 'ওর নাগাল পাওয়া ভার।'

"কিছুক্ষণ পরে অশ্বপাল এল; দেখে অবাক সে, এমন কি মনে হল দুঃখিত হয়েছে।

"'কোত্থেকে জুটল এই ক্ষুদে রাক্ষসটা,' বলল সে। 'জেনারেল সাহেব ওকে দলে কখনো রাখবেন না। ধুত্তোর ছাই, তুই তো আমাকে ডোবালি বাবা,' মায়ের দিকে ফিরে বলল। 'ওই ডোরাদার ভূতটার জন্ম না দিয়ে একটা নেড়া বাচ্চা দিলেই পারতিস!'

"কিছু বললেন না মা, শুধু আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন; এমন অবস্থায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলাটা তাঁর অভ্যেস।

"'কোন শয়তানের সঙ্গে এ বেটার আদল? দেখতে ঠিক চাষীর মতো,' অশ্বপালক বলে চলল। 'দলে রাখা যাবে না একে, তাহলে আমাদের দুর্নাম হবে, অথচ ঘোড়া হিসেবে বেটা খাসা — চমৎকার,' বলল সে; আমাকে যেই দেখল সেই বলল কথাটা।

"কিছু দিন পরে জেনারেল সাহেব স্বয়ং আমাকে দেখতে এলেন। আবার সবাই আঁতকে উঠল, আমার চামড়ার রঙের জন্য বকাবকি করল আমাকে ও মাকে।

"'তবু খাসা ঘোড়াটা, চমৎকার ঘোড়া,' যারা আমাকে দেখে তারাই একবাক্যে মানল।

"বসন্তকাল পর্যন্ত আমরা মাদী ঘোড়ার আস্তাবলে রয়ে গেলাম যে যার মায়ের কাছে। সূর্যের তাপে ঢালা-ছাতের বরফ গলতে শুরু করেছে। তখন মাঝে মাঝে মায়েদের সঙ্গে টাটকা খড় বিছোনো বড়ো উঠোনে যেতে দেওয়া হত। এখানে প্রথম আলাপ হল নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। দেখলাম আলাদা আলাদা দরজা থেকে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে আসছে সে সময়কার সব নামজাদা মাদী ঘোড়া। তাদের মধ্যে ছিল বুড়ী গলাংকা, স্মেতাংকার মেয়ে মুশ্‌কা, ক্রাস্‌নুখা আর জিন-ঘোড়া দব্রর্খাতিহা — তখনকার সব স্বনামধন্যারা। বাচ্চাদের নিয়ে জড়ো হল তারা, রোদ্দুরে বেড়াল, খড়ের ওপর লুটোপুটি খেল, শুঁকল পরস্পরকে, ঠিক সাধারণ ঘোড়াদের মতো। সেই চাঁদের হাটের কথা আমার আজও মনে আছে। বললে তোমাদের অবাক লাগবে, হয়ত বিশ্বেস হবে না যে এক কালে আমিও ছিলাম নবীন ও চঞ্চল, সত্যি সত্যি ছিলাম। সেখানে দেখা হয় ভিজাপুরিখার সঙ্গে, ওর বয়স তখন এক বছর — স্বভাবটা কোমল, হাসিখুশি আর চঞ্চল। তবু বলতেই হবে, চটাবার মতলবে বলছি তা নয় — ওর মতো জাতঘোড়া ক্বচিৎ হয় তোমরা আজ ভাবো, কিন্তু সে সব দিনে দলের মধ্যে ওকে নগণ্য বলে ধরা হত। ও নিজেই কথাটা মেনে নেবে।

"আমার ডোরা দাগ মানুষের অপছন্দ কিন্তু সেটা অসম্ভব ভালো লাগল ঘোড়াগুলোর। ওরা সবাই আমাকে ঘিরে তারিফ করল, খেলল আমার সঙ্গে। লোকদের কথা মন থেকে মুছে যেতে লাগল, সুখী বোধ করলাম। কিন্তু প্রথম দুঃখ পেতে দেরী হল না, আর পেলাম মায়ের কাছ থেকে।

"বরফ গলতে শুরু করেছে, চালার নীচে চড়ুই-এর কিচির-মিচির, হাওয়ায় বসন্তের ভরাট গন্ধ, তখন আমার প্রতি মায়ের মনোভাব বদলে

গেল। বাস্তবিক, তাঁর ভোল বদলে গেল; ঘেরা উঠোনটায় তীরের মতো দৌড়িয়ে নাচানাচি করতেন, সেটা তাঁর বয়সে একেবারে অশোভন; কিম্বা হয়ত জাগ্রত-স্বপ্নে আনমনা হয়ে গিয়ে নীচু গলায় ডাকতেন, অন্য ঘুড়ীদের হয়ত কামড়ে দিতেন আর চাট লাগাতেন; আমাকে শুঁকে তাচ্ছিল্যে হয়ত নাসিকাধ্বনি করে উঠতেন, বা বাঁট থেকে ঠেলে সরিয়ে নিজের খুড়তুতো বোন কুপচিখার কাঁধে মাথা রেখে রোদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী ভাবতে ভাবতে তার পিঠ চুলকে দিতেন।

"একদিন অশ্বপাল এসে অন্যদের দিয়ে ওঁকে লাগাম পরাল, নিয়ে যেতে বলল তারপর বাইরে। মা জোরে ডেকে উঠলেন, সাড়া দিয়ে পিছু পিছু দৌড়লাম আমি, কিন্তু তিনি এমন কি আমার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। তিনি বেরিয়ে গেলেন, দরজায় তালা পড়ল, সহিস তারাস আমাকে জাপটে ধরে রইল। আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে সহিসকে ফেলে দিলাম খড়ের ওপর, কিন্তু দরজা বন্ধ, মায়ের ডাক ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে কানে এল। আর সে ডাকে আমাকে আহ্বানের সুর নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছু। পরে শুনলাম, সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল আর একটা কণ্ঠ, গভীর জোরালো একটি কণ্ঠ, দব্রির কণ্ঠ, তাকে দুজন সহিস ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মায়ের সঙ্গে মোলাকাতে। আমার বুক ভেঙে গেল একেবারে — চালা ছেড়ে তারাস চলে গেল, চোখে পড়ল না পর্যন্ত। মনে হল মায়ের ভালোবাসা হারিয়েছি চিরতরে। 'আর এ সবকিছুর জন্য দায়ী আমার ডোরাগুলো,' আমার রং নিয়ে অন্যদের মন্তব্যের কথা মনে করে ভাবলাম; আর এত ভয়ঙ্কর রাগ হল যে চালার দেয়ালে মাথা আর হাঁটু ঠুকে চললাম যতক্ষণ না দরদর ঘাম ছুটে শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়লাম।

"মা ফিরে এলেন অল্পক্ষণের মধ্যে। কানে এল বারান্দা হয়ে বেশ অস্বাভাবিক কদমে আসছেন। দরজা খুলে দেওয়া হল; তাঁকে চেনা ভার, এত নবীন আর সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাকে শুঁকে নাসিকাধ্বনি করে হাসতে লাগলেন। সবকিছুতে তাঁর এ কথাটা ফুটে উঠল যে আমাকে আর ভালোবাসেন না। বললেন কী সুন্দর চেহারা দব্রির, তাকে কত না ভালোবাসেন! বার বার তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল দব্রির

কাছে; আর মা আর আমার সম্পর্ক দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল।

"শীগগিরই ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হল আমাদের। তাতে যে আনন্দ পেলাম মায়ের ভালোবাসা হারানোর ক্ষতিপূরণ কিছুটা হল। জুটল বন্ধু আর সহচর; এক সঙ্গে শিখলাম ঘাস কী করে খেতে হয়, বড়োদের মতো ডাকতে হয়, লেজ তুলে মা'দের চক্কর দিতে হয়। খাসা ছিল সে সব দিন। আমার সব দোষ মাফ, সবাই আমাকে ভালোবাসে, খাতির করে, প্রশ্রয় দেয়।

"বেশী দিন নয়। শীগগিরই ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটল।" দীর্ঘ-নিঃশ্বাস টেনে আক্তা ঘোড়া অন্যদের কাছ থেকে সরে গেল।

ভোর হয়েছে। কিঁচকিঁচ করে উঠল দরজাগুলো, ভেতরে ঢুকল নেস্তের। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ঘোড়াগুলো। আক্তা ঘোড়ার পিঠে জিন কষে নেস্তের পালটাকে নিয়ে গেল চরাতে।

৬

দ্বিতীয় রাত্রি

সন্ধ্যেবেলায় চালাতে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার আক্তা ঘোড়ার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়াল।

সে বলে চলল:

"অগস্ট মাসে মার কাছ ছাড়া করল আমাকে। তাতে বিশেষ দুঃখ পেলাম না। দেখলাম আমার ছোট ভাই (বিখ্যাত উসান) ভূমিষ্ঠ হবার আর দেরী নেই, আমার আগেকার কদর মায়ের কাছে আর নেই। তাতে হিংসে হল না। মায়ের প্রতি আমার ভালোবাসা জুড়িয়ে গেছে মনে হল। তাছাড়া জানা ছিল মায়ের কাছ ছাড়া করে আমাকে রাখা হবে বাচ্চাদের আস্তাবলে, সেখানে আমরা থাকব দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে, প্রতিদিন হাওয়া খাওয়াতে আমাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। পেয়ার নামের একটা ঘোড়ার সঙ্গে এক চালায় আমাকে রাখা হল। পেয়ার ছিল জিন-

ঘোড়া, পরে সম্রাটের খাস ঘোড়া হয়, সম্রাট শুদ্ধ তার ছবি আঁকে চিত্রকরেরা, মূর্তি বানায় ভাস্করেরা। তখন ও ছিল মামুলি একটা বাচ্চা, গায়ের চামড়া নরম চকচকে, গলাটা রাজহাঁসের মতো, আর পাগুলো রোগা লিকলিকে বাজনার তার যেন। হামেশা ওর ফূর্তি, স্বভাবটা ভালো আর অমায়িক, লাফানো ঝাঁপানো বন্ধুদের চাটা আর ঘোড়া আর মানুষদের জব্দ করা ওর প্রিয়। এক সঙ্গে থাকাতে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম, সারা যৌবন ছিল সে দোস্তি। সে সময়টাতে ও ছিল হাসিখুশি আর ছেবলা। তখনি ওর শুরু হয়েছে ঘুড়ীগুলোর প্রেমে পড়া, তাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা; আমার সরলতা নিয়ে হাসাহাসি করত ও। আত্মসম্মানের তাগিদে ওর নকল করতে গিয়ে বেগতিকে পড়ে গেলাম। অচিরে ভালোবেসে ফেললাম একজনকে। এই অকাল মোহ আমার অদৃষ্টে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন এনে দিল।

"হ্যাঁ, পড়লাম প্রেমে। ভিজাপুরিখা আমার চেয়ে এক বছরের বড়ো, খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু হেমন্তের শেষে চোখে পড়ল যে ও আমাকে দেখে লজ্জা পেতে শুরু করেছে... প্রথম প্রেমের করুণ কাহিনীটির আদ্যোপান্ত বলার চেষ্টা করব না, ওর প্রতি আমার উন্মত্ত অনুরাগের কথা ওর নিজেরি মনে আছে। সে অনুরাগের ফলে আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। ঘোড়াপালকেরা ওকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিল, বেধড়ক মারল আমাকে। সন্ধ্যেবেলায় বিশেষ একটা চালায় আমায় নিয়ে যাওয়া হল। সারা রাত কাঁদলাম আমি, যেন পরের দিনের ঘটনাটির পূর্বাভাস পেয়েছিলাম।

"সকালে বারান্দা হয়ে আমার চালায় জেনারেল সাহেব এলেন, সঙ্গে অশ্বপাল, সহিস আর ঘোড়াপালকেরা, শুরু হল ভয়ংকর হৈচৈ। অশ্বপালকে বেজায় ধমকাতে লাগলেন জেনারেল সাহেব, অশ্বপাল সাফাই গাইতে লাগল এই বলে যে আমাকে বাইরে না নিয়ে যাবার হুকুম সে দিয়েছিল, কিন্তু কথা শোনেনি সহিসগুলো। জেনারেল সাহেব বললেন সবাইকে তিনি চাবকাবেন আর আমাকে খাসী করে দিতে হবে। তাঁর সব আদেশ পালন করা হবে, বলল অশ্বপাল। হৈচৈ থেমে গেল, চলে

গেল ওরা। কিছু বুঝলাম না আমি, কিন্তু আঁচ পেলাম আমাকে নিয়ে কিছু একটা করার মতলব ওদের।

. . . .

. . . .

"পরের দিন থেকে আমার চিঁহি ডাকে ছেদ পড়ল চিরতরে; এখন যা দেখছ তাই হলাম। দুনিয়ার ভোল বদলে গেল আমার কাছে। কোনো কিছুতে আর আনন্দ পাই না, নিজের মধ্যে সরে এসে চিন্তার হাতে আত্মসমর্পণ করলাম। প্রথম প্রথম সব কিছুতে আমার ঘেন্না। এমন কি অন্নজল পর্যন্ত ত্যাগ করলাম, হাঁটা পর্যন্ত, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা তো দূরের কথা। পরে মাঝে মাঝে খেয়াল হত জোর কদমে ছুটে ডাক ছাড়ি একবার, কিন্তু তখনি মনে আসত ভয়াবহ প্রশ্নটি: 'কেন? কিসের জন্যে?' আর প্রাণের সমস্ত শক্তি যেন চলে যেত।

"মাঠ থেকে একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের পালটিকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, আমাকে নিয়ে গেল বেড়াতে। দূরে দেখলাম ধূলোর মেঘে ঢাকা পড়ছে আমাদের ঘুড়ীগুলোর আবছায়া মূর্তি। কানে এল তাদের মুখের হাসি, মাটিতে পা ঠোকার শব্দ। দাঁড়িয়ে পড়লাম, সহিস জোরে টানাতে লাগামটা কেটে বসছে ঘাড়ে, তবু দাঁড়িয়ে এগিয়ে-আসা দঙ্গলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম, চিরতরে হারানো সুখের পানে লোকে যেমন ভাবে চেয়ে থাকে। ওরা কাছে আসাতে চিনলাম সবাইকে একে একে — আমার সব পুরনো বন্ধুদের, কী সুন্দর, রাজকীয়, চকচকে আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তারা। ওদের মধ্যে কে একজন তাকাল আমার দিকে। লাগামে হেঁচকা টান দিয়ে চলেছে সহিস, কিন্তু ব্যথাটা কিছু নয়। আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি আগেকার মতো হ্রেষাধ্বনি করে জোর কদমে ছুটলাম ওদের দিকে। কিন্তু আমার ডাকটা শোনাল করুণ, হাস্যকর আর বেমানান। পুরনো বন্ধুদের কেউ হাসল না বটে, কিন্তু দেখলাম ওদের অনেকে ভব্যতার খাতিরে ফিরে দাঁড়াল অন্যদিকে মুখ করে। বুঝলাম আমার চেহারাটা ওদের কাছে বিশ্রী, করুণ, লজ্জাকর এবং সবচেয়ে বেশী করে হাস্যকর ঠেকছে। আমার লিকলিকে, শির বের করা গলা, বিরাট মাথা। তখন রোগা হয়ে গিয়েছিলাম, লম্বা বিদঘুটে

পা, আর বোকার মতো দুলকি চালে আগেকার মতো সহিসকে পরিক্রমণ, সবকিছু নিশ্চয় হাস্যকর দেখাল। আমার ডাকে সাড়া দিল না কেউ, মুখ ঘুরিয়ে নিল সবাই। আর হঠাৎ সমস্ত কিছু বুঝে ফেললাম, বুঝলাম ওদের সবায়ের কাছ থেকে আমি দূরে সরে গিয়েছি চিরতরে। জানি না কী করে সেদিন ফিরেছিলাম আস্তাবলে।

"এ ঘটনাটির আগে থেকেই গম্ভীরতা ও চিন্তার দিকে আমার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল; এখন পুরোপুরি সেটা আমাকে পেয়ে বসল। লোকের মনে অবোধ্য ঘৃণা জাগানো আমার ডোরা দাগ, আমার অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্য, পাল ঘোড়ার খামারে আমার বিচিত্র স্থান, যার বিষয়ে আমি সচেতন, কিন্তু যার কারণ আমার অজ্ঞাত — সব মিলে আমাকে বাধ্য করল নিজের মধ্যে সরে যেতে। ডোরা দাগের জন্য আমাকে দোষ-দেওয়া মানুষের অবিচার নিয়ে ভাবতাম; ভাবতাম মাতৃস্নেহের আর সাধারণত নারীর প্রেমের ঠুনকো স্বভাব নিয়ে, সে প্রেম তো নির্ভর করে শুধু শারীরিক কারণের ওপর; সবচেয়ে বেশী ভাবতাম, আমাদের জীবনে এত গুরুতর ভূমিকা যার সেই মনুষ্যপদবাচ্য জন্তুবিশেষের খামখেয়াল নিয়ে, যে খামখেয়ালের ফলে পাল ঘোড়ার দলে আমার অবস্থাটা এমন অদ্ভুত দাঁড়িয়েছে। অবস্থাটার বিষয়ে সচেতন আমি, কিন্তু কেন ভেবে কূলকিনারা পেলাম না। এর মূলে যে মনুষ্যসুলভ খামখেয়াল তা সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল একটি ঘটনায়।

"তখন শীতের ছুটি। সারা দিন আমাকে অন্নজল দেওয়া হয়নি। পরে শুনলাম তার কারণ, সহিস নেশায় বুঁদ ছিল। সেদিন অশ্বপাল আমার চালায় আসাতে দেখল আমাকে খাওয়ানো হয়নি, অনুপস্থিত সহিসটির উদ্দেশ্যে বেজায় খিস্তি করে চলে গেল। পরের দিন সহিস ও তার দোস্ত আমাদের চালায় খাবার আনাতে দেখলাম তার বিশেষ একটা ফ্যাকাশে ও মনমরা ভাব, তার লম্বা পিঠে এমন একটা কিছু ছিল যেটা মনোযোগ ও অনুশোচনা আকর্ষণ করে। গরাদ দিয়ে রাগতভাবে খড় ছুঁড়ে দিল সে। মাথাটা বের করে তার কাঁধ পেরিয়ে রাখতে যাচ্ছি, সে নাকে এমন একটা ঘুঁষি কসাল যে ছিটকিয়ে পিছিয়ে গেলাম। তারপর পেটে একটা লাথি।

"'এই ঘেয়ো শয়তানটাই সব আপদের গোড়ায়,' বলে উঠল সে।

"'কেন, কী হল?' জিজ্ঞেস করল অন্য একটা সহিস।

"'বেটা কাউণ্টের ঘোড়ার বাচ্চা দেখতে যায় না, কিন্তু নিজের খাস-ঘোড়াকে দেখা চাই দিনে দ্ববার করে।'

"'বটে, ডোরাদারটাকে বুঝি ওকে দিয়ে দিয়েছে?' শ্বধাল আর একজন।

"'দিয়ে দিয়েছে না বেচেছে শয়তান জানে শ্বধ্ব। কাউণ্টের ঘোড়ার বাচ্চাগ্বলো না খেতে পেয়ে মর্বক, তাতে ওর কোনো পরোয়া নেই, কিন্তু ওর মালকে খেতে দিই না, কী দ্বঃসাহস আমার। বলল 'শ্বয়ে পড়' আর চাব্বক চালাল নিজে। খাঁটি ক্রীশ্চান কিনা! মান্বষের চেয়ে জন্তুর প্রতি দরদ বেশী। সবাই জানে বেটা অধার্মিক, গ্বনে গ্বনে চাব্বক মারল, জানোয়ার বেটা। এমন কি জেনারেল সাহেব পর্যন্ত কাউকে কখনো এত চাবকার্নান — পিঠের ছাল চামড়া তুলে নিয়েছে, সত্যি বলছি। বেটার দয়ামমতা বলে কিস্স্ব নেই।

"খৃষ্টধর্ম আর চাবকানোর ব্যাপারটা ভালো করে ব্বঝতে পারলাম, কিন্তু 'ওর খাস-ঘোড়া', 'ওর মাল' কথাগ্বলোর মানে কী তখন ঘ্বণাক্ষরে জানতাম না। মনে হল আমার ও অশ্বপালের মধ্যে কিছ্ব একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে কথাগ্বলোয়, কিন্তু সম্পর্কটা কী আমার কোনো ধারণা ছিল না তখন। এর বেশ কিছ্ব দিন পরে অন্য ঘোড়াদের কাছ ছাড়া করা হল আমাকে, শ্বধ্ব তখনি মানেটা স্পষ্ট হল। আমাকে যে কারো মাল বলা যেতে পারে, তখন আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমাকে উল্লেখ করে, জীবন্ত একটা ঘোড়াকে উল্লেখ করে 'আমার ঘোড়া' বলাটা কী অদ্ভুত ঠেকল, ঠিক যেমন অদ্ভুত ঠেকত যদি ও বলত 'আমার মাটি', 'আমার বাতাস', 'আমার জল'।

"তব্ব কথাগ্বলো গভীর দাগ কাটল আমার মনে। অনেক তোলাপাড়া করে মান্বষের সঙ্গে নানা বিচিত্র সম্পর্কের অভিজ্ঞতার পর শ্বধ্ব এসব অদ্ভুত কথাগ্বলো বলতে লোকে কী বোঝায় হৃদয়ঙ্গম হল। মানেটা হচ্ছে এই: মান্বষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে কাজ নয়, কথা। কিছ্ব করা বা না করার স্বযোগ যে তারা উপভোগ করে তা নয়, কয়েকটি বস্তুতে ছকবাঁধা

কয়েকটা কথা প্রয়োগ করার সুযোগ পেলে তারা আনন্দ পায়। সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপণ করে যে সব কথায় তাদের অন্যতম হচ্ছে 'আমার', কথাটা তারা প্রয়োগ করে রকমারি জীব আর বস্তুর প্রসঙ্গে, এমন কি জমি, মানুষ আর ঘোড়াও বাদ যায় না। ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছে যে একটি বিশিষ্ট জিনিস প্রসঙ্গে একটি মাত্র লোকের শুধু 'আমার' কথাটি ব্যবহারের অধিকার থাকবে। আর তাদের এই খেলায় যে সবচেয়ে বেশী জিনিসের প্রসঙ্গে কথাটি ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যায়, লোকের মতে সেই হল সবচেয়ে সুখী জন। এমনটা কেন হয় আমার কল্পনার বাইরে, কিন্তু ব্যাপারটা হল এই। এতে প্রত্যক্ষ উপকারটা কী হয় অনেক দিন বার করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কূলকিনারা পাইনি।

"যেমন ধরো, অনেকে আমাকে তাদের ঘোড়া বলেছে, কিন্তু কখনো চড়েনি আমার ওপর। চড়েছে অন্য লোক। আর তারা যে আমাকে খাইয়েছে তা নয়, খাইয়েছে অন্যেরা। আর আমার সেবা করেনি তারা, করেছে অপরেরা — কোচওয়ান, সহিস, ঘোড়ার ডাক্তার ইত্যাদি। তাই অনেক দেখে শুনে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, শুধু ঘোড়া নয়, সব বিষয়ে 'আমার' এই প্রত্যয়টির মূলে আছে শুধু একটি নীচ বর্বরোচিত প্রবৃত্তি, যেটাকে ওরা নিজেরাই বলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সহজাত বোধ বা অধিকার। 'আমার বাড়ি' বলে লোকে, যদিও ওখানে থাকে না, তাদের চিন্তা শুধু বাড়ি বানিয়ে রেখে দেওয়া। 'আমার দোকান', 'আমার কাপড়ের দোকান', বলে ব্যবসাদার, যদিও খাস দোকানের সেরা কাপড়ের জামাকাপড় কখনো চড়ায় না গায়ে। এমন লোকও আছে যারা এক টুকরো জমিকে নিজেদের বলে দাবী করে, অথচ কখনো পা দেয়নি তাতে, চোখে দেখেনি কখনো। এমন কি এমন লোকও আছে যারা অন্য মানুষদের নিজেদের সম্পত্তি বলে ভাবে, অথচ কখনো দেখেনি তাদের, তাদের সঙ্গে যা সম্পর্ক সেটা হল শুধু তাদের ক্ষতি করা। লোকে আবার কয়েকটি মেয়েছেলেকে নিজেদের মেয়েছেলে, নিজেদের স্ত্রী বলে, অথচ মেয়েগুলো থাকে অন্য পুরুষদের সঙ্গে। আর জীবনে মানুষের উদ্দেশ্য হল যেটাকে ভালো মনে করে তা করা নয়, যত বেশী পারে জিনিসকে নিজের বলাটা। আমার কোনো সন্দেহ নেই মানুষ আর আমাদের মতো পশুদের মধ্যেকার

প্রধান পার্থক্যটা হল এই। মানুষের ক্রিয়াকলাপকে, অন্তত যাদের সংস্পর্শে আমি এসেছি তাদের প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজ নয়, কথা, আর আমাদের ক্রিয়াকলাপের পেছনে আছে কাজ; শুধু এটারি জন্য, মানুষের তুলনায় শ্রেয় আমাদের অন্যান্য গুণাবলীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমরা জোর করে বলতে পারি যে প্রাণী জগতে মানুষের চেয়ে আমাদের স্থান একধাপ উঁচুতে।

"যাহোক, আমাকে 'আমার ঘোড়া' বলার অধিকার দেওয়া হয়েছিল অশ্বপালকে, তাই সহিসকে চাবকাল সে। এটা টের পেয়ে অভিভূত লাগল, আমার রঙ দেখে অন্যদের ধরনধারন ভাবসাব, সেটাও অভিভূত করে দিল আমাকে। একে মায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তায় এসব; সব মিলে আমি হয়ে দাঁড়ালাম গম্ভীর আর চিন্তাশীল, এখন যা দেখছ তাই।

"আমার দুর্ভাগ্য তিন রকমের: ডোরা দাগ, আমি আক্তা, আর লোকের ধারণায় আমি অশ্বপালের সম্পত্তি, নিজের এবং ঈশ্বরের জীব নয়, যেটা হওয়া প্রত্যেকটি প্রাণীর পক্ষে স্বাভাবিক।

"আমার বিষয়ে ওদের এটা ভাবার ফলাফল রকমারি হল। প্রথমত, অন্য ঘোড়াদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয় আমায়, খাওয়াদাওয়া ভালো জুটত, আরো শক্তি যাতে হয় তার জন্য চক্কর খাওয়াত, আর অন্যদের চেয়ে আগে বাগ মানানো হল আমাকে। তিনে পা দিয়েছি তখন প্রথম রাশ লাগানো হয়। সে দিনটা এখনো মনে আছে। অশ্বপাল, আমাকে যে নিজের সম্পত্তি ভাবত, এক দল সহিসের সঙ্গে এল গাড়িতে জুততে। ভেবেছিল আমি এমন বাধা দেব যে বাগ মানানো যাবে না। মুখ বেঁধে, বমের মাঝখানটায় জোর করে ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধল, পিঠে চামড়ার চওড়া সব পেটি বসিয়ে বেঁধে দিল বমের সঙ্গে, যাতে পাছা দিয়ে ধাক্কা দিতে না পারি; অথচ সুযোগ পাওয়া মাত্র ওদের বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম যে কাজ আমি ভালোবাসি, ব্যাকুলভাবে কাজ চাই।

"প্রবীণ ঘোড়ার মতো পা ফেলে বেড়িয়ে আসাতে ওরা অত্যন্ত অবাক। আমাকে ছোটানো শুরু হল, শুরু হল আমার কদম শেখার পালা। এত তাড়াতাড়ি শিখলাম যে তিন মাস পরে আমার চলার ভঙ্গির

তারিফ করলেন জেনারেল সাহেব স্বয়ং এবং অন্য অনেকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, আমি নিজের নই, অশ্বপালের সম্পত্তি এটা ভাবার ফলে আমার চলার অর্থটা ওদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে ধরা দিল।

"অন্যান্য বাচ্চা ঘোড়াদের নিয়ে যাওয়া হত ঘোড়দৌড়ের মাঠে, তারা ভালো করলে টুকে রাখা হত; লোকে তাদের দেখতে আসত। তারা টানত গিল্টি করা দু-চাকার গাড়ি, পিঠে চাপাত দামী কাপড়। আর আমাকে অশ্বপালের ছ্যাকড়া গাড়ি টেনে তার কাজে যেতে হত চেসমেনকা ও অন্যান্য গাঁয়ে। তার কারণ, আমার গায়ের ডোরা দাগ আর লোকেদের মতে, কাউণ্ট আমার মালিক নয়, আমি অশ্বপালের সম্পত্তি।

"অশ্বপাল আমাকে তার সম্পত্তি ধরে নেওয়ার পরিণাম কী ভয়ংকর হল, সে কথাটা তোমাদের কাল বলব, যদি বেঁচে থাকি।"

পরের দিন সারাক্ষণ পক্ষিরাজকে বিশেষ সমীহ দেখাল ঘোড়াগুলো। কিন্তু নেস্তের সেই বরাবরকার মতো রেহাই দিল না। চাষীর ক্ষেত-চষা ছাই-রঙা ঘোড়া পালের কাছে গিয়ে আবার ডাকল, আবার বাদামি ঘুড়ীটা ছেনালি চালাল তার সঙ্গে।

৭

তৃতীয় রাত্রি

প্রতিপক্ষের চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পড়েছে পক্ষিরাজের ওপর; উঠোনটার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে, চারিদিকে ভিড় করেছে অন্য ঘোড়ারা।

সে বলে চলল, "আমি কাউণ্টের বা ঈশ্বরের নই, আমি হলাম অশ্বপালের সম্পত্তি, এতে অবাক কাণ্ড হল একটা: আমার ক্ষিপ্র গতি, যেটা হল ঘোড়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, আমার নির্বাসনের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

"একদিন 'রাজহাঁস' নামের ঘোড়াটাকে দৌড় করানো হচ্ছে, চেসমেনকা থেকে ফিরতি পথে অশ্বপাল আমাকে নিয়ে গেল দৌড়ের জায়গায়। আমাদের ছাড়িয়ে গেল 'রাজহাঁস'। গতিটা ওর ভালো তবে জাঁক বেশী, আর দৌড়বার কায়দা আমার মতো রপ্ত হয়নি। একটা খুর মাটিতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে অন্য খুর তুলে নেবার অভ্যেস আমি করেছিলাম, যাতে

করে গতিবেগে বিন্দুমাত্র বাধা না পড়ে, প্রতিটি পদক্ষেপ শরীরটাকে আগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে লাগে। যা বলছিলাম, 'রাজহাঁস' আমাদের ছাড়িয়ে গেল। দৌড়বার জায়গার দিকে চললাম, বাধা দিল না অশ্বপালক। 'আরে, এর সঙ্গে পাল্লা দেবে না কি?' হাঁকল সে, আর 'রাজহাঁস' ফের আমাদের কাছে এসে পড়াতে ছেড়ে দিল আমাকে। ওর তো এরিমধ্যে বেশ গতিবেগ এসেছে, তাই প্রথম ঘুরটায় পিছিয়ে পড়লাম, কিন্তু পরেরটায় এগিয়ে যেতে শুরু করে ওকে ধরে ফেলে পাশাপাশি এসে পড়লাম, সেভাবে চলে গেলাম ওকে ছাড়িয়ে। আর একবার পরখ করা হল আমাকে। ফল হল আগেকার মতো। ওর চেয়ে ক্ষিপ্রগতি আমি। তাতে সবায়ের কী আতঙ্ক! ঠিক হল আমাকে দূরে কোথাও বেচে দেওয়া হবে, তাহলে আমার সন্ধান আর কেউ পাবে না। 'কথাটা কাউণ্টের কানে গেলে কী কাণ্ড হবে!' ওরা বলাবলি করল।

"তাই গাড়ির মাঝের ঘোড়া হিসেবে আমাকে বেচে দেওয়া হল একটি ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে। বেশী দিন থাকিনি তার সঙ্গে। নতুন ঘোড়ার জোগাড়ে-আসা একটি হুজারের কাছে বেচে দিল। সমস্ত ব্যাপারটা এত নির্দয়, এত অন্যায় যে খ্রেনভো থেকে আমার এত আপন ও প্রিয় সবকিছু ছেড়ে যখন আমাকে যেতে হল তখন খুশি হলাম। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টের। ওদের কপালে ভালোবাসা, সম্মান, মুক্তি; আমার কপালে শুধু কাজ আর গ্লানি, জীবনভোর শুধু কাজ আর গ্লানি। কী কারণে? শুধু ডোরা দাগ আছে বলে, তাই আমাকে পাচার করে দেওয়া হল অন্যের হাতে।"

সে রাত্রে আর গল্প বলার সুযোগ হল না পক্ষিরাজের। একটা জিনিস ঘটাতে ঘোড়াদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনা পড়ে গেল। মন দিয়ে এতক্ষণ গল্প শুনছিল কুপচিখা, তখনো তার বাচ্চা হয়নি, কিন্তু হঠাৎ সে ঘুরে ভারি পায়ে চলে গেল চালায়, সেখানে গিয়ে এত জোরে কাতরাতে লাগল যে সবাই ফিরে তাকাল। দেখল একবার শুয়ে পড়ছে, ধড়মড় করে উঠছে, আবার শুয়ে পড়ছে। প্রবীণারা বুঝল কী ব্যাপার, কিন্তু কমবয়সীরা এত ঘাবড়ে গেল যে আস্তা ঘোড়াটিকে ছেড়ে কুপচিখার চারিদিকে দাঁড়াল ভিড় করে।

সকালে দেখা গেল আর একটা বাচ্চা নড়বড়ে পায়ে দাঁড়িয়ে। সহিসকে ডেকে পাঠাল নেস্তের; সহিস ঘুড়ী আর বাচ্চাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল। কুপচিখাকে বাদ দিয়ে নেস্তের চলল ঘোড়ার পাল নিয়ে।

৮

চতুর্থ রাত্রি

সন্ধ্যেবেলায় দরজা বন্ধ হল; সবকিছু চুপচাপ। ডোরাদার আবার শুরু করল তার কাহিনী।

"হাত বদলি হতে হতে দেখলাম অনেক মানুষ, অনেক ঘোড়া। যে দুজনের কাছে সবচেয়ে বেশী দিন ছিলাম তাদের একটি হুজার বাহিনীর অফিসার, রাজকুমার তিনি; অন্যটি বৃদ্ধা, সিদ্ধিদাতা সেণ্ট নিকলাসের গির্জার কাছে তাঁর বাড়ি।

"জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কেটেছিল হুজারের সঙ্গে।

"যদিও তিনিই আমার সর্বনাশের মূলে যদিও জীবনে তিনি কাউকে বা কোন কিছুকে কখনো ভালোবাসেননি, তবু আমি ভালোবাসতাম তাঁকে, ভালোবাসতাম ঠিক সেইজন্য। তিনি সুদর্শন, ধনী ও সুখী বলে কাউকে ভালোবাসতেন না, আর তাই তাঁকে ভালোবাসতাম। জিনিসটা তোমরা বুঝবে; এটা হল আমাদের ঘোড়ার জাতের মহান মনোভাব। তাঁর নিরাসক্তি, তাঁর নিষ্ঠুরতা, তাঁর ওপর আমার একান্ত নির্ভরশীলতা আরো জোরালো করে তোলে তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসাকে। সে সব সুদিনে ভাবতাম, 'মারুন আমাকে, দৌড়িয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোক, তাহলে আরো সুখ পাবো।'

"অশ্বপাল যে ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে আটশ রুবলে আমাকে বেচেছিল তার কাছ থেকে তিনি আমাকে কেনেন। কেনার কারণ — অন্য কারো ডোরাদার ঘোড়া নেই। সে সব দিন আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের। রাজকুমারের একটি রক্ষিতা ছিল। কথাটা আমার অজানা ছিল না, প্রতিদিন তো তার কাছে নিয়ে যেতাম আর মাঝে মাঝে দুজনে একসঙ্গে গাড়ি চেপে বেড়াতেন। রক্ষিতাটি রূপসী; রাজকুমারের চেহারা

ভালো; কোচওয়ানকেও দেখতে ভালো, সেজন্য সবাইকে ভালোবাসতাম। আমার সুখের আর অন্ত ছিল না।

"দিন কাটত এই ভাবে। সকালে তদারক করতে আসত সহিস, কোচওয়ান নয় — সহিস। সহিসটি চাষীর ছেলে, ছোকরা বয়স, বেশ চঞ্চল। ঘোড়াদের গায়ের ভাপ যাতে বেরিয়ে যায় তার জন্য দরজা খুলে দিত, ফেলে দিত নাদা, তারপর আমাদের পিঠের কাপড় সরিয়ে খটরা দিয়ে আমাকে আঁচড়ানো চলত; খাঁজকাটা কাঠের তক্তায় শাদা সারিতে চাঁচরা পড়ত। খেলাচ্ছলে পা ঠুকে তার হাতে কামড়াতাম। আমার পালা এলে ঠান্ডা জলের চৌবাচ্চায় নিয়ে যেত, বেশ তারিফ করে দেখত হাতের কাজ, দেখত তীরের মতো সোজা গিয়ে চওড়া খুরে-বসা আমার পাগুলো; দেখত আমার চকচকে পিঠ আর পাছা, এত মসৃণ যে তাতে ঘুমনো চলে। তারপর উঁচু ঝাঁঝরির ওপর দিয়ে ফেলে দেওয়া হত খড়, যই ছড়িয়ে দেওয়া হত গামলায়। অবশেষে দেখা দিত ফেওফান, কোচম্যানদের সর্দার।

"কোচম্যানের ভাবগতিক প্রভুর মতো। দুজনেই নিজেদের ছাড়া জগতে আর কাউকে ভালোবাসত না, ডরাত না কাউকে, আর সেজন্যই ওদের ভালোবাসত সবাই। ফেওফান পরত লাল সার্ট, নকল মখমলের পেণ্টুলেন, বিনা-হাতা কোট। কী ভালো না লাগত যখন ছুটির দিনে বিনা-হাতা কোটে, তেলে চকচকে চুল আর গালপাট্টা নিয়ে আস্তাবলে এসে চেঁচিয়ে ও বলত, 'কী রে, আমাকে ভুলে গিয়েছিস নাকি, বেটা জানোয়ার?' আর একটা উকনঠেঙ্গার বাঁট দিয়ে খোঁচা দিত আমার রাঙে, ব্যথা দেবার জন্য নয়, মজা করে। আমি জানতাম ও শুধু মস্করা করছে, তাই কান লটকে দাঁত কড়মড় করতাম।

"একটা কালো ঘোড়া কাজ করত জোড়ে। রাত্তিরে আমার ঠাঁই হত তার সঙ্গে। পলকানটা ঠাট্টা ইয়ার্কি বুঝত না একেবারে শয়তানের বেহদ্দ ছিল। আমাদের চালা পাশাপাশি, মাঝে মাঝে গরাদের শিক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের আসল কামড়াকামড়ি চলত। ফেওফান তাকে ভয় পেত না। সটান কাছে গিয়ে হুঙ্কার দিত, যেন ওর জান নেবার মতলব, কিন্তু না — ওকে ছাড়িয়ে গিয়ে মুখের দড়ি নিয়ে ফিরে আসত।

কুজনেৎস্কি স্ট্রীটে একবার পলকান আর আমি কী ছুট না দিয়েছিলাম। কিন্তু না মনিব, না কোচম্যান, এতটুকু ভয় কারো নেই, হেসে হেঁকে লোকজনদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে তারা এমন সামলে আমাদের চালায় যে কারো চোট লাগেনি।

"অর্ধেক জীবন আর আমার যা কিছু সেরা গুণ দিয়েছিলাম ওদের। বড্ডো বেশী জল খেতে দিত আর আমার পাগুলোর দফারফা হয়ে গেল বটে, তবু আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে তখন।

"বেলা বারোটার সময় জিন লাগাতে আসত ওরা; খুরে তেল দেওয়া হত, কেশরে আর সামনের ঝুঁটিতে জল; তারপর গাড়িতে জোতা।

"বেতের শ্লেটায় মখমলের পাড় দেওয়া, লাগামে ছোট ছোট রুপোর বক্‌লস, রাশ আর জাল রেশমের। জিনটা এমন যে সবকটা বেল্ট আর পট্টি বসিয়ে কষে দেবার পর বলা যেত না কোথায় জিনসাজের শেষ আর কোথায় ঘোড়ার শুরু। সাধারণত আমাকে জোতা হত চালায়। পিঠের চেয়ে পাছা চওড়া ফেওফান বগলের নীচে লাল বেল্টটা চেপে ধরে, সাজসজ্জা দেখে নিয়ে, রেকাবে পা দিয়ে একটা কিছু ইয়ার্কি করে, শ্লেটায় বসে কোটটা ঠিকঠাক করে, চাবুকটা তুলত একবার; না তুললে নয় কিনা, অবশ্য আমার পিঠে কখনো পড়ত না ওটা; তারপর বলত, 'চল রে!' আর সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে ফটক হয়ে যেতাম বেরিয়ে, দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াত জলের বালতি হাতে রাঁধুনী, জ্বালানি কাঠ উঠোনে পোঁছিয়ে দিয়ে চাষীরা হাঁ করে চেয়ে থাকত।

"ফটক ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে থামার পালা। বাবুর চাকরবাকর আর অন্যান্য কোচম্যান গাড়ির চারদিকে জড়ো হয়ে গালগপ্প চালাত। সেখানে প্রবেশ-পথে সবাই দাঁড়িয়ে থাকতাম, কখনো কখনো পাক্কা তিনটি ঘণ্টা, মাঝে মাঝে একটু শুধু পা চালিয়ে আসা, তারপর ফিরে প্রতীক্ষার পালা।

"অবশেষে প্রবেশ-পথে সাড়াশব্দ, পাকা চুল মোটা পেট তিখন ফ্রককোট গায়ে ছুটে এসে হাঁকত, 'গাড়ি লেয়াও!' তখনকার দিনে ওরা বোকার মতো 'সামনে' বলে চেঁচাত না। যেন কোথায় যেতে হবে, সামনে না পেছনে, আমার জানা নেই! জিভ দিয়ে টকটক করত ফেওফান।

এগিয়ে যাওয়া হত, আর রাজকুমার বেরিয়ে আসতেন, শিরস্ত্রাণ আর ওভারকোটে সজ্জিত, বীবরের লোমের ছাই-রঙা কলারে তাঁর সেই সুন্দর টকটকে লাল, কালো ভুরু মুখ ঢাকা, যেটা হওয়া কখনো উচিত নয়; তাড়াতাড়ি উদাসীন ভাবে বেরিয়ে আসতেন তিনি, যেন শ্লে, ঘোড়া আর ফেওফান — কেউ বা কিছু আহামরি নয় একেবারে — ফেওফান তো কুর্নিশ করে হাত ছড়িয়ে এমন একটা ভঙ্গি নিত যে মনে হত ও অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা অসম্ভব; হ্যাঁ, যা বলছিলাম — জুতোর কাঁটা, তলোয়ার আর পেতলের গোড়ালি খটখটিয়ে, গালিচার ওপর পা ফেলে এমন ভাবে বেরিয়ে আসতেন রাজকুমার যেন তাঁর বড্ডো তাড়াহুড়ো, তিনি ছাড়া আর সবাই যাকে হাঁ করে তারিফ করছে সেই আমাকে, ফেওফানকে ও অন্যান্য কোনো কিছুকে দেখার সময় নেই তাঁর। ফেওফানের টকটক আওয়াজে দড়িতে টান দিয়ে ভব্য গতিতে কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, রাজকুমারের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে রেশমের মতো কেশর-ঝুঁটিওয়ালা খানদানী মাথাটা ঝাঁকাতাম। মেজাজ ভালো থাকলে রাজকুমার ফেওফানকে রসালো মন্তব্য করতেন দু একটা, উত্তরে সুন্দর মাথা একটুখানি ফেরাত ফেওফান, তারপর হাত না নামিয়েই রাশে প্রায় বোঝা যায় না অথচ আমার জানা এমন একটা টান দিত, আর চলা শুরু হত আমার, খট খট খট, প্রতি পদক্ষেপে বেগ বাড়ছে, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী কাঁপছে থর থর, কোচম্যানের সিটের সামনেটার গায়ে কাদা আর বরফের ছিটে লাগছে আমার পায়ের ধাক্কায়। সে সব দিনে, যেন পেটটা ব্যথায় সিঁটকে উঠেছে এমন ভাবে বোকার মতো 'ওফ !' বলে চেঁচাত না কোচম্যানরা, ওরা হাঁকত, 'খবরদার !' ফেওফান হাঁকত, 'খবরদার' আর ছত্রভঙ্গ হয়ে লোকে পথ করে দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখত সুন্দর আক্তা ঘোড়া, সুদর্শন কোচম্যান আর রূপবান রাজকুমার চলেছে।

"ধোরিতক-চালের ঘোড়াকে টেক্কা দিতে খাসা লাগত। প্রতিযোগিতার যোগ্য কোনো ঘোড়া ফেওফানের আর আমার চোখে পড়লেই তীরের বেগে পিছু ধাওয়া করতাম, ক্রমশ কাছে এসে পড়তাম, আরো কাছে, আরো, অবশেষে অন্য শ্লেটার পেছনে লাগত আমার পায়ের কাদার ছিটে; যাত্রীটির পাশাপাশি এসে পড়ে তার মাথার ওপর নাক দিয়ে

আওয়াজ, তারপর ঘোড়াটার যোয়াল বরাবর ছোটা, তারপর তাকে ছাড়িয়ে এত দূরে চলে যেতাম যে প্রতিযোগীকে আর দেখা যেত না, শুধু তার পায়ের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে কানে আসত।

"এতটুকু আওয়াজ বেরোত না রাজকুমার বা ফেওফান বা আমার মুখ দিয়ে; ভান করতাম স্রেফ কাজে যাবার তাড়ায় পথের ছ্যাকড়া গাড়ির সওয়ারীদের দিকে তাকাবার পর্যন্ত অবসর নেই। অন্য ঘোড়াকে টেক্কা দিতে ভালো লাগত আর ভালো লাগত ধোঁরিতক-চালের ভালো ঘোড়াকে আমার দিকে আসতে দেখলে: একটি মুহূর্ত শুধু শাঁশাঁ শব্দ, নিমেষের দৃষ্টি বিনিময় আর দুজন দুজনকে ছাড়িয়ে আবার যে যার পথে ছোটা।"

দরজাগুলোয় কিঁচকিঁচ আওয়াজ শোনা গেল নেস্তের আর ভাস্কার গলা।

পঞ্চম রাত্রি

আবহাওয়া বদলাচ্ছে। সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার, শিশির পড়েনি, কিন্তু হাওয়া গরম, উত্যক্ত করে মারছে মশার ঝাঁক। ঘেরা জায়গায় ফেরা মাত্র ঘোড়ার দল পক্ষিরাজের চারপাশে জড়ো হল, নিজের কাহিনী সে শেষ করল সেই রাত্রে।

"আমার সুখের দিনের অবসান হতে দেরী হল না। মাত্র দু বছর সুখে কেটেছিল। দ্বিতীয় শীতের শেষে জীবনের সবচেয়ে বড়ো আনন্দের স্বাদ পেলাম, আর তার কিছুদিন পরে সবচেয়ে বড়ো বিষাদ।

"শ্রোভটাইড তখন, ঘোড়-দৌড়ের মাঠে নিয়ে গিয়েছিলাম রাজকুমারকে। আতলাস্নি আর বিচক দৌড়চ্ছিল। জানি না বাজি রাখার জায়গায় কী নিয়ে কথা বলেছিলেন রাজকুমার, কিন্তু বেরিয়ে এসে তিনি ফেওফানকে হুকুম দিলেন দৌড়ের জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতে। মনে আছে সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, আতলাস্নির সঙ্গে দৌড়তে হল আমায়। একটা দু চাকার গাড়ি টানছিল আতলাস্নি, আমি জোতা ছিলাম সহুরে শ্লেতে। বাঁকের মাথায় ওকে ছাড়িয়ে যেতে মাঠে হাসি আর হাততালির হুল্লোড় পড়ে গেল।

"দৌড়বার জায়গায় আমাকে ঘোরাবার সময় পিছু পিছু ভিড় করে এল কত লোক। হাজার হাজার টাকায় আমাকে কিনতে চাইল জন পাঁচেক ঘোড়া-বিলাসী। রাজকুমার শুধু ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসলেন।

"'না, সে হয় না,' বললেন তিনি। 'ও তো শুধু ঘোড়া নয়, বন্ধুও বটে। পাহাড়প্রমাণ সোনা দিলেও বেচব না। নমস্কার, মশাইরা,' বলে শ্লের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

"'ওস্‌তজেন্‌কা স্ট্রীট!' রক্ষিতা থাকত সে রাস্তায়। তীরবেগে চললাম।

"আমাদের জীবনে সুখের শেষ দিন সেটা।

"এসে পড়লাম রক্ষিতার বাড়িতে। তিনি তাকে 'আমার' বলতেন, কিন্তু সে উধাও অন্য প্রেমিকের সঙ্গে, তাকেই ভালোবাসত। খবরটা তিনি পেলেন তার ফ্ল্যাটে। তখন বিকেল পাঁচটা। আমার সাজ খোলা আর হল না, মেয়েটির উদ্দেশ্যে তিনি চললেন। আর একটা জিনিস — এর আগে কখনো তেমন হয়নি: চাবুক মারা হল আমাকে যাতে প্লুত গতিতে ছুটি। জীবনে এই প্রথম একবার সঠিক পা পড়ল না; লজ্জা পেয়ে ভুল শোধরাবার কথা ভাবছি, হঠাৎ শুনলাম রাজকুমার অস্বাভাবিক গলায় চেঁচাচ্ছেন, 'ছোট্‌ বেটা।' আর হাওয়ায় শিস দিয়ে চাবুকটা পড়ল পিঠে, আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম, কোচম্যানের সিটের সামনেটায় বারবার পা খটখট করে লাগতে লাগল। পঁচিশ ভারস্ট যাবার পর ধরে ফেললাম মেয়েটিকে।

"বাড়ি ফিরিয়ে আনলাম রাজকুমারকে। সারা রাত শরীর থরথর কাঁপতে লাগল, খেতে পারলাম না কিছু। সকালে জল খেতে দিল। খেলাম আর তারপর আমি আর আগেকার আমি রইলাম না। অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমাকে ওরা যন্ত্রণা দিল, শরীরের ক্লেশ ঘটাল — যাকে বলে আমার 'চিকিৎসা' চালাল। খুরগুলো ক্ষয়ে গেল, শরীর ভরে গেল পাঁচড়ায়, পাগুলো বেঁকে গেল, বুক দুমড়ে বসে গেল, দেহে আর মনে শ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

"একটা ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে আমাকে বেচে দেওয়া হল। সে গাজর আর কী সব খাইয়ে বোকা লোকের চোখে ধুলো দেবার মতো

আমাকে কিছু একটা খাড়া করল, সেটা আমার স্বরূপ নয়। আমার না ছিল শক্তি না ছিল দ্রুত দৌড়ের ক্ষমতা। তাছাড়া আমাকে আরো একটা যন্ত্রণা দিত ঘোড়া-ব্যবসায়ীটি: কোনো খরিদ্দার এলেই চালায় ঢুকে চাবকে ভয় দেখিয়ে আমাকে পাগল করে দিত। তারপর চাবুক মারার দাগ মুছে বের করত আমায়।

"আমাকে কিনলেন একটি বৃদ্ধা। সিদ্ধিদাতা সেণ্ট নিকলাসের গির্জায় তিনি আমাকে সর্বদা হাঁকিয়ে নিয়ে যেতেন, আর কোচম্যানকে চাবকাতেন। কোচম্যান আমার চালায় এসে কাঁদত। চোখের জলের যে একটা খাসা নোনতা স্বাদ আছে সেটা আবিষ্কার করলাম তখন। তারপর বৃদ্ধা দেহত্যাগ করলেন। তাঁর নায়েব একটা দোকানদারের কাছে আমাকে বেচে দিল; তার কাছে থাকার সময় এত বেশী গম খেতাম যে আমার রোগ আরো বেড়ে গেল। সে আমাকে বেচে দিল একটি চাষীর কাছে। লাঙল টানার পালা, খাওয়া দাওয়ার বালাই বলতে গেলে নেই। আবার অসুখে পড়লাম।

"জিনিসের বদলে আমাকে দেওয়া হল একটি বেদেকে। দারুণ নিপীড়ন করত লোকটা। শেষ পর্যন্ত আমাকে বেচে দিল এখানকার নায়েবের কাছে। এই তো দেখছ আমাকে।"

কোনো শব্দ করল না কেউ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল।

৯

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়ার পাল ঘরে ফিরছে, দেখা গেল মনিবকে, সঙ্গে একটি অভ্যাগত। বাড়ির কাছে এসে পড়ে প্রথমে তাদের দেখে জুলদিবা — দুজন পুরুষ মূর্তি, একজন হলেন খড়ের টুপি মাথায় কমবয়সী মনিব, অন্যটি দীর্ঘকায় ও স্থূল. গায়ে ফৌজী পোষাক। বুড়ী ঘোড়াটা আড়চোখে তাকিয়ে পাশ কাটাল। কিন্তু অন্যদের বয়স কম, তাদের কেমন যেন অস্বস্তি আর সঙ্কোচ, বিশেষ করে যখন মনিব ও অভ্যাগতটি সোজাসুজি তাদের মধ্যে এসে পড়ে হাত দিয়ে এ ওকে কী সব দেখিয়ে কথা বলতে লাগলেন।

'ডোরাদার ছাই-রঙা ঘোড়াটা কিনেছি ভয়েকভের কাছ থেকে,' মনিব বললেন।

'ওই শাদা-পা কালো ঘুড়ীটা কার? দেখতে বেড়ে,' বললেন অভ্যাগত।

ঘোড়াদের পিছু ধাওয়া করে দাঁড়িয়ে অনেককে তাঁরা দেখলেন। খয়েরি রঙের ঘুড়ীটা চোখে পড়ল।

'ও হল খেনভোর জিন-ঘোড়ার বংশজাত,' মনিব বললেন।

সবকটা ঘোড়াকে সে অবস্থায় দেখা সম্ভব নয়। মনিব নেস্তেরকে ডাকাতে ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটির পাঁজরে জুতোর খোঁচা মেরে বুড়ো কদম চালে দৌড়ে এল। এক পায়ে খোঁড়াচ্ছে, তবু ভালো দৌড়বার একটা কোরশীস করল সে; বোঝা গেল প্রাণপণ বেগে দুনিয়ার একেবারে ও প্রান্তে তাকে ছোটার হুকুম দিলেও আপত্তি করবে না। বল্গিত চালে ছোটার অভিলাষ তার; যে পাটা ভালো সেটা দিয়ে চেষ্টাও করল একবার।

'সত্যি বলছি, ওর মতো ঘুড়ী সারা রাশিয়ায় আর পাবেন না,' একটা ঘুড়ীকে দেখিয়ে মনিব বললেন। তারিফ করে সায় দিলেন অতিথি। মনিব উত্তেজনা ভরে এদিক সেদিক ছুটে ঘোড়াগুলোকে দেখিয়ে তাদের বংশ ইতিহাস শোনাচ্ছেন। মনে হল অতিথিটির একঘেয়ে লাগছে, তবু আগ্রহ দেখাবার ভান করে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন।

'কী বললে? হ্যাঁ, তাই তো!' অন্যমনস্কভাবে তিনি বললেন।

'দেখ দিকি এটাকে,' মনিব বললেন, অতিথির যে একঘেয়ে লাগছে তাঁর হুঁশ নেই। 'পাগুলো একবার দেখ। ওর জন্যে মোটা টাকা দিতে হয়েছিল, কিন্তু ওর তিন বছরের বাচ্চা এখনি কদম চালে চলতে শুরু করেছে!'

'চালটা ভালো?' জিজ্ঞেস করলেন অতিথি।

একটার পর একটা ঘোড়া নিয়ে আলোচনা চলল, দেখাবার মতো আর কিছু নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'তাহলে যাওয়া যাবে নাকি এবার?'

'চল।'

ফটক হয়ে ভেতরে গেলেন দুজন। দেখাশোনা শেষ হয়েছে বলে অতিথি খুশি, এবার বাড়ি গিয়ে খাওয়া আর ধূম ও মদ্য পান করা চলবে। মেজাজটা তাঁর আগেকার চেয়ে খোশ বলে মনে হল। আরো কী হুকুম হয় তার প্রতীক্ষায় পক্ষিরাজের পিঠে চেপে নেস্তের বসেছিল; পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঘোড়াটার পাছায় মোটাসোটা বড়ো হাতের থাপ্পড় বসিয়ে অতিথি বলে উঠলেন:

'এটা দেখছি ডোরাদার! এক কালে আমার একটা ডোরাদার ঘোড়া ছিল তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে?'

কথাটা তাঁর ঘোড়াদের নিয়ে নয়, তাই তাতে কান না দিয়ে মনিব নিজের ঘোড়াগুলোকে দেখে চললেন।

হঠাৎ একেবারে কান ঘেষে একটা হাস্যকর ক্ষীণ অথর্ব হ্রেষাধ্বনি। আওয়াজটা আস্তা ঘোড়ার, কিন্তু যেন বিব্রত বোধ করে সে থেমে গেল। হ্রেষাধ্বনিতে কান দিলেন না মনিব না অতিথি, বাড়ি চলে গেলেন।

ঘোড়াটি চিনেছিল মেদবহুল বৃদ্ধটিকে — ইনি হলেন তার আগের প্রিয় মনিব, সেই একদা ধনী ও রূপবান রাজকুমার সেরপুখভস্কয়।

. . . .

১০

ঝুর ঝুর বৃষ্টির আর শেষ নেই। ঘেরা জায়গাটায় মন খিঁচড়ে যায়, বড়ো বাড়িতে কিন্তু আবহাওয়া আলাদা। জমকালো ড্রয়িং-রুমে দেওয়া হচ্ছে জমকালো চা। টেবিলে বসে গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী ও অতিথি।

গৃহকর্ত্রী সন্তানসম্ভবা; সেটা বোঝা যায় তাঁর স্ফীত উদর থেকে, সামোভারের পিছনে কেমন খাড়া হয়ে বসে আছেন তা থেকে, তাঁর থলথল ভাব আর বিশেষ করে তাঁর বড়ো বড়ো চোখ থেকে, তাতে মোলায়েম ও গম্ভীর একটা ভাব, মনে হয় নিজের অন্তরে দৃষ্টি নিহত।

দশ বছরের পুরনো অতি উৎকৃষ্ট সিগারের বাক্স গৃহকর্তার হাতে, এ রকমটা আর কারো নেই; অন্তত তাই বলে অতিথির কাছে তাঁর বড়াই করবার কথা। গৃহকর্তাটির চেহারা ভালো, বয়স প্রায় পঁচিশ,

হাবভাব তাজা, সুবেশ ফিটফাট মানুষ। বাড়িতে তিনি লণ্ডনে বানানো মোটা পশমের একটা ঢিলে স্যুট পরতেন। ঘড়ির চেনে ভারি সোনার রিঙ। কফলিংকগুলো বড়ো, ভারি সোনার, পীরোজা বসানো। দাড়ির ছাঁট তৃতীয় নেপোলিয়নের কেতায়, ওপরের ঠোঁটের দু পাশে পাতলা সরু গোঁফ মোম দিয়ে অতি সুষ্ঠুভাবে পাকানো, যেন খাস প্যারিসে চর্চা করা হয়েছে। গৃহকর্ত্রীর পরনে ফুলের গুচ্ছের নকসা-কাটা পাতলা সিল্কের গাউন, বড়ো বেঁকানো সোনার পিন ঘন কটা চুলের রাশে — অতি সুন্দর চুল, সবটা তাঁর নিজস্ব না হলেও। হাতে বেশ কয়েকটা দামী আংটি আর বালা। সামোভারটা রুপোর, চায়ের সেট সেরা চীনা মাটির। দরজায় পাথরের মূর্তির মতো ফাই-ফরমায়েশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে খানসামা, পরনে চমৎকার টেলকোট ও শাদা ভেস্ট, গলায় টাই। ঘরের আসবাবপত্র কাঠে খোদাই, বেঁকা চেহারায় একটু বেশী জমকালো। দেয়াল-কাগজে ঘোর ছাই-রঙা ফুল আঁকা। টেবিলের কাছে জাতে অত্যন্ত কুলীন একটি গ্রেহাউন্ড শুয়ে আছে, গলার রুপোলি চেনটা থেকে থেকে ঠুনঠুন আওয়াজ করে উঠছে। কুকুরটা অসাধারণ লিকলিকে, কী একটা জটিল ইংরেজী নাম তার, সেটা না মনিব না গৃহকর্ত্রী উচ্চারণ করতে পারতেন, কেননা ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। এক কোণে ফুলের মধ্যে অলংকৃত বড়ো একটা পিয়ানো। সবকিছু দেখে মনে হয় অভিনব, বিরল ও দামী। সবকিছু খাসা, তবে সবকিছুতে বিলাসের ও ধনের একটা ছাপ, বুদ্ধি ও রুচির একটা অভাব।

রেসের ঘোড়া নিয়ে পাগল গৃহকর্তা। তাগড়া চেহারার ফূর্তিবাজ লোকটি সেই জাতের মানুষ যারা কখনো বিলুপ্ত হয় না, যারা নকুলের লোমের পোষাকে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায়, অভিনেত্রীদের ছুঁড়ে দেয় দামী ফুলের তোড়া, সবচেয়ে সৌখীন হোটেলে সবচেয়ে নতুন আর সবচেয়ে দামী মদ্য পান করে, নিজের নামে পুরস্কার বিতরণ করে, আর রাখে সবচেয়ে বেশী খরচার রক্ষিতা।

তাঁর অতিথি নিকিতা সেরপুখভস্কয়ের বয়স চল্লিশের বেশী — তিনি দীর্ঘকায় ও মোটা, মাথায় টাক, গোঁফজোড়া বড়ো, জুলপি আছে।

যৌবনে নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, এখন শরীর, নীতিবোধ ও অর্থ সামর্থ্যের দিক থেকে পতন হয়েছে।

ধারে তিনি এত ডুবে যান যে জেল এড়াবার জন্য সরকারী চাকরী নিতে হয়েছে। এখন তিনি যাচ্ছেন একটি প্রাদেশিক সহরে, সেখানে অশ্বপালনের ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। চাকরীটা পেয়েছেন প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়স্বজনের দৌলতে। তাঁর পরনে ফৌজী টিউনিক ও নীল পেণ্টুলেন। টিউনিক ও পেণ্টুলেন বড়োলোকসুলভ, অন্য কাপড়চোপড়ও তাই; ঘড়িটা ইংলণ্ডে তৈরী। জুতোর তলা অসাধারণ, প্রায় ইঞ্চি খানেক মোটা।

বিশ লক্ষ রুবল ফুঁকে দিয়েছেন নিকিতা সেরপুখভস্কয়, এখন তিনি লোকের কাছে ধারেন এক লক্ষ বিশ হাজার। এত টাকার মালিক একবার হলে বেশ একটা প্রতিপত্তি হয়, তাতে করে আরো বছর দশেক ধারের টাকায় প্রায় বিলাসিতায় সময় কাটানো সম্ভব। কিন্তু সে দশ বছর সমাপ্ত হয়েছে, উবে গেছে প্রতিপত্তি, আর এখন নিকিতার জীবন দুর্বহ। মদ ধরেছেন তিনি, অর্থাৎ মদ খেলে এখন মাতাল হয়ে যান, যেটা আগে কখনো হত না। আর যদি মদ্য পানের কথা বলেন, কবে ধরেছেন, কবে শেষ করবেন বলা শক্ত। তাঁর অধঃপতন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাকানোর অস্থির ভাবটায় (চোখে এরিমধ্যে শূন্য দৃষ্টি), কণ্ঠস্বর ও অঙ্গ সঞ্চালনের বাধো বাধো ভঙ্গিতে। আগে কখনো তিনি কাউকে বা কোনো কিছুকে ডরাননি, শুধু হালের দুঃখকষ্টের ফলে স্বভাববিরুদ্ধ আশঙ্কার একটা ভাব এসেছে, এটা স্পষ্ট ধরা পড়ে বলে অস্বস্তিটা আরো বেশী করে চোখে ঠেকে। গৃহকর্তা গৃহকর্ত্রী দুজনেই এটা লক্ষ্য করে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, পরস্পরের মনের কথা বুঝেছেন তার আভাস দিয়ে। শুতে যাবার সময় পর্যন্ত লোকটির কথা না হয় স্থগিত থাক; আপাতত বেচারীকে মেনে নেওয়া হোক, এমন কি মিষ্টি ব্যবহার করা হোক তাঁর সঙ্গে। নবীন গৃহকর্তার সুখের চেহারায় ক্ষুণ্ণ বোধ করলেন নিকিতা, অতীত দিনের, যে দিন আর কখনো ফিরবে না, সে দিনের স্মৃতি ফিরে আসাতে ঈর্ষা হল মনে।

'ধূম পান করলে আশা করি কিছু মনে করবেন না, মেরি?' তিনি

জিজ্ঞেস করলেন; মহিলাটিকে সম্বোধন করার ধরনটা বিচিত্র ও এড়িয়ে যাওয়া গোছের; অনেক অভিজ্ঞতার ফলে আসা এই ধরনটা ভব্য ও হৃদ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সম্মানসূচক নয় — বন্ধুর স্ত্রী নয়, তার রক্ষিতাকে এভাবে সম্বোধন করে চালু লোকেরা। মহিলাকে অপমান করবার মতলব তাঁর ছিল না; বরং তাঁর এবং গৃহকর্তার মন জুগিয়ে চলার অভিলাষ আছে — যদিও নিজে সেটা তিনি কখনো স্বীকার করতেন না। এ ধরনের মেয়েদের সঙ্গে এ ভাবে কথা বলা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এই যা। তিনি জানতেন যে গৃহকর্ত্রীকে মহিলার সম্ভ্রম দেখালে তিনি নিজে অবাক হয়ে যেতেন, এমন কি অপমানিত বোধ করতেন। তাছাড়া, সমকক্ষের খোস স্ত্রীর সঙ্গে সমীহ করে কথা বলার প্রচলিত রীতিটা যত্রতত্র প্রয়োগ করা তো চলে না। রক্ষিতাদের তিনি সর্বদাই একটু খাতির করে সম্বোধন করতেন; তার কারণ এই নয় যে, পদনির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের মূল্য, বিবাহের কৃত্রিমতা, ইত্যাদি বিষয়ে কাগজে পত্রিকায় প্রকাশিত তথাকথিত মতামতে তিনি বিশ্বাস করেন (এ ধরনের পচা মাল তিনি কখনো পড়তেন না); কারণটা এই যে, ভব্য লোকেরা সবাই তাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে থাকে, আর তিনি নিজে তো অত্যন্ত ভব্য, অবস্থা না হয় পড়ে গেছে।

একটা সিগার নিলেন তিনি। সুবিবেচনার পরিচয় না দিয়ে গৃহকর্তা কয়েকটা সিগার তুলে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'এইগুলো নাও না, কী ভালো দেখ।'

সিগারগুলো সরিয়ে দিলেন নিকিতা। অপমান ও আঘাতের একটা ভাব ঝিলিক দিয়ে গেল চোখে।

'ধন্যবাদ,' নিজের সিগার-কেস বের করে বললেন, 'এর একটা খেয়ে দেখ।'

গৃহকর্ত্রী বুদ্ধিমতী। ব্যাপারটা বুঝে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সিগার আমার ভয়ানক ভালো লাগে। আশেপাশের সবায়ের মুখে চব্বিশ ঘণ্টা সিগার না থাকলে হয়ত আমি নিজেই খেতাম।' আর নিজস্ব মিষ্টি, সদয় হাসি একটা হাসলেন তিনি। নিকিতা কাষ্ঠ হেসে সাড়া দিলেন; সামনের দুটো দাঁত তাঁর নেই।

'না, এটা নাও,' জেদ ধরলেন গৃহকর্তা, সূক্ষ্ম লোক তিনি নন। 'ওগুলো কড়া নয়। ফ্রিৎস্, bringen sie noch eine Kasten, dort zwei!*'

নতুন একটা বাক্স নিয়ে এল জার্মান খানসামা।

'কী বেশী ভালো লাগে তোমার? কড়া? এগুলো চমৎকার। সব কটা নিয়ে নাও,' তিনি বলে চললেন। নিজের মহামূল্য সব জিনিস দেখাতে পেরে তিনি এত খুশি যে অন্য কিছুর হুঁশ নেই। সেরপুখভস্কয় সিগার ধরিয়ে তাড়াতাড়ি পুরনো আলাপের খেই ধরলেন।

'আতলাস্নির জন্যে কত টাকা দিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তা বেশ। অন্তত পাঁচ হাজার, কিন্তু ঠকিনি একেবারে। ওর বাচ্চাগুলোকে তোমার একবারটি দেখা উচিত।'

'রেসের ঘোড়া?'

'প্রত্যেকটা। এ বছরে ওর মন্দা বাচ্চাটা তিনটে প্রাইজ পেয়েছে: তুলায়, মস্কোয় আর পিটার্সবুর্গে। ভয়েকভের ভরনয়ের সঙ্গে টেক্কা দিয়েছিল। হতচ্ছাড়া জকিটা বারবার চারবার ভুল করল, তা নাহলে ভরনয়কে একেবারে বসিয়ে দিত।'

'ও এখনো একটু কাঁচা। আমার মতে বড্ডো বেশী ডাচ্ রক্ত ওর শরীরে,' বললেন সেরপুখভস্কয়।

'আর মাদীগুলো? কাল দেখাব তোমায়। দব্রিনিয়াকে কিনি তিন হাজার রুবলে, আর লাস্কভায়াকে দু হাজারে।'

গৃহকর্তা আবার নিজের ধনসম্পত্তির বড়াই চালালেন। গৃহকর্ত্রী দেখলেন এতে সেরপুখভস্কয়ের মনে কষ্ট হচ্ছে, তিনি শুধু শোনার ভান করছেন।

'আর একটু চা নেবেন?' গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

'না,' বলে গৃহকর্তা কথা বলেই চললেন। গৃহকর্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, কর্তা কিন্তু বাধা দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন তাঁকে।

ওদের চেয়ে দেখতে দেখতে সেরপুখভস্কয় আর একটু হলে হাসতেন — মনোরঞ্জনের জন্য অস্বাভাবিক একটা হাসি হয়ত হাসতেন,

* আর একটা বাক্স নিয়ে এসো, ওখানে দুটো আছে। (জার্মান ভাষায়)

কিন্তু গৃহকর্তা উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটির কোমর জড়িয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে তাঁর মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেল। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, ফোলা মুখে হঠাৎ এল হতাশার ছাপ। এমন কি ক্রুদ্ধ আক্রোশের একটা আভাস পর্যন্ত এল মুখে।

১১

হাসিমুখে ফিরে গৃহকর্তা বসলেন নিকিতার সামনে। কিছুক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই।

'ওকে ভয়েকভের কাছ থেকে কিনেছ বলছিলে, তাই না?' এমনি জিজ্ঞেস করছেন ভাবটা।

'হ্যাঁ, আতলাস্‌নিকে। দুবভিৎস্কির কাছে একটা মাদী ঘোড়া কেনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কেনার মতো কিছু পেলাম না।'

'ও ফতুর হয়ে গিয়েছে,' বলেই সেরপুখভস্কয় হঠাৎ থেমে গিয়ে চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলেন। মনে পড়ে গেল এই 'ফতুর হয়ে যাওয়া' লোকটির কাছে তিনি বিশ হাজার রুবল ধারেন। দুবভিৎস্কি 'ফতুর হয়ে গেছে' যদি লোকে বলে, তাহলে তাঁর নিজের বিষয়ে কী বলবে? চুপ করে গেলেন তিনি।

অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই। গৃহকর্তা ভাবতে লাগলেন কী নিয়ে অতিথির কাছে বড়াই করা চলে। নিজে এখনো ফতুর হননি বোঝাবার জন্য কী বলা যায় ভাবতে লাগলেন সেরপুখভস্কয়। সিগারগুলো বেশ কড়া বটে, কিন্তু দুজনেরি মাথা ঠিক খুলল না।

"মদ খেলে মন্দ হয় না।" সেরপুখভস্কয় চিন্তা করতে লাগলেন।

"মদ না খেলে নয়, নইলে এর কাছে বসে একঘেয়েমিতে মারা পড়ব দেখছি," ভাবলেন গৃহকর্তা।

'এখানে তোমার অনেক দিন থাকার ইচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন সেরপুখভস্কয়।

'আর এক মাস। সাপার খেলে হয় এবার, কী বল? খাবার তৈরী, ফ্রিৎস?'

খাবার-ঘরে দুজনে গেলেন। ঝাড়ের নীচে টেবিল, তাতে শাখাবিশিষ্ট সুন্দর দীপাধার আর গুচ্ছির চমকদার জিনিস: সিফন, ছিপিতে আঁটা পুতুল, ভোদকা, উৎকৃষ্ট মদের ডিকাণ্টার, উৎকৃষ্ট চর্ব্যচষ্যে বোঝাই রেকাবী। মদ্যপান হল, তারপর আহার, আবার মদ্যপান, তারপর আহার, অবশেষে শুরু হল কথাবার্তা। সেরপুখভস্কয়ের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কথাবার্তা চালাচ্ছেন অবাধে।

কথা হল মেয়েদের নিয়ে। কার কাছে কী মাল — বেদেনী, বাইজী না ফরাসী মেয়ে।

'মাতিয়েকে ত্যাগ করলে কেন?' গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করলেন। মাতিয়ে হল সেই মেয়েটি যে সেরপুখভস্কয়ের সর্বনাশ করে।

'ত্যাগ আমি করিনি, ত্যাগ করে ও। সত্যি ভাই, বয়সকালে কত টাকা না ফুঁকে দিয়েছি! আজ হাতে হাজারখানেক রুবল এলে বেড়ে লাগে, সবাইকে ছেড়ে কেটে পড়াটা মনে হয় বেশ। মস্কোতে থাকার আর উপায় নেই। ওঃ, সত্যি যখন সে-সব কথা মনে পড়ে!'

সেরপুখভস্কয়ের কথাবার্তা একঘেয়ে লাগছে গৃহকর্তার। তাঁর ইচ্ছে নিজের কথা বলা, জাঁক দেখানো। আর সেরপুখভস্কয় চান নিজের কথা বলতে, নিজের উজ্জ্বল অতীতের দিনগুলোর কথা বলতে। আর এক গেলাস তাঁকে ঢেলে দিয়ে গৃহকর্তা তাক করে রইলেন কখন তাঁর কথা শেষ হবে, তাহলে তিনি জানাতে পারবেন কী ভাবে তিনি ঘোড়ার পাল-খামারের সুব্যবস্থা করেছেন, অভাবিত ব্যবস্থা সেটা; আর মারি যে তাঁকে টাকার জন্য ভালোবাসে তা নয় মোটে, ভালোবাসে মনেপ্রাণে।

'তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে আমার খামারে,' আরম্ভ করলেন তিনি, কিন্তু বাধা দিয়ে সেরপুখভস্কয় বললেন:

'এক কালে বেঁচে থাকতে ভালো লাগত, জানতাম কী করে বাঁচতে হয়, জোর গলায় বলতে পারি সেটা। ঘোড়ায় চড়ার কথা এইমাত্র বলছিলে না? বলো তো, সবচেয়ে তেজী কোন ঘোড়া তোমার?'

পাল-খামারের কথা বলার সুযোগ এতক্ষণে পেয়ে খুশি হয়ে গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি শুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার বাধা দিয়ে সেরপুখভস্কয় বললেন:

'ও হ্যাঁ, পাল-খামারের মালিকরা তো শুধু জাঁকের তালে থাকে, আমোদপ্রমোদ, ভালো ভাবে থাকার ইচ্ছে তাদের নেই। আমি কিন্তু কখনো ও রকমটা ছিলাম না। তোমাকে আজকেই তো বলছিলাম আমার একটা ডোরাদার কদম চালের ঘোড়া ছিল, যে ঘোড়াটায় তোমার অশ্বপালক বসেছিল ঠিক তার মতো ডোরাদার। ঘোড়ার মতো ঘোড়া ছিল বটে! বললে তোমার বিশ্বাস হবে না। ১৮৪২ সালের ঘটনা, সবে মস্কোয় গিয়েছি। ঘোড়া-ব্যবসায়ীর ওখানে গিয়ে দেখলাম একটা ডোরাদার আক্তা ঘোড়া। বেশ ভালো। পছন্দ হল। দাম কত? এক হাজার। ঘোড়াটাকে পছন্দ হল, কিনে ফেললাম। চড়া শুরু হল। ওর মতো ঘোড়া তোমার আমার বা আর কারোর হবে না কখনো! যেমন বেগ তেমন শক্তি আর রূপ, ওর আর জুড়ি নেই! তোমার বয়স তখন নেহাৎ কম, ওকে দেখনি, কিন্তু ওর কথা শুনেছ নিশ্চয়। সারা মস্কো জানত ওর কথা।'

'হুঁ। মনে হচ্ছে শুনেছিলাম,' অনিচ্ছাসত্ত্বে বললেন গৃহকর্তা। 'কিন্তু তোমাকে বলতে চাইছিলাম যে আমার ...'

'শুনেছিলে নিশ্চয়। আমি তো ওকে সটান কিনে ফেলেছিলাম, কাগজপত্র, বংশ পরিচয় বা সুপারিশের তোয়াক্কা করিনি। পরে জানতে পারি। ভয়েকভ আর আমি বের করে ফেলি। ও হল পক্ষিরাজ, বাজীবাহাদুরের ছেলে। পা ফেলার মাপটা ইয়া লম্বা। ডোরাদার বলে খেত্রনভো পাল-খামার থেকে ওকে অশ্বপালের কাছে বেচে দেওয়া হয়েছিল, সে তাকে আক্তা করে বেচে দেয় একটা ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে। ওর মতো ঘোড়া আর দেখিনি, দোস্ত! হ্যাঁ, ছিল বটে সে সব দিন! হায়রে যৌবন, হারানো যৌবন!' বেদেদের একটা গানের লাইন ভাঁজলেন তিনি। নেশা ধরতে শুরু করেছে তখন। 'হ্যাঁ, ছিল বটে সে সব দিন! আমার বয়স তখন পঁচিশ, আয় বছরে আশি হাজার, চুল একটাও পাকেনি, একটা দাঁতও পড়েনি, প্রত্যেকটা মুক্তোর মতো। যাতে হাত দিই সেটাই সফল হয়: আর এখন ... সবকিছু শেষ।'

'সে সব দিনে কিন্তু ঘোড়াগুলো এত তেজী ছিল না,' সেরপুখভস্কয় থেমে যাবার সুযোগটা ছাড়লেন না গৃহকর্তা। 'তোমাকে বলি তাহলে, আমার প্রথম ঘোড়াগুলো দৌড়তে শুরু করে...'

'তোমার ঘোড়াগুলো বটে! তখনকার ঘোড়াগুলো দৌড়ত আরো অনেক জোরে।'

'আরো জোরে দৌড়ত — তার মানে?'

'যা বলছি তাই — আরো জোরে। মনে আছে একবার পক্ষিরাজকে মস্কোর রেসে দৌড় করিয়েছিলাম। রেসের ঘোড়া রাখতাম না আমি। রেসের ঘোড়া কখনো আমার ভালো লাগেনি, আমি শুধু খাস জাত ঘোড়া রাখতাম: যেমন জেনারেল, শলে, মহম্মদ। হ্যাঁ, পক্ষিরাজে চেপে যেতাম। কোচম্যানটাও ছিল চমৎকার। আমার পেয়ারের কোচম্যান। পাঁড়মাতাল হয়ে যায় বেটা। যাহোক, পেঁছিলাম রেসের মাঠে। ওরা জিজ্ঞেস করল, "সেরপুখভস্কয়, রেসের ঘোড়া কবে কিনছেন বলুন তো?" "আপনাদের তো সব চাষাড়ে ঘোড়া, জাহান্নমে যাক! আমার এই গাড়ির ঘোড়া আপনাদের ঘোড়াগুলোকে দৌড়ে টেক্কা দেবে," আমি বললাম। "কী বলছেন আপনি, কখনো পারবে না," ওরা বলে উঠল। "বেশ, এক হাজার রুবল বাজি," হাতে হাত মেলানো হল। ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল। আমারটা পাঁচ সেকেণ্ডে জিতে গেল, জিতে গেলাম হাজার রুবল। কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। একবার তিনটে খাস জাত ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তিন ঘণ্টায় একশ ভারস্ট গিয়েছিলাম। সারা মস্কো জানে।'

সমানে গড়গড় করে এত গুল দিয়ে চললেন সেরপুখভস্কয় যে গৃহকর্তা একটি কথাও বলতে পারলেন না; সামনে বিমর্ষ মুখে বসে নিজের এবং অতিথির জন্য মদ ঢালা ছাড়া চিত্তবিনোদনের আর কিছু নেই।

আলো হয়ে আসছে। তবু দুজনে বসে আছেন। অকথ্য একঘেয়ে লাগছে গৃহকর্তার। তিনি উঠে পড়লেন।

'হ্যাঁ, শোওয়া যাক,' বলে সেরপুখভস্কয় অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে টলতে টলতে গেলেন নিজের ঘরে।

* * *

গৃহকর্তা শুয়ে আছেন রক্ষিতার পাশে।

'লোকটা একেবারে অসম্ভব। নেশা করে সমানে ধাপ্পা মেরে গেল।'

'আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির চেষ্টাও করেছিল।'

'মনে হচ্ছে টাকা চাইবে আমার কাছে।'

জামাকাপড় না ছেড়ে বিছানায় শুয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন সেরপুখভস্কয়।

“অনেক গুল দিয়েছি মনে হচ্ছে,” তিনি ভাবলেন। “বেশ, তাতে কী এসে যায়। মদটা ভালো, কিন্তু লোকটা একটা আস্ত শুয়োর। বেনের মতো। আর আমিও একটা আস্ত শুয়োর।” মনে মনে বলে খক খক করে হেসে উঠলেন তিনি। “আগে রক্ষিতা পুষতাম, এখন তারা আমাকে পোষে। ভিনক্লেরশা আমাকে রাখছে — টাকা বাগাই ওর কাছ থেকে। কেমন জব্দ লোকটা, যেমন কুকুর তেমন মুগুর। যাক, জামাকাপড় খুলে ফেললে হয় এখন। শালার বুট খোলা দায়।”

‘এই!’ বলে তিনি হাঁকলেন। কিন্তু তাঁর সেবার ভার যে লোকটার ওপর সে শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

উঠে বসে টিউনিক, ওয়েস্টকোট খুলে ফেলে, পা ছুঁড়ে শরীর থেকে খসালেন পেণ্টুলেনটা, কিন্তু বুটজোড়া আর খোলা যাচ্ছে না, নধর ভুঁড়ি বাদ সাধছে। শেষ পর্যন্ত একটা কোনোক্রমে খোলা গেল বটে, অপরটা অনেক চেষ্টাতেও সরল না, অনেক হাঁসফাঁস আর টানাহেঁচড়া সত্ত্বেও। অবশেষে বুট সুদ্ধুই ধপাস করে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলেন সেরপুখভস্কয়। ঘরটা ভরে গেল তামাক, মদ আর বার্ধক্যের দুর্গন্ধে।

১২

সে রাত্রে অনেক কিছু মনে আনতে পারত পক্ষিরাজ। কিন্তু ভাস্কা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। পিঠে একটা মোটা কাপড় চাপিয়ে তাড়াহুড়ো করে ছুটিয়ে নিয়ে গেল একটা শুঁড়িখানায়। সেখানে একটি চাষীর ঘোড়ার পাশে বেঁধে রাখল সারা রাত। দুটো ঘোড়া পরস্পরের গা চাটল। সকালে ঘোড়ার পালে ফিরে এসে পক্ষিরাজের শুরু হল চুলকানি।

“এত চুলকোচ্ছে কেন?” ভাবল সে।

পাঁচ দিন কেটে গেল। ডাক পড়ল পশুচিকিৎসকের।

‘ওর তো দেখছি খোস পাঁচড়া হয়েছে,’ সানন্দে বলল পশুচিকিৎসক। ‘বেদেদের কাছে ঝেড়ে দাও।’

'কেন? গলা কেটে দিলেই হবে, তাহলে আজকের মধ্যেই ওকে সরানো যাবে।'

সকালটা পরিষ্কার, চুপচাপ। চরতে গেছে ঘোড়ার পাল। পক্ষিরাজকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। অদ্ভুত চেহারার একটা লোক এল — রোগা, কালো, নোংরা, সমস্ত কোটে কিসের দাগ। কসাই সে। পক্ষিরাজের দিকে তাকাল না পর্যন্ত, মুখের দড়ি টেনে চলল বাইরে। পক্ষিরাজ চলল শান্তভাবে, পিছন ফিরে তাকাল না, বরাবরকার মতো পা টেনে টেনে চলেছে, পেছনের পা দুটো খড়ের ওপর দুমড়ে যাচ্ছে। দরজা পার হয়ে সে কূয়োর দিকে ফিরেছে, লোকটা একটা টান দিয়ে বলল:

'ওতে কোন ফয়দা হবে না বাপু।'

ভাস্কা পেছন পেছন আসছিল; দুজনে তাকে নিয়ে গেল ইঁটের চালাটার পেছনের খাদে। তারপর দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন এই অতি মামুলী জায়গাটায় আহামরি গোছের কিছু একটা আছে। তারপর ঘোড়ার মুখের দড়িটা ভাস্কাকে দিয়ে কোট খুলে ফেলে জামার আস্তিন গুটোল কসাই, বুটের ভেতর থেকে একটা ছুরি আর শান দেবার পাথর বের করে ছুরিতে শান দিতে লাগল। মুখের দড়িটার দিকে এগোল আক্তা ঘোড়া, একঘেয়ে লাগছে, ওটাকে চিবিয়ে তবু সময় কাটবে কিছুটা, কিন্তু দড়িটা বড্ডো দূরে, তাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল সে। ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল, হলদে দাঁতের টুকরো দেখা গেল। ছুরি শানাবার আওয়াজে ঘুমের ঢুলুনি এসে গেছে। কেবল আলগাভাবে রাখা, ফোলা বেতো পাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ কে যেন জোয়াল চেপে মাথাটা ঠেলে ওপরে তোলাতে চোখ খুলল। সামনে দুটো কুকুর। একটা কসাই-এর দিকে নাক উঁচু করে হাওয়া শুঁকছে, আর একটা বসে তাকিয়ে আছে ঘোড়ার দিকে, যেন তার কাছে কিছু পাবার প্রত্যাশা। তাদের দিকে চেয়ে তাকে ধরে-থাকা হাতটায় ঘোড়াটা গাল ঘষতে লাগল।

'আমার চিকিৎসা হবে দেখছি,' ভাবল সে। 'বেশ, হোক।'

আর সত্যি, ওর গলা নিয়ে কিছু একটা ব্যাপার চলেছে বোঝা গেল। কিসের হঠাৎ আঘাত যেন, আর ব্যথার ঝিলিক। চমকে উঠে পা ছুঁড়ল সে, কিন্তু টাল সামলে নিয়ে এর পর কী ঘটে তা দেখার অপেক্ষায় রইল।

ঘাড় আর বুক বেয়ে দরদর ধারায় গরম কী একটা গড়িয়ে পড়তে লাগল। গভীর একটা নিঃশ্বাস নিল সে, এত গভীর যে পাঁজরাগুলো ফুলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে আরাম হল। জীবনের সমস্ত বোঝা ঝরে যাচ্ছে যেন। চোখ বুজে এল, মাথাটা পড়ল ঝুঁকে। কেউ মাথা ধরল না। গলা নেমে এল, পাগুলো থরথর কাঁপছে, সমস্ত শরীর টলমল। সবকিছু একেবারে অন্য রকম ঠেকছে, ভয় যত নয় বিস্ময় তত। অবাক হয়ে ছুটে এগিয়ে যেতে চাইল সে, চেষ্টা করল লাফাবার, কিন্তু পাগুলো দুমড়ে গেছে, একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করাতে শরীরের বাঁ দিকে ভর দিয়ে পড়ে গেল হুড়মুড় করে। কুকুরদুটোকে ধরে সবুর করে রইল কসাই শরীরের আক্ষেপ থেমে না যাওয়া পর্যন্ত; তারপর কাছে এসে একটা পা ধরে ঘোড়াটাকে দিল চিৎ করে শুইয়ে, ভাস্কাকে পা ধরে রাখতে বলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করল।

'ঘোড়াটা খাসা ছিল,' বলল ভাস্কা।

'গতরে একটু মাংস থাকলে চামড়াটাও খাসা হত,' বলল কসাই।

* * *

ছোট পাহাড় হয়ে সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়ার পাল ফিরছে। বাঁ দিকের ঘোড়াগুলো দেখল মাটিতে লাল কী একটা জিনিস নিয়ে কয়েকটা কুকুর খুব ব্যস্ত; কয়েকটা চিল আর কাক ওপরে উড়ছে। দু পায়ে জিনিসটাকে চেপে একটা কুকুর মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁত দিয়ে এত জোরে টান দিল যে কড়মড় শব্দে একটা টুকরো বেরিয়ে এল।

খয়েরী ঘুড়ীটা থমকে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে অনেকক্ষণ হাওয়া শুঁকল। অনেক কষ্টে তাকে সরানো হল।

* * *

ভোরের দিকে পুরনো বনের খাদে ঘন ঝোপঝাড়ে কয়েকটা নেকড়ে ছানা ফূর্তিতে কুঁই কুঁই করছিল। পাঁচটা ছানা, চারটে আকারে প্রায় সমান; আর একটা একটু ছোট, শরীরের চেয়ে মাথা বড়ো। রোগা লিকলিকে নেকড়ে-গিন্নী বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে, ঢাউস পেটের বাঁট ঝুলে পড়ে মাটিতে ঠেকেছে; বেরিয়ে বসল বাচ্চাগুলোর সামনে; তারা দাঁড়িয়ে রইল অর্ধ-বৃত্ত আকারে। সবচেয়ে

ছোটটার কাছে গিয়ে, সামনের পাদুটো বেঁকিয়ে মাথা নীচু করে নেকড়ে-গিন্নী মুখ খুলল, অস্থিরভাবে কয়েকবার পেট কাঁপিয়ে ঘোড়ার মাংসের একটা বড়ো টুকরো ছুঁড়ে দিল ওপরে। বড়োগুলো দৌড়ল তার পেছনে, কিন্তু নেকড়ে-গিন্নী তাদের ভাগিয়ে গোটা টুকরোটা দিয়ে দিল ছোটটাকে। যেন রাগে গরগর করে উঠে বাচ্চাটা খপ করে টুকরোটা ধরে ফেলে থাবায় চেপে ছিঁড়তে শুরু করল। ঠিক তেমনি করে নেকড়ে-গিন্নী একে একে আরো চারটে টুকরো ছুঁড়ে দিল। তারপর বাচ্চাদের কাছে শুয়ে পড়ে জিরোতে লাগল।

সাতদিনের মধ্যে ইঁটের চালার কাছে পড়ে রইল শুধু একটা বড়ো খুলি আর রাঙের হাড়দুটো; আর কোনো কিছুর পাত্তা নেই। গ্রীষ্মকালে হাড়-কুড়োনো একটি চাষী খুলি আর রাঙের হাড়দুটো পর্যন্ত নিয়ে সেগুলোকে গুঁড়ো করে লাগাল নিজের কাজে।

* * *

সমানে পানাহার করে চলেছিলেন যে সেরপুখভস্কয় তাঁর মৃতদেহ গোরস্থ হল অনেক অনেকদিন পরে। তাঁর হাড়মাস বা চামড়া কাজে লাগল না কারো। বিশ বছর ধরে তাঁর যে দেহ ছিল দুর্বহ বোঝার মতো, সেই মৃতদেহের সৎকার লোকের কাছে ঠিক তেমনি বিরক্তিকর মনে হল।

অনেক দিন তাঁকে কারো প্রয়োজন হয়নি; লোকের কাছে তিনি অনেক দিনই বোঝার সামিল। তবু জীবন্মৃত যারা মৃতদেহের সৎকার করে, তারা ভাবল স্ফীত গলিত দেহটাকে সুন্দর পোষাকে ও বুটে সাজানো প্রয়োজন; তাই করা হল আর চার কোণে রেশমের থোপনা লাগানো খাসা নতুন একটা কফিনে শুইয়ে সেটাকে আবার রাখা হল আর একটা সীসের কফিনে; তারপর নিয়ে যাওয়া হল মস্কোয়। সেখানে মাটি খুঁড়ে আগেকার মানুষের হাড় বের করা হল, যাতে ঠিক সে জায়গাটাতেই নতুন পোষাক ও চকচকে বুট-পরা তাঁর গলিত পোকা-ধরা দেহটিকে গোর দেওয়া যায়।



বল-নাচের পর

'তাহলে আপনারা বলছেন ভালোমন্দর স্বাধীন বিচারশক্তি মানুষের নেই, সব হচ্ছে পরিবেশের ব্যাপার, পরিবেশের জয়জয়কার। কিন্তু আমার মনে হয় সব হল দৈবের হাতে। নিজের বিষয়ে বলি শুনুন ...'

বললেন আমাদের মাননীয় বন্ধু ইভান ভাসিলিয়েভিচ একটি আলোচনার উপসংহারে। ব্যক্তির উন্নতি-সাধনের কথা তোলার আগে দরকার পরিবেশ বদলানো, যে অবস্থায় লোকে আছে সে অবস্থাটা বদলানো, এই নিয়ে চলেছিল আমাদের কথাবার্তা। সত্যি বলতে, ভালো বা মন্দর বিচারশক্তি অসম্ভব — এমন কথা কেউ বলেনি, কিন্তু ইভান ভাসিলিয়েভিচের অভ্যেস ছিল আলোচনায় প্ররোচিত নিজের নানা

চিন্তার জবাব দেওয়া, এ সব চিন্তা প্রসঙ্গে নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা বলা। মাঝে মাঝে গল্পতে তিনি এত মত্ত হয়ে যেতেন যে কেন বলছেন মনে থাকত না, বিশেষ করে এজন্য যে তিনি সর্বদা গল্প বলতেন গভীর আবেগে ও আন্তরিকতায়।

এ বারেও তিনি তাই করলেন। 'আমার কথা বলি। আমার সারা জীবনটা গড়ে উঠেছে এ ভাবে, অন্য ভাবে নয় — পরিবেশের দরুন নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছুর ফলে।'

'কিসের ফলে?' আমরা শুধালাম।

'সে অনেক কথা। বুঝতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়।'

'বলুন শুনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মুহূর্তখানেক ভেবে নিলেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ। 'হ্যাঁ,' তিনি বললেন, 'একটা রাত্রি, বরং একটা সকাল — আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে।'

'কী হয়েছিল?'

'হয়েছিল কি — দারুণ প্রেমে পড়েছিলাম। অনেকবার প্রেমে পড়েছি, কিন্তু এমন গভীরভাবে নয়। অনেক দিন আগেকার কথা — ওর মেয়েদের বিয়ে-থা হয়ে গিয়েছে। তার নাম ব., ভারেঙ্কা ব...' মহিলার পদবীটা বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ। 'পঞ্চাশেও তার চেহারা ছিল তাকিয়ে দেখার মতো, কিন্তু যৌবনে, আঠারো বছর বয়সে ও ছিল মোহিনী: দীর্ঘাঙ্গী সুঠাম লাবণ্যময়ী, রাণীর মতো, হ্যাঁ, ঠিক রাণীর মতো। একেবারে খাড়া হয়ে, যেন নিচু হবার সামর্থ্য নেই এমনভাবে বরাবর সে হাঁটত, মাথাটা একটু পিছনে হেলিয়ে; প্রায় কাঠির মতো রোগা হলেও এটা তার দীর্ঘাকৃতি ও রূপের সঙ্গে মিলে চেহারায় এমন একটা রাণীর মতো ভাব আনত যে লোকে সসম্ভ্রমে পিছিয়ে যেত যদি না তার হাসিটা হত এত উচ্ছল, মন ভোলানো, চোখদুটো এত অপরূপ দীপ্ত, যদি না তার যৌবনোচ্ছল সত্তায় থাকত এত মোহ।'

'ইভান ভাসিলিয়েভিচ রং চড়াতে জানেন, সেটা বলতেই হবে!'

'রং যতই চড়াই না কেন, আপনাদের বোঝাতে পারবো না সে দেখতে কেমন ছিল। যাক গে, এটা অবান্তর। যে সবের কথা বলছি সেগুলো

ঘটে পঞ্চম দশকে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন। জানি না ভালো কি মন্দ, কিন্তু সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের না ছিল পাঠচক্র না ছিল তত্ত্বকথা; আমরা ছিলাম শুধু নওযোয়ান আর থাকতাম ঠিক যোয়ানদের মতো, পড়াশুনো করতাম আর ফূর্তি চালাতাম। অত্যন্ত ফূর্তিবাজ ও চটপটে ছোকরা ছিলাম আমি — তারপর পয়সাকড়ি ছিল মন্দ নয়। একটা তেজী ঘোড়ার মালিক, মেয়েদের গাড়িতে চাপিয়ে ঘোরাতাম (স্কেটিং-এর রেওয়াজ তখনো আসেনি); ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে যেতাম মদের আড্ডায় (সে সব দিনে শ্যাম্পেন ছাড়া কিছু ছুঁতাম না; পকেটে পয়সা না থাকলে কিছুই খেতাম না, আজকালকার মতো ভোদকা চলত না আমাদের); কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল পার্টি আর বল-নাচ। নাচতাম ভালোই, চেহারাটা ঠিক কুৎসিৎ ছিল না।'

'থাক, আর বিনয় করবেন না,' একটি শ্রোতা বললেন। 'আপনার ফটো আমরা সবাই দেখেছি। খারাপ কেন, চেহারাটি খাসা ছিল আপনার।'

'হয়ত ছিল, কিন্তু কথাটা ওটা নিয়ে নয়। কথাটা হল, আমার হাবুডুবু প্রেমের। সে সময়টায় স্রোভটাইডের শেষ দিনে গেলাম একটা বল-নাচে মার্শালের ওখানে, বৃদ্ধটি দিলদরাজ, ধনী, অতিথি আপ্যায়ন করতে ভালোবাসতেন। তাঁর স্ত্রী ঠিক স্বামীর মতো অমায়িক ভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। পরনে মখমলের গাউন, মাথায় হীরের টায়রা, বার্ধক্যের ছাপ লাগা গোলগাল শাদা গলা আর কাঁধ খোলা, ছবিতে মহারাণী ইয়েলিজাভেতা পেত্রভনা যেমন। অদ্ভুত বল-নাচ বটে। বল-নাচের ঘরটি সুন্দর, সেখানে উপস্থিত নাম করা ভূমিদাস-গায়ক সব, একটি সঙ্গীতপ্রিয় জমিদারের গাইয়েবাজিয়েরা। খাদ্যের অভাব নেই, শ্যাম্পেনের স্রোত বইল। শ্যাম্পেনের বড়ো অনুরাগী হলেও খেলাম না — প্রেমের নেশা তখন আমার। কিন্তু নাচে বিরাম দিইনি, নাচতে নাচতে পড়ে যাবার মতো দশা। কোয়াড্রিল নাচলাম, নাচলাম ওয়াল্‌জ্‌ আর পলোনেজ্‌, আর বলা বাহুল্য যতটা পারি নাচলাম ভারেঙ্কার সঙ্গে। তার গায়ে গোলাপী ফেটি-দেওয়া শাদা পোষাক, হাতে নরম চামড়ার লম্বা দস্তানা সরু ছুঁচলো কনুই পর্যন্ত পৌঁছয়নি, পায়ে শাদা

সাটিনের জুতো। আনিসিমভ নামে হতচ্ছাড়া ইঞ্জিনিয়র আমাকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাজুরকা নাচল ওর সঙ্গে। এখন পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করিনি সে জন্য। কেশকারের কাছে দস্তানা নিতে গিয়ে দেরী হয়ে গিয়েছিল, নাচের ঘরে ভারেঙ্কা ঢোকামাত্র আনিসিমভ ওকে নাচতে বলল। তাই ওর সঙ্গে না নেচে মাজুরকাটা নাচতে হল একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে, তার ওপর এক সময়ে আমার একটু ঝোঁক হয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে সে সন্ধ্যায় তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিনি, কথা বলিনি, তাকাইনি পর্যন্ত তার দিকে, আমার চোখজোড়া পড়ে ছিল গোলাপী ফেটি-দেওয়া শাদা পোষাক-পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী তন্বী মেয়ের ওপর, যার টোল-পড়া গাল উজ্জ্বল আরক্তিম, মধুর স্নিগ্ধ যার চোখ। শুধু আমি নই, সবাই তার দিকে চেয়ে চেয়ে তারিফ করছিল, মায় মেয়েরা পর্যন্ত, যদিও ওর দীপ্তিতে সবাই হতশ্রী। তারিফ না করে উপায় ছিল না।

'নিয়মমতো দেখলে মাজুরকায় ওর সঙ্গে আমি নাচিনি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বেশীর ভাগ সময় নাচি ওরি সঙ্গে। ঘরের অন্যদিক থেকে ও বারবার সোজা আসে আমার কাছে অসঙ্কোচে, ডাকের অপেক্ষা না করে আমি লাফিয়ে উঠি আর ও মুচকি হেসে ধন্যবাদ জানায়, মনের কথাটি টের পেয়েছি বলে। নাচের সঙ্গী বাছাইএর সময়ে আমার গুণ* ওর কাছে ধরা পড়েনি, রোগা কাঁধ একটু ঝাঁকিয়ে, আমার দিকে অনুকম্পা ও সান্ত্বনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল অন্য একজনের দিকে।

'মাজুরকার তালে ওয়াল্‌জ্‌ শুরু হল, অনেকক্ষণ ওয়াল্‌জ্‌ নাচলাম ওর সঙ্গে, হাঁফিয়ে উঠে মৃদু হেসে ও চুপিচুপি বলল, 'Encore'।** আর আমি ওর সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচছি তো নাচছি, শরীরের কোনো হুঁশ নেই।'

'হুঁশ ছিল না, বটে? ওর কোমর জড়িয়ে হুঁশটা বেশ প্রখর হয়েছিল মনে হচ্ছে — শুধু নিজের শরীরের নয়, ওরও,' অতিথিদের একজন বললেন।

---

* কোনো কোনো নাচে এক একজনে এক একটি গুণের প্রতিম হত।
** আবার (ফরাসী ভাষায়)।

হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে উঠে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ:

'সেটা আপনাদের, আজকালকার ছেলে ছোকরাদের হতে পারে। দেহ ছাড়া আপনারা আর কিছু দেখেন না। আমাদের দিনকালে অন্য রকম ছিল। কাউকে বেশী ভালোবাসলে অদেহী মনে হত তাকে। আজকাল আপনারা মেয়েদের পায়ের গোছ, গাঁট ইত্যাদি বিষয়ে বেশ সচেতন সজাগ, যাদের ভালোবাসেন তাদের বিনাবস্ত্রে দেখেন, কিন্তু আমার কথা যদি বলেন, আলফ'স কার যেমন বলেছিলেন — আর অত্যন্ত পাকা লেখক ছিলেন তিনি — আমার প্রেমিকাকে সর্বদা দেখতাম ব্রোঞ্জের পোষাকে। বিনাবস্ত্রে দূরের কথা, আমরা চাইতাম নগ্নতাকে ঢাকতে, যেমন চেয়েছিল নোয়ার সুসন্তান। কিন্তু আপনাদের মাথায় এটা ঢুকবে না।'

'ওর কথায় কান দেবেন না। গল্পটা চালিয়ে যান,' বললেন আর একজন শ্রোতা।

'হ্যাঁ, বেশীর ভাগ সময়ে ওর সঙ্গে নাচলাম, সময়ের হুঁশ ছিল না। ক্লান্তিতে বাজিয়েদের হাঁফ ধরে গিয়েছে — বল-নাচের শেষটায় কেমন হয় জানেন তো — ওরা একটার পর একটা বাজিয়ে চলেছে মাজুরকা; সাপারের প্রত্যাশায় ড্রয়িং-রুমের তাসের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ছেন বাপ মায়েরা; চাকরগুলো এদিক সেদিকে ছুটোছুটি করছে। তিনটে বাজতে চলেছে। মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, সেটার সদব্যবহার করতে হয়। ওকে আবার ডাকলাম নাচতে, আবার প্রায় একশ বারের বার ঘরময় নেচে বেড়ালাম ওর সঙ্গে।

'"সাপারের পর আমার সঙ্গে কোয়াড্রিলটা নাচবেন তো?" ওর বসার জায়গায় ওকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম।

'"নাচবো বইকি, অবশ্য যদি ওঁরা আমাকে বাড়ি না নিয়ে যান," মৃদু হেসে ও বলল।

'"নিয়ে যেতে দেবো না আপনাকে," আমি বললাম।

'"হাতপাখাটা দিন তো," বলল ও।

'"ফেরৎ দিতে হচ্ছে বলে মনে বড়ো ব্যথা পাচ্ছি," ছোট শাদা পাখাটা দিতে দিতে বললাম।

'"আহা, ব্যথা যাতে না পান তাই এটা নিন," পাখার একটা পালক ছিঁড়ে আমাকে দিয়ে ও বলল।

'পালকটা নিলাম, উচ্ছ্বাস আর কৃতজ্ঞতা কী করে জানাই, তাকালাম ওর দিকে। শুধু যে আনন্দ আর তৃপ্তি মনে তা নয়, আমি সুখী, চরম সুখী, মনটা দরাজ হয়ে গিয়েছে, আমি আর আমি নই, আমি তখন অপার্থিব কোনো প্রাণী যার মনে কোনো পাপ নেই, যে ভালো বই মন্দ করতে পারে না।

'দস্তানায় পালকটা গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলাম, ওকে ছেড়ে যাবার শক্তি নেই।

'"দেখছেন, ওরা বাবাকে নাচতে বলছে," দোরগোড়ায় গৃহকর্ত্রী ও অন্য কয়েকটি মহিলার সঙ্গে দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘদেহ, জমকালো চেহারার ভদ্রলোককে দেখিয়ে ও বলল। ওর বাবা কর্নেল, টিউনিকের কাঁধে রুপোর কাজ-করা।

'হীরের টায়রা-পরা গৃহকর্ত্রী, কাঁধ যার ইয়েলিজভেতার মতো, ডেকে বললেন, "ভারেঙ্কা, এদিকে এসো তো!"

ভারেঙ্কা দরজার দিকে গেল, আমি তার পিছু পিছু।

'"Ma chére,* বাবাকে বলে কয়ে ওঁর সঙ্গে নাচো তো। দয়া করে নাচুন, পিওতর ভ্লাদিস্লাভিচ," কর্নেলকে বললেন গৃহকর্ত্রী।

'ভারেঙ্কার বাবা বেশ লম্বা আর জমকালো, চেহারাটি অত্যন্ত সুন্দর; বৃদ্ধ শরীরটি খাসা রেখেছিলেন। টকটকে লাল মুখে শাদা গোঁফজোড়া প্রথম নিকলাইয়ের কায়দায় পাক-দেওয়া, শাদা জুলফি নেমে এসেছে গোঁফের দিকে, রগ থেকে চুল সটান সামনে আঁচড়ানো, উজ্জ্বল চোখে আর ঠোঁটে ঠিক মেয়ের মতো হাসির দীপ্তি। বেশ সুন্দর সুঠাম গড়ন, চওড়া বুক ফৌজী কায়দায় চেতানো, বুকে নানা সম্মান চিহ্নের অল্প বাহার, কাঁধজোড়া শক্ত, পাদুটো লম্বা আর সুগঠিত। নিকলাইয়ের রেওয়াজের সামরিক চালচলন, সেকেলে কায়দার অফিসার।

---

* লক্ষ্মীটি। (ফরাসী ভাষায়)

'দরজার কাছে গিয়ে দুজনে শুনলাম তিনি আপত্তি করে বলছেন নাচতে ভুলে গিয়েছেন; তবু একটু হেসে খাপসুদ্ধ তলোয়ার খুলে ফেলে সেবার জন্য উদগ্রীব একটি ছোকরাকে দিলেন, ডান হাতে সোয়েডের একটা দস্তানা চাপিয়ে — "নিয়ম মাফিক চলা চাই" মুচকি হেসে বলে — মেয়ের হাত ধরে এক চক্কর ঘোরার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঠিক তালের অপেক্ষায় রইলেন।

'মাজুরকার তাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা পা বেশ জোরে ঠুকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে তিনি চট করে ঘুরলেন, তারপর ঘরময় ভাসতে লাগল তার দীর্ঘ ভারী দেহ। এ পা দিয়ে অন্য পায়ে আর সুখতলায় ঠোকা দিয়ে চলেছেন, কখনো ধীরে, সুঠাম ভাবে, কখনো বা তাড়াতাড়ি, খুব জোরে। তার পাশে ভাসছে ভারেঙ্কার পাতলা শরীর। প্রায় বোঝা যায় না এমন ভাবে অথচ ঠিক সময়ে বাবার পায়ের সঙ্গে তাল রাখছে তার ছোট শাদা সাটিনের জুতো-পরা পা, কখনো ছোট, কখনো বা বড়ো করে।

'দুজনের প্রতিটি ভঙ্গি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল অতিথিরা। আমার যে ভাবটা হল সেটা তারিফের ততটা নয় যতটা ঘোর উচ্ছ্বাসের। মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিল কর্ণেলের বুটজোড়া। বাছুরের চামড়ায় তৈরী ভালো বুট, তবে গোড়ালি নেই, সামনের দিকটা চারকোণা, কায়দাদুরস্ত ছুঁচলো নয়। দেখে মনে হয় ব্যাটেলিয়নের মুচী বানিয়েছে বুটজোড়া। "আদরের মেয়েকে সাজগোজ করিয়ে ভদ্র সমাজে আনার জন্যে সৌখিন জুতোর বদলে উনি নিজে পরেন ঘরে তৈরী বুট," ভেবে সামনে চারকোণা ওঁর বুটজোড়া দেখে বিশেষ বিচলিত লাগল। সবাই বুঝল এক কালে তিনি ভালো নাচতেন, কিন্তু শরীরটা এখন ভারী হয়ে গিয়েছে, পাদুটোর সেই তৎপরতা আর নেই বলে ক্ষিপ্র খাসা চালগুলো চেষ্টা সত্ত্বেও করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু দুবার ঘরময় বেশ ঘুরলেন তিনি, আর পাদুটো চকিতে ছড়িয়ে দিয়ে আবার খট করে জোড়া লাগিয়ে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে, অবশ্য একটু ভারী কায়দায়, যখন বসে পড়লেন তখন সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। আটকে-যাওয়া স্কার্টটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়ে মুচকি হেসে সাবলীলভাবে ঘুরল বাপের চারদিকে। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথা চেপে চুমু খেলেন কপালে, তারপর

নিয়ে এলেন আমার কাছে, ভেবেছিলেন ওর নাচের সঙ্গী আমি। জানালাম তা নয়।

'"কিছু এসে যায় না তাতে; নাচুন ওর সঙ্গে," খাপসুদ্ধ তলোয়ার বাঁধতে বাঁধতে সস্নেহে হেসে বললেন।

'বোতল থেকে এক ফোঁটা পড়বার পর জল যেমন হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভারেংকার ওপর ভালোবাসা আমার অন্তরের সমস্ত ভালোবাসার পথ খুলে দিল। সে সময় আমার প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ল গোটা পৃথিবীটা। ভালোবাসলাম রাণী ইয়েলিজাভেতার কেতায় হীরের টায়রা-পরা গৃহকর্ত্রীকে, তাঁর স্বামীকে, অতিথিদের, চাকরবাকরদের, এমন কি আনিসিমভকে, যে আমার ওপর বেজায় চটেছিল। আর চারকোণা ঘরোয়া বুট-পরা ওর বাবা, হাসিটা যাঁর ঠিক মেয়ের মতো — তার প্রতি তো উচ্ছ্বসিত অনুরাগ।

'মাজুরকা শেষ হতে গৃহকর্তা ও কর্ত্রী সাপারের টেবিলে ডাকলেন আমাদের। কর্ণেল ব. অনিচ্ছা জানিয়ে বললেন খুব ভোরে উঠতে হবে তাঁকে। ভয় হল বুঝি ভারেংকাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ও মায়ের সঙ্গে রয়ে গেল।

'সাপারের পর প্রতিশ্রুত কোয়াড্রিল নাচলাম ওর সঙ্গে। মনে হয়েছিল এর চেয়ে বেশী সুখ আর হতে পারে না, কিন্তু সুখ তো উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। দুজনের মধ্যে প্রেমের কথা কিছু হল না; আমাকে ভালোবাসে কিনা জিজ্ঞেস করলাম না ওকে বা নিজেকে। ওকে ভালোবাসি, তাই যথেষ্ট। ভয় হল পাছে কোনো কিছুতে সুখের ব্যাঘাত ঘটে।

'বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল ঘুমোনো একেবারে অসম্ভব। আমার হাতে ওর হাতপাখার পালক আর একটা দস্তানা, গাড়িতে ওকে আর ওর মাকে তুলে দেবার সময়ে আমাকে দিয়েছিল শেষেরটা। জিনিস দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবার চোখের সামনে দেখলাম সেই মুহূর্তটি যখন সঙ্গী বাছতে গিয়ে আমার গুণ টের পেয়ে গেল; আবার কানে এল তার মিষ্টি গলা, "গৌরব? তাই না?" তারপর সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে; কিম্বা যখন সাপারের টেবিলে বসে শ্যাম্পেন খেতে খেতে

গেলাসের ওপর দিয়ে অনুরাগ-ভরা চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আমার দিকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে ওকে দেখলাম সেই সময়ে যখন বাপের সঙ্গে নাচছিল, পাশাপাশি ঘোরার সময় কী লাবণ্য তার গতিতে, বাপের এবং নিজের দরুন খুশিতে আর গর্বে তাকাচ্ছিল তারিফ-করা দর্শকদের দিকে। আর আপনা থেকে ওঁরা দুজনে মিশে আমার মনে এক হয়ে গেল, গভীর কোমল অনুভূতিতে হৃদয় দিল ভরিয়ে।

'আমার বিগত ভাই আর আমি তখন একলা বাড়িতে থাকতাম। সমাজটমাজে কোনো ঝোঁক ছিল না ভাইয়ের, বল-নাচে কখনো যেত না। এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে তখন, তার জীবনযাপনের ধরনটা নিয়মমাফিক। ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কম্বলে আধো ঢাকা, বালিশে গোঁজা তার মুখ দেখে মায়া হল — আহা, বেচারী জানে না আমার কত সুখ, সে সুখের ভাগ নিতে পারবে না ও। আমাদের ভূমিদাস খাস-চাকর পেত্রুশ্যা বাতি হাতে এল জামাকাপড় ছাড়িয়ে দিতে আমার কিন্তু চলে যেতে বললাম ওকে। লোকটার ঘুম-জড়ানো মুখ আর এলোমেলো চুল দেখে মায়া হল। পাছে কোনো শব্দ হয়, পা টিপে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপরে বসলাম। এত সুখ আমার মনে, ঘুম এল না। ঘরে গরম লাগাতে ইউনিফর্ম না খুলেই চুপিচুপি সদর ঘরে এসে ওভারকোটটা চাপিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম।

'বল-নাচ থেকে যখন চলে আসি তখন প্রায় পাঁচটা, বাড়ি পেঁছে বসে থেকে তারপর প্রায় দুঘণ্টা কেটেছে; বেরোলাম যখন আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। স্রোভটাইডের সেই বিশেষ আবহাওয়া — কুয়াশা, ভিজে বরফ গলছে রাস্তায়, ছাত থেকে টুপটুপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। সহরের উপকণ্ঠে একটা খোলা মাঠের কিনারে তখন থাকত ভারেঙকারা, মাঠের এক দিকে মেয়েদের স্কুল, অন্য দিকে বেড়াবার জায়গা। আমাদের চুপচাপ গলিটা পার হয়ে বড়ো রাস্তায় গেলাম; সেখানে চলেছে পথচারী, আর কাঠ বোঝাই শ্লেজ নিয়ে চালকেরা, শ্লেজের রানারগুলো রাস্তার বরফ কেটে প্রায় পাথর ঘেঁষে চলেছে; আর সবকিছু — ভিজে চকচকে যোয়ালের নিচে তালে তালে মাথা ওঠা-নামা করা ঘোড়াগুলো, কাঁধে

গাছের ছালের চাটাই চাপিয়ে শ্লেজগুলোর পাশে পাশে বিরাট জুতোয় বরফ কাদা ভেঙে-যাওয়া চালকেরা আর পথের দুধারে কুয়াশায় দাঁড়িয়ে-থাকা উঁচু বাড়ি ঘরদোর — সবকিছু মনে হল বিশেষ সুন্দর, বিশেষ অর্থ আছে তাদের।

'যে মাঠে ওদের বাড়ি সেখানে পেঁছিয়ে বেড়াবার জায়গাটায় বড়ো আর কালো কী একটা চোখে পড়ল, কানে এল ঢাক আর বাঁশির আওয়াজ। আমার হৃদয়ে তখনো সঙ্গীতের ঝঙ্কার, মাঝে মাঝে মাজুরকার রেশ ভেসে আসছে। কিন্তু এটা তো অন্য ধরনের বাজনা, নিষ্ঠুর অসুন্দর।

' "কী হতে পারে এটা," ভাবতে ভাবতে মাঠ চিরে-যাওয়া গাড়ির পেছল রাস্তা হয়ে চললাম সেদিকে যেদিকে আওয়াজ। প্রায় একশ গজ গিয়ে কুয়াশায় লোকের কালো ভিড়টা স্পষ্ট হতে শুরু করল। সৈন্য নিশ্চয়। কুচকাওয়াজ চলেছে ভেবে একটি কামারের সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চললাম, তার গায়ে তেলচিটে গামছা আর জ্যাকেট, বড়ো একটা বাণ্ডিল হাতে। কালো কোট পরে দু সারি সৈন্য মুখোমুখি নিশ্চল দাঁড়িয়ে, বন্দুকগুলো পাশে ধরা। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে বাঁশি-বাজিয়ে আর ঢাকী বারবার বাজিয়ে চলেছে অপ্রীতিকর কর্কশ সুরটা।

' "কী করছে ওরা?" দাঁড়িয়ে পড়ে কামারটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

' "কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিল বলে একটা তাতারকে তাড়িয়ে আনছে," সৈন্যদের দু সারির একেবারে শেষের দিকটায় তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিল কামার।

'সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভয়াবহ কী একটা দু সারির মাঝখান দিয়ে আসছে আমার দিকে। সে হল কোমর অবধি খালি গা, দু বন্দুকে বাঁধা একটি লোক, বন্দুকগুলো ধরেছে দুটি সৈনিক। তারা তাকে তাড়িয়ে আনছে। পাশে পাশে হাঁটছেন ফৌজী কোট আর ফৌজী টুপি পরা দীর্ঘাকৃতি একটি অফিসার, চেহারাটা চেনা চেনা ঠেকল। সমস্ত শরীর শিটিয়ে, গলন্ত বরফে থস থস করে পা ফেলে বন্দীটি এগিয়ে আসছে, দু ধার থেকে তার ওপরে পড়ছে মারের পর মার, থেকে থেকে সে নিচু হয়ে পিছিয়ে পড়লে বন্দুক-ধরা সৈনিকদুটি তাকে ঠেলে দিচ্ছে সামনে, কখনো বা ঢলে একটু বেশী এগিয়ে পড়লে সৈনিকেরা ঝটকা দিয়ে টেনে

নিচ্ছে যাতে পড়ে না যায়। আর তার পাশে সমানে দৃঢ় পায়ে হাঁটছেন দীর্ঘাকৃতি অফিসারটি, পিছিয়ে পড়ছেন না একবারও। তিনি হলেন ভারেংকার বাবা, টকটকে লাল মুখ, শাদা গোঁফ আর জুলফি।

'লাঠি পড়াতে প্রত্যেক বার বন্দীটি যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ ফিরিয়ে যেন অবাক হয়ে তাকাচ্ছে সেদিকে যেদিক থেকে আঘাত আসছে, ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে কী একটা বলে চলেছে বারবার। কাছে না আসা পর্যন্ত কী বলছে বুঝতে পারিনি। সেটা বলা নয় ঠিক, কান্না। "দয়া করো, ভাইসব! দয়া করো ভাইসব!" কিন্তু কোনো দয়া নেই ভাইদের; মিছিলটা ঠিক আমার সামনে এসে পড়ল, দেখলাম একটি সৈন্য দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে এসে এত জোরে মারল তাতারটির পিঠে যে হাওয়ায় শিস দিয়ে উঠল বেতটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, সৈনিকেরা ঝটকা দিয়ে তুলল, আর অন্য পাশ থেকে বেতের আঘাত, এ পাশ থেকে আবার, আবার ও পাশ থেকে ... তাল ঠুকে তার পাশে চলেছেন কর্ণেল, কখনো তাকাচ্ছেন নিজের পায়ের দিকে কখনো বা বন্দীটির দিকে, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে গাল ফুলিয়ে চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম মিছিলটা সেখানটা পেরিয়ে যাবার সময়ে দু সারি সৈন্যর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল বন্দীর পিঠের আভাস। অকথ্য ব্যাপার: ছড়া ছড়া ভিজে দগদগে লাল পিঠ, বিজাতীয় দেখতে। মানুষের দেহ বলে বিশ্বাস হল না।

'"হে ভগবান," পাশের কামারটি বলে উঠল অস্ফুট কণ্ঠে।

'এগিয়ে গেল মিছিল। জড়োসড়ো, ধড়ফড়ানো জীবটির ওপর দু ধার থেকে মারের পর মার। ঢাক বেজে চলেছে, বাঁশির আওয়াজ, বন্দীর পাশে দৃঢ় পদক্ষেপে চললেন দীর্ঘাকৃতি জমকালো অফিসারটি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে, তারপর দ্রুত পায়ে তিনি গেলেন একটি সৈনিকের কাছে।

'ফাঁকি দিবি আর? দেখাচ্ছি তোকে!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। 'দিবি ফাঁকি?' দেখলাম সোয়েডের দস্তানা-পরা বলিষ্ঠ হাতে তিনি কষে একটা চড় বসালেন ছোটখাটো দুর্বল সৈনিকটির মুখে, তাতারের দগদগে লাল পিঠে যথেষ্ট জোরে সে বেত চালায়নি বলে।

'লেয়াও নয়া বেত!' হাঁকলেন কর্ণেল। বলার সময় ঘুরে দাঁড়াতে দেখতে পেলেন আমাকে। চিনতে না পারার ভান করে অত্যন্ত রাগী, শাসানো গোছের ভ্রূকুটি মুখে টেনে তাড়াতাড়ি ফিরলেন অন্য দিকে। এত লজ্জা হল আমার যে কোন দিকে তাকাব ভেবে পেলাম না, যেন অত্যন্ত জঘন্য কিছু করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি চললাম বাড়িমুখো। সারা পথ কানে বাজতে লাগল ঢাকের শব্দ, বাঁশির চীৎকার, সেই কথাগুলো, "দয়া করো, ভাইসব," কর্ণেলের ক্রুদ্ধ রোয়াব-ভরা হাঁক, "ফাঁকি দিবি আবার!" আর বুকের ভেতরটা এত কনকনিয়ে উঠল যে প্রায় শারীরিক কষ্টের মতো, গা উঠল ঘিন ঘিন করে, কয়েক বার দাঁড়িয়ে পড়তে হল রাস্তায়। মনে হল দৃশ্যটির সমস্ত বিভীষিকা উদগার করে ফেলতে হবে আমায়। কী করে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম মনে নেই, কিন্তু ঘুম আসতে না আসতে আবার সবকিছু ফিরে এল চোখের সামনে, বেজে উঠল কানে। তড়াক করে উঠে পড়লাম।

'কর্ণেলের কথা ভাবতে ভাবতে মনে মনে বললাম, "উনি নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা জানেন যেটা আমার জানা নেই। উনি যা জানেন আমার জানা থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম, যা দেখলাম তাতে এত হত না।" কিন্তু শত ভেবেও কর্ণেলের জানা জিনিসটি কী মাথায় ঢুকল না, ঘুম এল না সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর তাও এল একটি বন্ধুর ওখানে গিয়ে প্রচুর মদ্য পানের পর।

'আপনারা ভাবছেন যে দৃশ্যটি দেখি সেটি মন্দ বলে ধরে নিয়েছিলাম! মোটেই নয়। "যেটা দেখলাম সেটা যদি এত নিশ্চিন্তভাবে করা হয়ে থাকে, লোকে যদি সেটাকে দরকার বলে মেনে নেয়, তাহলে তার মানে ওরা নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা জানে যেটা আমার অজানা," এই ভেবে জিনিসটি কী বের করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বের করতে পারিনি কখনো। আর পারিনি বলে সামরিক কাজে যোগ দিতে পারিনি, যেটা আমার ইচ্ছে ছিল, শুধু যে সামরিক কাজে যোগ দিতে পারিনি তা নয়, কোনো কাজেই নয়, আর দেখতেই তো পারছেন কেমন অকর্মার ধাড়ি বনে গিয়েছি।'

'কেমন অকর্মার ধাড়ি বনে গেলেন ভালো করে আমাদের জানা আছে,' অতিথিদের একজন বললেন। 'আপনি না থাকলে অনেক লোক অকর্মার ধাড়ি হয়ে যেত, সেটা বলাই আরো ঠিক।'

'এটা সত্যি বাজে কথা।' রীতিমত বিরক্তির সঙ্গে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

'আচ্ছা, প্রেমের কী হল?' আমরা প্রশ্ন করলাম।

'প্রেম? সেদিন থেকে উবে গেল প্রেম। বেড়াতে বেড়াতে যখনি ভারেংকা অভ্যেস মতো মৃদু হেসে অন্যমনা হয়ে যেত তখনি মাঠে কর্ণেলের কথাটা মনে না করে পারতাম না, কেমন যেন অস্বস্তি আর অপ্রীতিকর লাগত; আস্তে আস্তে ওদের ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। প্রেম খতম হয়ে গেল। তাহলে দেখছেন তো এমনটা ঘটে আর এ ধরনের ঘটনাই মানুষের গোটা জীবনটায় পরিবর্তন আনে, মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর আপনারা কিনা বলেন...' উপসংহার করলেন তিনি।

১৯১১

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

লেভ তলস্তয়

বড়ো ও ছোট গল্প